শান্তিনিকেতন

দ্বিতীয় খণ্ড

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কলিকাতা

সূচীপত্র

॥ ১০ ॥

ভক্ত	১৩
চিরনবীনতা	২২
বিশ্ববোধ	৩১

॥ ১১ ॥

রসের ধর্ম	৪৩
গৃহাহিত	৫১
দুর্লভ	৫৬
জন্মোৎসব	৬০
শ্রাবণসন্ধ্যা	৬৬
দ্বিধা	৭১

॥ ১২ ॥

পূর্ণ	৭৭
মাতৃশ্রাদ্ধ	৮২
শেষ	৮৬
সামঞ্জস্য	৮৮
জাগরণ	৯৯

॥ ১৩ ॥

কর্মযোগ	১০৯
আত্মবোধ	১২০
ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা	১৩৬

॥ ১৪ ॥

সুন্দর	১৪৫
বর্ষশেষ	১৫০
নববর্ষ	১৫৪
বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা	১৫৯
সত্যবোধ	১৬১
সত্য হওয়া	১৬৬
সত্যকে দেখা	১৭১
শুচি	১৭৩
বিশেষত্ব ও বিশ্ব	১৭৫

॥ ১৫ ॥

পিতার বোধ .	১৮১
সৃষ্টির অধিকার .	১৯১
ছোটো ও বড়ো .	১৯৬

॥ ১৬ ॥

সৌন্দর্যের সকরুণতা .	২০৯
অমৃতের পুত্র .	২১১
যাত্রীর উৎসব .	২১৬
মাধুর্যের পরিচয় .	২২০
একটি মন্ত্র .	২২৩

॥ ১৭ ॥

উদ্‌বোধন .	২৩৩
মুক্তির দীক্ষা .	২৩৪
প্রতীক্ষা .	২৩৭
অগ্রসর হওয়ার আহ্বান .	২৪০
মা মা হিংসীঃ .	২৪৪
পাপের মার্জনা .	২৪৭
সৃষ্টির ক্রিয়া .	২৫০
দীক্ষার দিন	২৫৩
আরো .	২৫৫
আবির্ভাব .	২৫৮
অন্তরতর শান্তি .	২৬০

॥ পরিশিষ্ট ॥

দুই ইচ্ছা .	২৬৩
জীবাত্মার মুক্তি .	২৬৮
মনুষ্যত্বের সাধনা .	২৭১
বর্ষশেষ .	২৭৩
নববর্ষ .	২৭৭
আত্মসম্পদ্‌ .	২৮১
গ্রন্থপরিচয় .	**২৮৫**

বর্ণানুক্রমিক

শিরোনাম-সূচী

অগ্রসর হওয়ার আহবান . ২৪০
অন্তরতর শান্তি ২৬০
অমৃতের পুত্র . ২১১

আত্মবোধ . ১২০
আত্মসম্পদ্ . ২৮১
আবির্ভাব . ২৫৮
আরো . ২৫৫

উদ্‌বোধন . ২৩৩

একটি মন্ত্র . ২২৩

কর্মযোগ . ১০৯

গুহাহিত . ৫১

চিরনবীনতা . ২২

ছোটো ও বড়ো . ১৯৬

জন্মোৎসব . ৬০
জাগরণ ৯৯
জীবাত্মার মুক্তি . ২৬৮

দুই ইচ্ছা . ২৬৩
দুর্লভ . ৫৬
দীক্ষার দিন . ২৫৩
দ্বিধা . ৭১

নববর্ষ . ১৫৪, ২৭৭

পাপের মার্জনা ২৪৭
পিতার বোধ . ১৮১
পূর্ণ . ৭৭
প্রতীক্ষা . ২৩৭

বর্ষশেষ ১৫০, ২৭৩
বিশেষত্ব ও বিশ্ব · ১৭৫
বিশ্ববোধ · ৩১
বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা · ১৫৯
ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা · ১৩৬

ভক্ত · ১৩

মনুষ্যত্বের সাধনা · ২৭১
মা মা হিংসীঃ · ২৪৪
মাতৃশ্রাদ্ধ ৮২
মাধুর্যের পরিচয় · ২২০
মুক্তির দীক্ষা · ২৩৪

যাত্রীর উৎসব · ২১৬

রসের ধর্ম · ৪৩

শুচি · ১৭৩
শেষ · ৮৬
শ্রাবণসন্ধ্যা · ৬৬

সত্য হওয়া ১৬৬
সত্যকে দেখা · ১৭১
সত্যবোধ · ১৬১
সামঞ্জস্য · ৮৮
সুন্দর · ১৪৫
সৃষ্টির অধিকার · ১৯১
সৃষ্টির ক্রিয়া · ২৫০
সৌন্দর্যের সকরুণতা ২০৯

পরিপূরক সূচীপত্র

শান্তিনিকেতনের প্রথম খণ্ডে যে প্রবন্ধগুলি আছে

অখণ্ড পাওয়া
অনন্তের ইচ্ছা
অন্তর বাহির
অভাব
অভ্যাস
অহং

আত্মপ্রত্যয়
আত্মসমর্পণ
আত্মার দৃষ্টি
আত্মার প্রকাশ
আদেশ
আশ্রম

ইচ্ছা

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
উৎসবশেষ

এ পার - ও পার
ওঁ

কর্ম
কী চাই

ছুটির পর

জগতে মুক্তি

তপোবন
তরী বোঝাই
তিন
তিনতলা
তীর্থ
ত্যাগ
ত্যাগের ফল

দশের ইচ্ছা
দিন
দীক্ষা
দুই
দুঃখ
দেখা
দ্রষ্টা

ধীর যুক্তাত্মা

নদী ও কূল
নবযুগের উৎসব
নমস্তেহস্তু
নিত্যধাম
নিয়ম ও মুক্তি
নির্বিশেষ
নিষ্ঠা
নিষ্ঠার কাজ
নীড়ের শিক্ষা

পরশরতন
পরিণয়
পাওয়া
পাওয়া ও না-পাওয়া
পাপ
পার করো
পার্থক্য
পূর্ণতা
প্রকৃতি
প্রভাতে
প্রাণ
প্রাণ ও প্রেম
প্রার্থনা
প্রার্থনার সত্য
প্রেম
প্রেমের অধিকার

ফল

বর্তমান যুগ
বর্ষশেষ
বাসনা ইচ্ছা মঙ্গল
বিকারশঙ্কা
বিধান
বিভাগ
বিমুখতা
বিশেষ
বিশ্বব্যাপী
বিশ্বাস
বৈরাগ্য
ব্রহ্মবিহার

ভয় ও আনন্দ
ভাঙা হাট
ভাবুকতা ও পবিত্রতা
ভূমা

মত
মন্ত্রের বাঁধন
মরণ
মানুষ
মুক্তি
মুক্তির পথ
মৃত্যু ও অমৃত
মৃত্যুর প্রকাশ

রাত্রি

শক্ত ও সহজ
শক্তি
শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব
শোনা

সংশয়
সংহরণ
সঞ্চয়তৃষ্ণা
সত্যকে দেখা
সমগ্র
সমগ্র এক
সমাজে মুক্তি
সাধন
সামঞ্জস্য
সৃষ্টি
সৌন্দর্য
স্বভাবকে লাভ
স্বভাবলাভ
স্বাভাবিকী ক্রিয়া

হওয়া
হিসাব

শান্তিনিকেতন

দ্বিতীয় খণ্ড

ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই-যে শান্তি-নিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠছে, এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কী চেয়েছিল এবং কী পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড়ো বড়ো রাজা তাম্রশাসনে শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা ক্ষোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়! এমন অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর—এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি!

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে-সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিস তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে, যে ফলটি ধরে, সে এই-সমস্ত জিনিস থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্যান্য সমস্ত কর্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্যে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চার দিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয় নি। এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্তি ধরে আপনা-আপনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। এইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুধাগন্ধ এমন একটি মধুসঞ্চয়। এইজন্যেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ যেমন সহজ, যেমন গভীর, এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চার দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণ গন্ধ ফুল ফল—নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চার দিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং-শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত্র

উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর—সেই নিভৃতে, সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সংগমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্যাবর্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই-যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো দুই ভাইবোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি-পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক. এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষি-পিতামহেরা এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোঽসি! পিতা নোবোধি! নমস্তেঽস্তু— এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ প্রচলিত নেই, কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই কটিমাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম : এই অত্যন্ত ছোটো অথচ অত্যন্ত বড়ো কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অনন্তের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্‌গময়! তমসোমা জ্যোতির্গময়! মৃত্যোর্মামৃতং গময়— এত বড়ো প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণ দ্বারাও আজ স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

এক দিকে এই পুরাতন আকাশ, পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবনবিকাশের নিত্যনূতনতা। আর এক দিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী, এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়েরই মধ্যে এক রূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী : ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

এক দিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর-এক দিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে, তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে, বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।

যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, 'বরেণ্যং ভর্গ', সেই বরণীয় তেজকে, ধ্যানগম্য করে তুলছে।

এই গায়ত্রীমন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র, কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন, লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না, তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারম্ভে কী অসহ্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের? চার দিকে তিনি কোন্ জিনিসটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না? যখন আকাশের আলো তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠেছিল, যখন তাঁর পিতৃগৃহের অতুল ঐশ্বর্যের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গৌরব তাঁর মনকে কোনোমতেই শান্তি দিচ্ছিল না, তখন তাঁর যে কী প্রয়োজন, কী হলে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অরুচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অন্বেষণ করছিল, কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভুলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান, পূজা-অর্চনা নিয়েই তো দিন কাটিয়েছেন; তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই

শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্মের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা জন্মালো, তখন এই অভ্যস্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপৃত করে রাখবার উপকরণ তো তাঁর খুব নিকটেই ছিল।

তাঁর ভক্তিকে যে এই দিকে তিনি কখনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবী-মন্দিরে ভক্তিভবে প্রণাম করতে ভুলতেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে শহরে গাঁদাফুল দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশানঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁর চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই-সকল চিরাভ্যস্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁর তৃষ্ণার জল যে এদিকে নেই তা বুঝতে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয় নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন! তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাখে কার সাধ্য! যারা নানা ক্রিয়াকর্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চায় তাদের নানা উপায় আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ্য মেলে। কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের তো ঐ একটি বই আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে? তাদের সামনে কোনো রঙিন জিনিস সাজিয়ে তাদের কি কোনোমতেই ভুলিয়ে রাখা যায়? নিখিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে।

কিন্তু এই অধ্যাত্মলোকের—এই বিশ্বলোকের মন্দিরের পথ তাঁর চার দিকে যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারি দিকে প্রচলিত ছিল। এই নির্বাসনের মধ্যে থেকেই তো তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর আত্মা যে আশ্রয় চাচ্ছিল সে আশ্রয় বাইরে খণ্ডতার রাজ্যে সে কোথায় খুঁজে পাবে?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এই কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্যে? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক, তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর খোঁজেই না। তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে

উপলব্ধিই করে না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর-কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চার দিকে, এইজন্যে মুঠো কখন সে ছেড়ে দেয়, তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে, গোলমালের মধ্যে, কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে, দূরে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের যে সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেইগুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সবচেয়ে আপন তিনিই তার কাছে সবচেয়ে ছায়াময়, সবচেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক-একজন মহাপুরুষ জন্মান যাঁরা সেই অনেকদিনকার হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিকের জন্যে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জন্যে চার দিকের কারো কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জন্যে তাঁদের কান্না কোনোমতেই থামতে চায় না। তাঁরা এক মুহূর্তে বুঝতে পারেন, আসল জিনিসটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটেই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস অথচ কেউ তার কোনো খোঁজ করছে না। জিজ্ঞাসা করলে, হয় হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে নয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আসছে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজ তাকে তিনি শক্ত করে তুলতে দেন। যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়, পাছে খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্যটি আমরা না পাই। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মতো এত সহজ আর কী আছে? তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়ে সহজ, তবু তাঁকে আমরা হারাই সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে 'এই-যে এইখানেই', আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি, 'কই? কোথায়?' এই-যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই-যে আত্মার আত্মায়। যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়োই দরকার সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম—এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই, এই যিনি অত্যন্তই কাছে আছেন তাঁকেই খুঁজে পাবার জন্যে এক-একজন লোকের এত কান্নার দরকার। এই কান্না মিটিয়ে দেবার জন্যে যখনই তিনি সাড়া দেন তখনই ধরা পড়ে যান। তখনই সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ—চিরন্তন আলোকের

অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউ-বা ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ-বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কেউ-বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র প'ড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ ক'রে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার ক'রে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়; কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে। মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি-সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সংগে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি-জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধিনিষেধের অনুগত নয়; সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে 'হাঁ', কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্যে যিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি; এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারি দিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো, সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের

প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না, এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদর পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে, কারও বা বড়ো হতে পারে— সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে— কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম, মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চার দিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সেইজন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারি দিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, 'পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব, আর-কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্য দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়।' এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চার দিকে এত বাধাগ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে, এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

এ কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না। দেশ আপনার চিরদিনের যে জিনিসটি মনের ভুলে হারিয়ে বসেছিল, তার জন্যে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কী করে! চার দিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবশ্যক যার সহজ চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়, সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা। যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়, সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্যে একলা তাকে কান্না জাগিয়ে তুলতে হয়; বোধহীনতার জন্যেই চারি দিকের জনসমাজ যে-সকল কৃত্রিম জিনিস নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে, অসহ্য ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে দেশ কাঁদতে ভুলে গেছে, খোঁজবার কথা যার মনেও নেই, তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা খোঁজা, এই হচ্ছে মহত্ত্বের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্যে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্‌বোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই

তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজেছিল, স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চার দিকে যে-সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল— চৈতন্য না হলে চৈতন্য আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে, এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল, যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।

তার পর থেকে তিনি নদীপর্বত-সমুদ্রপ্রান্তরে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি, কেননা তিনি যে সর্বত্রই আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই ব্যাপকভাবে দেখতে পাবার কত সুখ, যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরসগীতগন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়-ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ!

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তি-নিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেন নি। এই প্রকাশের কাজে এক দিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায়-উৎসর্গ-করা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে; আর-এক দিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী। এই দুই এখানে মিলিত হয়েছে—ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রী-মন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষ-রূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধক মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত হয়ে গেছে, সেইখানেই পুণ্যতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করছি, হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, আজ উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্বদা জাগিয়ে রেখে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠতে পারি। গ্রন্থের মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ম ক্ষুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে, তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তিসকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে না

থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে সুযোগ যে অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলই যেন তাকে নষ্ট করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিত্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, যে মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে, সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া যে একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তা হলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তা হলে আমরা দিয়েও যাব—তা হলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব; এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব; আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে সৃষ্টিকার্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মতো ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে, এই কথাটি চিরদিন ফিরে ফিরে আসবে, ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে : হে আনন্দময়, তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি! হে সুন্দর, তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি! হে পবিত্র, তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে! হে অন্তরের ধন, তোমাকে বাহিরে পেয়েছি! হে বাহিরের ঈশ্বর, তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি!

হে ভক্তের হৃদয়ানন্দ, আমরা যে তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারি নে তার একটিমাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মতো হতে পারি নি। তুমি আত্মদা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজস্র দান করছ। আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্ষুকতা কিছুতেই ঘোচে না। আমাদের কর্ম, আমাদের ত্যাগ, স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য থেকে উদ্‌বেল হয়ে উঠছে না। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে না। আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দ-স্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারছি নে, আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠছে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতুস্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন; আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই, তোমারই স্বরূপকে মানুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি। দেখি যে তাঁরা কিছু চান না, কেবল আপনাকে দান করেন; সে দান মঙ্গলের উৎস থেকে আপনিই উৎসারিত হয়, আনন্দের নির্ঝর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে; তাঁদের জীবন চার দিকে মঙ্গললোক সৃষ্টি করতে থাকে, সেই সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই; কেবলই

প্রাচুর্য, কেবলই পূর্ণতা। দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত করে তখনও তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনও তাঁরা বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন, হে পরমমঙ্গল পরমানন্দ, তোমাকে আমরা কাছে পাই; তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্য-রূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ, ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্‌ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিসুধা-সরস তোমার অতিমধুর লাবণ্য যেন আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত রঙ নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে, তা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। অহংকারের অন্ধতা থেকে যেন এই দেবদুর্লভ দৃশ্য হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণ্যসংগমের তীরে নিভৃত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি; মিলনসংগীত এখনও সেখানকার সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে, সেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বেজে উঠছে। থাকতে থাকতে, শুনতে শুনতে, সেই সংগীতে আমরাও যেন কিছু সুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ করো। কেননা, জগতে যত সুর বাজে তার মধ্যে এই সুরই সব চেয়ে গভীর, সব চেয়ে মিষ্ট— মিলনের আনন্দে মানুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায় এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্ছনা।

৭ পৌষ ১৩১৬
রাত্রি

চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়, প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে, প্রতিদিনই মনে করি বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধুলায় মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যুষে প্রভাত এসে পূর্ব-আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে জাদুকরের মতো জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়। দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্তা এই মুহূর্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই-যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই বলছে।

আজ এই-যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ-যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরুপ্রান্তরে কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড়ো বড়ো সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে; এ সেই অতিপুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল, সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মতো এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্তি, সদ্যোজাত শিশুর মতোই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনই নবীন হয়ে ওঠে, এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কী? এর মানে হচ্ছে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্যসামগ্রী। পুরাতনতা জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মতো আসছে যাচ্ছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, একে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা। তারা মরীচিকার মতো— জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না— প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই-যে পৃথিবীর অতিপুরাতন দিন, একে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আসতে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তার পরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত, তা হলে ধুলার পর ধুলা, আবর্জনার পর আবর্জনা কেবলই জমে উঠত। চেষ্টার ক্ষোভে, অহংকারের তাপে কর্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তা হলে কেবলই মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলই কাড়তে যাওয়া, কেবলই ধাক্কা খাওয়া, কেবলই অন্তহীন পথ, কেবলই লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মতো বিদীর্ণ করে ফেলত।

এখনও দিনের বিচিত্র সংগীত তার সমস্ত মূর্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠে নি।

কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে কর্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠতে থাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে চাইবে। দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে উদ্‌বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জন উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মতো এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরেসুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেমনি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর; তার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, সংঘর্ষ নেই; তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই। সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর। নিত্যরাগিণীর মূর্তিটি অতি-সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুনতে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হোক-না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিসটি হচ্ছে শান্তম্‌। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেইজন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্তিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই, একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইছে, কিন্তু রোজ সকালবেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই-সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্ছেন শিবম্‌। প্রভাতে তাঁর একটি নির্মল মূর্তিকে দেখতে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলিরেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে, বুদ্‌বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনও কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলট-পালট হয়ে যাক-না তবু দেখি যে, সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে, কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্‌, অন্তে শিবম্‌ এবং অন্তরে শিবম্‌।

সমুদ্রে ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড, এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারের অনৈক্যকে বিরোধকেই সবচেয়ে প্রবল বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্তা আছে; যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুনতে পাব, এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অদ্বৈতম্‌। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্নবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলে নি। গণনা-হীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন সেই অদ্বৈতম্‌, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্‌, অন্তে অদ্বৈতম্‌, অন্তরে অদ্বৈতম্‌।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুনতে পেয়েছে: শান্তম্‌

শিবম্ অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে, তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে : শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন; নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হ'ল এ কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে, তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে, এ কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংস্রব কোনোমতেই ঘুচছে না। এইজন্যেই গোড়াতেও প্রথম এখনও প্রথম, গোড়াতেও নবীন এখনও নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ। বিশ্বের আরম্ভেও তিনি অন্তেও তিনি—সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেইজন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে, স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না, আমাদের চিত্ত বারম্বার সেই মূলে ফিরে আসবে—সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়—আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে, তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনোমতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত-কিছু বিপ্লব সে এমনি করেই হয়েছে। যখনই প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে—যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না, তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পারবে এত বড়ো শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে। কেননা, সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি, সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই

দুর্বলতা। এইজন্যেই অহংকারকে বলে বিনাশের মূল, এইজন্যেই ঐক্য-হীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগসাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয়, তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন? না, গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্যন্ত যাক-না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয়-ভয় করতে থাকে; কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পর-মুহূর্তেই তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই, তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এইজন্যে যে, সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারম্বার পরিস্ফুট করে তুলতে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মতো আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্ছে সেই-পর্যন্ত যেপর্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে—সমস্তের মূলে যে শান্তম্-শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ, যে স্বাতন্ত্র্য লীলা-রূপেই সুন্দর তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যতদূরই যাক-না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউইয়ের মতোই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায়, তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে, কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা, পতনের দ্বারা ঘটবে। তাকে বিদীর্ণ হয়ে, দগ্ধ হয়ে, নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে, কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কেননা, সমস্তের মূলে যিনি আছেন তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক— তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এইজন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভালো করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য— খুব বিশুদ্ধ ক'রে, নিখুঁত ক'রে, সমস্ত তারগুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া, এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তমত সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামত তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখতে মানুষকে কত দিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিনতে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুলতে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহুদিন সংযমসাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমটি প্রভাতের মতো সরল, নির্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায়, নির্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিতভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন; ভোগবিলাস ঐশ্বর্যউপকরণ খ্যাতি-প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে, মঙ্গলের সঙ্গে, একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা— কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমে কত কাজকর্ম, অর্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়। এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না। আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে— আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছনো, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্মের ভিতর দিয়ে, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে, গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বলছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই-যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ। তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক-না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে। তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সে মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও। প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সকলের চেয়ে বড়ো হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য হয়ে উঠব, এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে, তা আমি জানি; তবু বলছি, এ পথ তোমার না হোক। তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক যেখানে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এসে মিলেছে। তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জন করে তাকে সার্থক করো। যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করতে থাকবে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে, এই তোমার সাধনা হোক। ফিরে এসো, ফিরে এসো, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এসো— দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এসো সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আসবে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি; সব ভুল হয়ে যায়, কোনো-কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না, এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্তে মুহূর্তে এইরকম ঘটছে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আনো আপনাকে; ফিরে এসো, আবার ফিরে এসো, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে; আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেলতে খেলতে মার কাছে বারবার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা হলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ংকর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম সংসারের খেলা ভয়ংকর হয়ে উঠবে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখো যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার, দুর্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে।

দিনে-দুপুরে বেলায়-অবেলায় যখন-তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আসো, তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না; মনে কোরো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে। আবার ফিরে এসো তাঁর মধ্যে, একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখতে দেখতে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হয়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে। বাঁধা পোড়ো না এর মধ্যে। ফিরে এসো তাঁর কাছে, বারবার ফিরে এসো। জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা-কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বলো, দর্শন বলো, ইতিহাস বলো, সমাজতত্ত্ব বলো, সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও; তাঁর মধ্যে রেখে দেখো। তা হলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে; সমস্তই প্রশস্ত হয়ে, সত্য হয়ে, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। জগতের সমস্ত সংকোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ, এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও; বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এসো; তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্মকে নির্মলরূপে সত্য করে তোলো।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত, তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধুলা-বালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা-কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ—এটা পুরানো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্‌ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা-আপনি ভরে উঠছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুমকিও খসে নি; আজও প্রতি রাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলছে 'বলো দেখি আমি তোমার জন্যে কী এনেছি'। তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলছে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকেই

আপনি ধ্বংস করছে— সে যা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে; লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনই তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চার দিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখো— শৈশবের সত্যদৃষ্টি ফিরে আসুক, জল স্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মতো করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করো। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো— কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কী নিবিড়, কী নিগূঢ়, কী আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সংগীতে বেজে উঠছে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে : তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেইজন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন। এই সৌন্দর্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই। চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন। চিরসুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা। সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলে, সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে, আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো— সত্য হোক তোমার জীবন, তোমার জগৎ— জ্যোতির্ময় হোক, অমৃতময় হোক।

দেখো, আজ দেখো, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন— কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই, কার প্রেমের গৌরবে তোমার চার দিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে— কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মতো আবৃত আবদ্ধ করতে পারছে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে— প্রিয়তমের অনন্তমহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারি দিকে দিকে-দিগন্তে দীপ জ্বলছে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আজ তোমার কিসের সংকোচ! আজ তুমি নিজেকে জানো, সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠো, পুলকিত হয়ে ওঠো! তোমারই আত্মার এই মহোৎসব-সভায় স্বপ্লাবিষ্টের মতো এক ধারে পড়ে থেকো না; যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মতো উঞ্ছবৃত্তি কোরো না।

হে অন্তরতর, আমাকে বড়ো করে জানবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘুচিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও। আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য। আর-সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্মমভাবে তাঁদের চূর্ণ করে দাও। আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে

তোমার বুকের কাছে টেনে নাও। আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধুলোয় নত করে দাও যে ধুলোর কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনোই যেতে দেবে না, ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারম্বার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে। দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারী হয়, ধুলা জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না; দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়; অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়। সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হালকা হয়, ধুলার চিহ্ন থাকে না। একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতে গিয়ে পৌঁছতে হয়; যা-কিছু আমার, সে-সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও। তখন কোনো ব্যবধান রাখ না। তার পরে বিরামরাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে, মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের পথে আবার পাঠিয়ে দাও। নির্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে; গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি; মনে গর্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে, নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু প্রেমের টান তো ছিন্ন হয় না; শুষ্ক গর্ব নিয়ে তো আত্মার ক্ষুধা মেটে না। শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্‌কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝতে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্বলতা। তখন গর্বকে বিসর্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই। তখনই তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই, কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না। সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে—'মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে'। শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্মের ঝংকারে। বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক। শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক। পবিত্র হয়ে, পরিপূর্ণ হয়ে, সুধাময় হয়ে, নীরব হয়ে যাক। সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক, জীবনমৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক, অন্তর-বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক, ভূর্ভুবঃস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক। বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ। বিরাজ করুন শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌।

বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জন্মায়, অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই

আবির্ভাব হয়, তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায়, তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বা বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তা হলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী-জ্ঞানী শূর-বীর রাজা-মহারাজার মধ্যে এমন কোন্ মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?—

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা-
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্ছে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারি দিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এইজন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না—কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোটো হোক বড়ো হোক, উচ্চ হোক নীচ হোক, শত্রু হোক মিত্র হোক, সকলেই আমার আপন।

মানুষের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগ-স্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেইজন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম-একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খৃস্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন. সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বলো, মান বলো, যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি; তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই— আরও বড়ো, আরও বড়ো; আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না; সে আপনার বড়োত্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান। সেইজন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ— অর্থাৎ, জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্তস্বরূপ— অর্থাৎ, এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এরকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কি না সে কথা আলোচনা করতে চাই নে, কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্তস্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এত দূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে তত দূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে, এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান গম যব প্রভৃতি যে-সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মতো পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্যসত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়: নমোনমঃ। তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, সর্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য— তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন যা-কিছু ঊর্ধ্বে আছে অধোতে আছে, দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে, সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সেপর্যন্ত এইপ্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ, ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী?—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ। যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি— তাঁর অনুভূতির ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগৎকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি— তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়— যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— এই আত্মাতেও তিনি সর্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তা হলে অনুভূতির

সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে, প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়— যেপর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই-পর্যন্তই সে সত্য, সেই-পর্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল— এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে; এই বোধের উদ্‌বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন; এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে, সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়ার মূল্য কী? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই— আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায় এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে : ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃধঃ। লোভ কোরো না।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনাবর্জনের শিক্ষা। গীতাতেও বলছে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এই-সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এইপ্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উল্টো।

যে লোক আপনাকেই বড়ো করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয়তো নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই, সত্যতম ব'লে জানে; বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য, আর-সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ-মা ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে, তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে; তখনই সে বড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু, সেই বড়ো হবার মূল্যটি কী? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে খর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। গৃহের

সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে, স্বাদেশিক হবার জন্যে, মানুষকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো ক'রে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই খর্ব করতে হয়। তার যে-সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজ-বোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ এক দিকে যতই বড়ো হয় অন্য দিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ-সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। একেই তো বলে বীতরাগ হওয়া। এইজন্যেই মহত্ত্বের সাধনামাত্রই মানুষকে বলে : ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। বলে : মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চেষ্টা। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌঁচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে-সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎ-ভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতাবোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সেজন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে, বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায়-দীক্ষায় আহারে-বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্ছে সাত্ত্বিকতার অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ-বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষে পশুপক্ষী, এমন-কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্মের চর্চা করা; অন্নজল নদীপর্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধসূত্র প্রসারিত করা; ধর্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্মের দ্বারা, মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড়ো তার চৈতন্যও তত বড়ো হওয়া চাই; এইজন্যই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্বত্রই এমনতরো সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়; অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তো জলে স্থলে আকাশে, অন্নে পানে, বাক্যে মনে, সর্বত্র সর্বদাই এই অনন্তকে সর্ব-সাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এইজন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য বা স্বদেশ বা

স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ করে নি।

এই-যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ—কাল্পনিকতা নয়; তারই সাধনা প্রচার করবার জন্যে এ দেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি
ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানা দিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়—বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোটবড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায়, জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন, যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই; যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদে পদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্বত্র ছড়াতে পায় না। সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না। দেশে যেটুকু

কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। তার কারণ আর কিছুই নয়, আমরা খাওয়া-শোওয়া ওঠা-বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে। যে বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে অবারিত করছে। দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলছে এবং মানবঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎ ক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়ালো, শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল, ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়া— শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই। যে মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই-সমস্ত শতখণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। ইঁহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইঁহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য। প্রত্যেকের মধ্যে, সকলেরই মধ্যে, তাঁকে চিন্তা ক'রে, তাঁকে দর্শন ক'রে। গৃহেই বলো, সমাজেই বলো, রাষ্ট্রেই বলো, যে পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই; যে পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্য সকল দেশেই সর্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে; সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে— কেননা সেই একই অমৃত, সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে-সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম-একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করছে, কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে— একটা বিশেষ সীমার

মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা প্রশস্ত করে নিয়েছে। সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনও তারা ব্যাপ্ত হচ্ছে, তাদের শক্তি এখনও কোথাও তেমন করে অভিহত হয় নি, তারা চলেছে, তারা বদ্ধ হয় নি। কিন্তু সেইজন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কী? তারা মনে করছে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম, এর পরে বুঝি আর কিছু নেই যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে, মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করছে, আজকালকার দিনে উন্নতি বলতে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু, বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেইজন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয় নি।—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী, এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলই আঘাত পেতে থাকব— কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে; বিধাতা এক দিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে, কিন্তু তার একটিমাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি 'সর্বগতঃ শিবঃ', যিনি 'সর্বভূত-গুহাশয়ঃ', যিনি 'সর্বানুভূঃ'। তাঁকেই চাই; তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না, তা হলে আমি বলব, আমাদের বিনতিই ভালো। যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তা হলে আমি বলব, স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চির-

দিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে, কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ যিনি এক, অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই, বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে— স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর-নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা-কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কী আশ্চর্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়। মনে হয়, যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এ দেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে, এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্ছে। মনে হয়, যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মূর্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে— এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ, এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি। এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন : যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ। এইজন্যে তাঁরা বলেছেন : প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা। প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন : নমস্তে অস্তু আয়তে। নমো অস্তু পরায়তে। যে প্রাণ আসছ তোমাকে নমস্কার। যে প্রাণ চলে যাচ্ছ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ। যা চলে গেছে তাও প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আসবে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে, যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো-এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রই তুমি। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, সেইজন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন : প্রাণো বিরাট্। সেই প্রাণকেই তাঁরা

সূর্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন : প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়। নমস্তে স্তনয়িত্নবে। যে প্রাণ ক্রন্দন করছ সেই তোমাকে নমস্কার। যে প্রাণ গর্জন করছ সেই তোমাকে নমস্কার। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে। নমস্তে প্রাণ বর্ষতে। যে প্রাণ বিদ্যুতে জ্বলে উঠছ সেই তোমাকে নমস্কার। যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়ছ সেই তোমাকে নমস্কার। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়-- কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন। তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন : কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেই বা শরীরচেষ্টা করত, কেই বা জীবনধারণ করত, যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে। সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে, হে সর্বব্যাপী পরমানন্দ, তোমাকে সর্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক। যাক সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক। দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক। সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক, শত্রুমিত্র মিলে যাক, স্বদেশ বিদেশ এক হোক। হে আনন্দময়, আমরা দীন নই, দরিদ্র নই। তোমার অমৃতময় অনুভূতির দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত। এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তা হলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্যময় হবে; দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা তো কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন্ প্রেমের সুগন্ধ বসন্ত-বাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি। বলেছেন : রসো বৈ সঃ। সেইজন্যই জগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রঙ, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে, বিচিত্র করে ভোগ করছি। হে অনির্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখলে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নীচে নত হয়ে পড়ে। বলে, দাও দাও আমাকে তোমার ধূলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে রিক্ত ক'রে, কাঙাল ক'রে। তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও; চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারও চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়, রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্যে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চার দিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে—তোমার যে রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ

হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে—যে রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না, ফুরিয়ে যাচ্ছে না—মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায় মাতায়, স্বামীস্ত্রীতে, পুত্রে কন্যায়, বন্ধু-বান্ধবে নানা দিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে—সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে অমৃত তারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও। তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি। যারা তোমারই, সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরিব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশি হয়ে যে জায়গাটিতে কারও লোভ নেই সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা। আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তা হলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'—তিনিই রস, যা-কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

রসের ধর্ম

আমাদের ধর্মসাধনার দুটো দিক আছে— একটা শক্তির দিক, একটা রসের দিক। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত এও ঠিক তেমনি।

শক্তির দিক হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন, এইটুকুমাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলি নে। আমি যার কথা বলছি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতো দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে, সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায় তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে, কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে যে-সব জিনিস সংসারের জোয়ারে ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায় তাদেরই তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা-কিছু হারায়, যা-কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায়, তার ক্ষতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলই তার মনে হয়, সর্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলই তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই-সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্তি দেখতে পায় না। যে লোক ডুবজলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি-কলসী কলার ভেলা তার পরম ধন— তার ভয় ভাবনা উদ্‌বেগের সীমা নেই। আর যে ব্যক্তির পায়ের নীচে সুদৃঢ় মাটি আছে তারও হাঁড়ি-কলসীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়ি-কলসী তার জীবনের অবলম্বন নয়— এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তা হলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক-না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্‌বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সে মনে মনে জানে, ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি— বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড়ো জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে

অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা—এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুনতে সহজ, এবং শোনবামাত্রই অনেকে হয়তো বলে উঠবেন যে, ঈশ্বর সত্য এ কথা তো আমরা অস্বীকার করি নে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারি নে। আমাদের মন সেই পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক-না কেন, যিনি চরমসত্য পরমসত্য তিনি আছেন এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি—এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে সে ব্যক্তি যেমনভাবে জীবনের কাজ করে আমরা কি তেমনভাবে করে থাকি? 'আছেন আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন, সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন—জীবনে যত উলট-পালটই হোক, এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না' এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্ছে বিশ্বাসী। তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন, এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরম রূপ হত, তা হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থক রূপটি এই-খানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ, নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ—তার চলাফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল। সে কঠিন নয় ব'লে, নম্র ব'লে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে। এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে, এইজন্যেই কেবলই সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন-কি তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেক সময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে; সে অন্যকে আঘাত করে; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না ব'লে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্য দিকে আছে তারা কিছুই দেখছে না এবং সমস্তই ভুল দেখছে ব'লে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারি ভিতের মধ্যে জোর ক'রে টেনে আনতে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল ব'লে অবজ্ঞা করে এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয়সাধন ব'লে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্মস্থান-গুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গীময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায় অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিসটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ, কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে তাকে ইস্পাত-রূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায় এ সে জিনিস নয়। সরস সজীব তরু-শাখার যে নম্রতা—যে নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সংগীতে মুখরিত হয় এবং সূর্যের কিরণ ঝংকৃত সেতারের সুরগুলির মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; চারি দিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে;

যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সংগীতে পরিণত করে এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বলতে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা— শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্যের দ্বারাই নত; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে— আনন্দের ধর্মই হচ্ছে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না— অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়— এমন-কি, যে রাজা যথার্থ রাজা প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্যে যে লোক ধনী নম্রতাই তর প্রাচুর্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত? যেখানে তিনি সুন্দর, যেখানে 'রসো বৈ সঃ'; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়— সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দভারে দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড়ো কথা। তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, এ-সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোটো। তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে-ভঙ্গীতে হাসিতে-গানে রসে-গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন, এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা— তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই-যে দুইটি পরিচয়, একটি অটল নিয়মে, আর-একটি সুনম্র সৌন্দর্যে— এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্যটি আছে তাকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে সে যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেক দিন লেগেছিল, কিন্তু সৌন্দর্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য মিলবে ব'লেই ধরা দেবে ব'লেই সুন্দর। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই, রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্যে কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার-বিচারকে মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ক'রে আবদ্ধ ক'রে রাখে; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে

অপরাধ ঘটে— এইজন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই-সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম ব'লে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় ব'লেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এইজন্যে আপনার ধর্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদ-মস্তক বন্দী করে রেখেছে; ধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজও ধর্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল, বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারই প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলই দূর করছে, কেবলই ভাগ করছে, নিজেকে কেবলই সংকীর্ণ বন্ধ ক'রে আড়াল ক'রে রাখবার উদ্যোগ করছে। হিন্দুর ধর্ম যেখানে সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলই বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বলতে পারি নে। কারণ, স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক। অর্থাৎ, এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার উপরের জিনিস। ক্রীতদাস রাজাকে খুন ক'রে সিংহাসনে চড়ে বসলে যেমন হয়, স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল ক'রে বসে তা হলে সেই রকমের অন্যায় ঘটে। এইজন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে রাখতে থাকলেও, ধর্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে, বিশ্বমানবের দিকে, নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে সেইখানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্রপথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক করেছি। আমরা বলেছি, মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল-গ্রহণে, মানুষ ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি— তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে?

আশ্চর্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারই হাতে দিতে চেষ্টা করছি যে জিনিসটা ধর্মের চেয়ে নিচেকার। আমরা স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার

জন্যে। আমরা বলছি, তা না হলে আমরা বড়ো হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে, আমাদের জাতীয় স্বার্থ-বুদ্ধি প্রয়োজনবুদ্ধিও তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে! এমন দশা হয়েছে যে, ধর্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে, ধর্ম আমাদের পৃথক থাকতে বলছে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করছে!

কিন্তু ধর্মবুদ্ধি যে মিলনের ঘটক নয় সে মিলনের উপর আমি ভরসা রাখতে পারি নে। ধর্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলই গণ্ডি আঁকবার এবং বেড়া তোলবার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্মের সিংহদ্বার খোলা থাকলে তবেই ছোটো বড়ো সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব; নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা স্বাজাত্য-অভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি তবে ধর্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদপার্থক্য, এত বিরোধবিচ্ছেদ গলতে পারবে না— মিলতে পারবে না।

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনই সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃস্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে, কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি— তার মৈত্রী, তার করুণা, এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল’, রামানন্দ বল’, কবীর বল’, চৈতন্য বল’, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় ক’রে কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনই সত্যভাবে গভীরভাবে

মিলেছে তখন কোনো-একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন-সাধন তখন সাধনাকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবন্ধ পূজার্চনা আচার-অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন-কি, তাতে মনকে কঠোর করে, ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেননা, দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়— সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক হয়েছে সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখস্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট, এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে, বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়। সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারের কর্ম মলিন করে না, তাকে আরও দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে, কর্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয়— সে তাঁর অলংকার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এইজন্যে মানবসমাজে কর্মকান্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না— তাঁরা অনায়াসেই কর্মকে শিরোধার্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে-যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে-যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়— দুঃখে নম্রতা ও কর্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। কর্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন কর্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয় তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন, তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্বর ক'রে সে চলতে থাকে;

নুড়িপাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সংগীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝর্নার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে? না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এইজন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে—এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝর্নার যে গতি সে তার নিজেরই গতি—সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলই নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনই মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনই তার ওঠাবসা খাওয়াপরা সকল দিকেই বাঁধাবাঁধি। তখনই সে সেই-সকল নিরর্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলই একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়; তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে কোন্‌ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যা হচ্ছে এই যে কোন্‌ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ, গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই হচ্ছে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্য স্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এইজন্যে মানুষের ধর্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয় তখনই সংসারে যেখানে যা-কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়—তখন কর্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

গুহাহিত

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন : গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং। অর্থাৎ, তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন; বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না থাকত তা হলে সে দিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে ব'লেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ ক'রে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে চারি দিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্ছে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে বের করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল? যা-কিছু পাচ্ছি তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্ছি নে, যা পাচ্ছি নে তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে—এই একটি সৃষ্টি-ছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মালো?

পশুদের মনে তো এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারই মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে; মুহূর্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে, যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে; তাকে অতিক্রম করতে পারছে না ব'লে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু, এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না—এমন-কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য-সত্ত্বেও মানুষ বলেছে, 'দেখতে পাচ্ছি নে কিন্তু আরও আছে, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আরও আছে।'

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেললেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সেরকম নয়—এ আচ্ছন্ন ব'লে গুপ্ত নয়, এ গভীর ব'লেই গুপ্ত। সুতরাং, একে যখন আমরা জানতে পারি তখনও এ গভীর থাকে।

গোরু উপরের থেকে ঘাস ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটি চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে। কিন্তু, এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নিচেকার মুথার প্রকৃতিগত কোনো প্রভেদ নেই, দুটিই স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই সমান রকমেই পেট ভরে। কিন্তু, মানুষ গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে, সাদৃশ্য নেই। তা খনির ভিতরকার খনিজের মতো তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিস নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চেয়ে বেশি মূল্যবান রত্ন বলেই জানে।

তার মানে আর-কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে—তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এইজন্যেই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এই-টুকুমাত্র দেখেই মাটির দিকে চোখ ফেরায় নি—এইজন্যে কোন্ সুদূর অতীত-কালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরুপ্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথরাত্রের আকাশপৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্করহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ নিদ্রাহীন নেত্রে যাপন করেছে—তাদের যে মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারও সে দিকে তাকাবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু, মানুষ যা দেখে তার গূঢ়াহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ যে কেবল সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছে তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এককে আর ব'লে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই, কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে তো একেবারে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে যে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূতপ্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগলি ওঠে, তার থেকেই জাল ফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলছে, তার থেকে এ পর্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে—কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার—আফ্রিকার বন্য বর্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয় পাই তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য—এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, একে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মানতে চায় না। এখানে সমুদ্র-পর্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না, বারংবার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না—এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে।

মানুষ যে দ্বিজ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর-এক জায়গায় সে গূঢ়াহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে চতুর্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম

করতে হয়; তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবনরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি— এমন-কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড়ো করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতার দিকে, মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে— ভূমার দিকে অগ্রসর হয়— তখনই মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম, যা প্রত্যক্ষ, তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না; এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে— সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক; সেইখানেই তার স্থিতি. তার গতি; সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা-কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না; তাকে মাপ ক'রে ওজন ক'রে দেখবার কোনো উপায়ই নেই; তাকে যদি কোনো স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে 'কী তুমি পেলে একবার দেখি'— তা হলে বিষম সংকটে পড়তে হয়। এমন-কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতিষ্ঠা, তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূলে আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি ভারী জিনিস হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে 'আমি সমুদ্র দেখব— আমি হিমালয় পর্বত দেখব', তবে তাকে এ কথা বলতে হয় না যে 'আগে তোমার চোখদুটোকে মস্ত বড়ো করে তোলো তবে তোমাকে পর্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব'। কিন্তু, সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বলতেই হয়, 'একটু রোসো। গোড়া থেকে শুরু করতে হবে; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত করো তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ, চোখ মেললেই চলবে না, কান খুললেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' মূঢ় যদি বলে 'না— আমি সাধনা করতে রাজি নই— আমাকে তুমি এ-সমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মতো সহজ করে দাও', তবে তাকে হয় মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয় তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং' বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখাশোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে

আমরা অনেকসময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন 'আচ্ছা বেশ। তাঁকে খুব সহজ করে দিচ্ছি'— ব'লে সেই যিনি 'নিহিতং গুহায়াং' তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন খুশি একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তা হলে বলতেই হবে তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরও গোপন করে দিলেন। এরকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর ব'লেই তাঁকে চায়। সেই গভীর আনন্দ আর-কিছুতে মেটাতে পারে না ব'লেই তাঁকে চায়। চোখে-দেখা কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে, তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে-সমস্ত কিছু চায় না ব'লেই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা করো— এবং যখন তাঁকে পাবে, তোমার গুহাশয়-রূপেই তাঁকে পাবে; অন্য রূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না, সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না; তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা সর্বত্রই তিনি গুহাহিতং— কি সাহিত্যে, কি ইতিহাসে, কি শিল্পে, কি ধর্মে, কি কর্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য— 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' এই কথাটি যে মানুষ বলতে পেরেছে এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এই-জন্যেই সে গভীরকে চায়। তবু যদি তুমি বল 'আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও', তবে তুমি আর-কিছুকে চাচ্ছ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝেছি, তার মতো কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতিপ্রত্যক্ষগোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহু-কালের বহু চেষ্টায় এই সহজ দেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে— যা-কিছু পাওয়ার মতো পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ করে তবে কর্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মতো সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এইজন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে— বারম্বার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারছে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে। ভালোবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য হোক, একে সে

কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না; তাকে বলতেই হবে, 'যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য, তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্য-সাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয়, সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গূঢ়নিহিত মানুষটির যথার্থ জীবন— কেননা, তার পক্ষে 'নাল্পে সুখমস্তি'।'

জ্ঞানে ভাবে কর্মে মানুষের পক্ষে সর্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে সর্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম করে গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা করে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে এ কথা বলে না, 'টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।' টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মতো সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উল্টা কথা বলতে যাব? কেন বলব 'তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই'? কেন বলব 'আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ ক'রে তাঁকে হাতে-হাতে চোখে-চোখে ফিরিয়ে বেড়াব'?

না, কখনও তা আমরা চাই নে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি— না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি ক'রে একটু একটু ক'রে বিকশিত হয়ে উঠছে। হে গূঢ়, তুমি গূঢ়তম বলেই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্মকে গভীর হতে গভীরতরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্ছে, তার বন্ধন আলগা করে দিচ্ছে, তার জীবনমরণের তুচ্ছতা দূর করছে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম সুর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্ত তোমার ওই অনির্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্ক্ষার আবেগ, এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে চলেছ। হে গূঢ়নিহিত, তোমার গোপনতার শেষ নেই বলেই জগতের যত প্রেমিক, যত সাধক, যত মহাপুরুষ, তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে তাঁরা দুঃখকে অলংকার করে পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে বরণ করেছেন। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটোচ্ছে— তারা বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে— তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলই ছোটো ও জগতে

তাদের সমস্ত অধিকার কেবলই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্বল কল্পনা করে তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে তারা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গৌরবকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে তুমি তারই চিরন্তন বন্ধু, প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের ওই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চলব—আমার সমস্ত যাত্রাসংগীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে—পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে, কোনো ছোটোকে. কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে—আমার আনন্দের আবেগ-ধারা সমুদ্রে চির-কাল বহমান হবার সংকল্প ত্যাগ ক'রে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

২৩ চৈত্র ১৩১৬

দুর্লভ

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

'পারি নে' যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারি নে; যেমন করে নিশ্বাস গ্রহণ করছি, কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্ছে না, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারি নে।

কিন্তু, গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয়; ইন্দ্রিয়বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্মবুদ্ধি পর্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূরে টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ-হয়ে-ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বলবে 'আমি পারি নে' সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চলতে শিখতে হয় নি। মানুষকে অনেক দিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে; 'আমি পারি নে' বলে

সে নিষ্কৃতি পায় নি। মাঝে-মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানব-শিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই-সব মানুষ জন্তুদের মতো হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেইজন্য শিশুদের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু, মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়া হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনই সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনই পৃথিবীর উপরে সে কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু, শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবনযাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানছে তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ালো, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুলতে পারল, তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে কষ্ট করে শিখতে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহু কষ্টে শিখতে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, চলা বলা, এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়মসংযম মানলে তবে চার দিকের মানুষের সঙ্গে তার আদান-প্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ, সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়— ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকারলাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখছি, কানে শুনছি, তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এইজন্যই বিদ্যালয় বলে কত বড়ো একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়— তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুড়ি-পঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয় এবং যাঁদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখতে পাই, মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করছে। আহারের জন্যে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্যে আকাশে দূরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল', জ্ঞানের রাজ্যেই বল', সামাজিকতার রাজ্যেই বল', সর্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্যে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে 'পারি নে' তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না

তারই মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে—সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, অনাবশ্যক দুঃসাধ্য-সাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর-কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিসটা নেই। যেটা সহজ, যেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখলে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে সে কেবল প্রয়োজনসাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে প'ড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্যসাধনের জন্যে নয়। কিন্তু, মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এইজন্যেই যে ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুনতে পাই বারম্বার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষারমরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে, তখন এই কার্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের একটা-কিছু কষ্টের হেতু আছে—এমন একটা-কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে 'পারি নে' এ কথাটা বলতে দেওয়া হয় নি, তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে, সত্য হবে, এ সম্বন্ধেও 'পারি নে' বলা তার চলবে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে, আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায় তবেই এ কথা বলা তার সাজবে না যে 'আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়'।

যতই সহজ ও যতই আরামের হোক, তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মতো চলে বেড়াব না, মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ ছিল বলেই মানুষ যেমন বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে—এবং সেই আকাশে মাথা তুলেছে ব'লে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয় নি, বরঞ্চ পশুর চেয়ে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে—তেমনি আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর-একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে : আমরা কেবলই সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মতো ধুলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না; অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না, বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে ব'লে হাতের ব্যবহার পায় না, তেমনি বিষয়ী-লোক সংসারে চার পায়ে চলে ব'লে কেবল চলে মাত্র, সে ভালো করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারে না। কিন্তু, যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে

মাথা তুলে চলতে শিখেছেন তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়—তাঁদের দুই হাত মুক্ত হয়েছে; তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে; তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা।

যে সৃষ্টিকর্তা সে আপনাকে সর্জন করে; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে। যে পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টি-শক্তি। এই সৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে পরিমাণে স্বার্থবর্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা তার কর্ম সৃষ্ট হয়ে উঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিক লোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে 'পারি নে' বললে চলবে না; চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার 'মহতী বিনষ্টিঃ'।

যে ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই নিজেকে উৎসর্জন করছে, যিনি 'আত্মদা', আমি জলে-স্থলে-আকাশে সুখে-দুঃখে সর্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি—এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্ছে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্ছে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চলতে শেখা। অনেকবার টলতে হবে, বারবার পড়তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না 'তবে বুঝি পারব না'। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা, অন্তরের মধ্যে এই দিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে—এইজন্যে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না, তাকে বরণ করে নেয়—এইজন্যেই মানুষ এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা ব'লে জগতের অন্য-সকল প্রাণীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে: ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

জন্মোৎসব

বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ—এতে আমার অনেক দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেক-দিন আমার মনে জাগে নি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করে নি।

বস্তুত, নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়ো নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরম লাভ বলে মনে করেছিলেন উৎসব তাঁদেরই। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ-উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড়ো করে উপলব্ধি করে-ছিলেন, তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে—সংসারে তার আবির্ভাব-যে পরমরহস্যময় এবং সে-যে চিরদিন এখানে থাকবে না, সে কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে—মনে হয়, তার ক্ষতিও নেই বৃদ্ধিও নেই, সে আছে তো আছেই; তার মধ্যে অনন্তের প্রকাশ আর আমরা দেখতে পাই নে। তখন যদি আমরা উৎসব করি সে বাঁধা প্রথার উৎসব—সে এক-রকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না; সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না; তখন সে যেন আমাদের কাছে এক-রকম ফুরিয়ে আসে। সেরকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চলতে পারে, কিন্তু উৎসব চলতে পারে না; কারণ, উৎসব জিনিসটাই হচ্ছে নবীনতার উপলব্ধি—তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্ছে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেইখানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি ঊনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ছে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জ্বলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে 'আজ তোমার জন্মদিন'। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ, সেইরকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যে দিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র সে দিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত—নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহদৃষ্টির পথ বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠত। বস্তুত, জীবন তখন আমার সামনেই—পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মতো অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্বচনীয়ের তান লাগাতে থাকত।

পথ তখন নির্দিষ্ট হয় নি। নানা দিকে তার শাখা প্রশাখা। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কী পাব তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হয়ে উঠত।

ঝর্না যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতি-পরিবর্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দিষ্ট হয় তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারও জীবনের ধারা যখন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথে স্ফীত হয়ে বইতে লাগল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সংকুচিত হয়ে চলতে থাকল। তখন নিজের জীবনকে বারম্বার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এইজন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর-কোনো নূতন আশার সুরে বাজতে থাকল না। সেইজন্যে জন্মদিনের সংগীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বন্ধ হয়ে এল তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটি নিবে এল। আমার বা আর-কারও কাছে এর আর-কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

এমন সময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম তো আমার অর্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে-যে কবেকার পুরানো কথা তার আর ঠিক নেই—মৃত্যুদিনের মূর্তি তার চেয়ে

অনেক বেশি কাছে এসেছে—এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার?

এমন সময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল, এবং সেই কথাটাই তোমাদের সামনে আমি বলতে ইচ্ছা করি।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে। জগতে আমরা অনেক জিনিসকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, তারা আমাদের চারি দিকেই আছে, কিন্তু তাদের আমরা পাই নি, তারা আমাদের আপন নয়; তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বলছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্ছে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত-কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্তেই আপনার লোককে পায়—পরিচয়ের আরম্ভ-কাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না—না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার কোনো প্রয়োজন হয় নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মতো আপন করে পাওয়া যায় তখনো এই সাজসজ্জা, এই গীতবাদ্য। 'তুমি আমার আপন' এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না—এতে সৌন্দর্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল 'তোমাকে আমরা পেয়েছি', সেই দিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, 'তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা, তুমি যে আমাদের আপন; তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।'

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করছ তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা বলতে পারি নে।

বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়—তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন্ রহস্য-ধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম কে জানে। কিন্তু, জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা, সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মতো আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর-একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে। সেইজন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্বজীবনের মধ্যে, আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাত লোক ছিল।

সেইজন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি, এ আমার সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-এক দিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্ছে কেন্দ্রবর্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়—এখানে সে অনেকের অন্তর্বর্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্ছি কেন্দ্র, অন্য-সমস্ত তার পরিধি—মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্বর্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালোমন্দেই তার ভালোমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারি নে; মায়ের কোলেই, ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে

থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক থেকে এ যেমন অন্তরের দিক থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেইরকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারি নে। ভ্রূণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠি নে। তখন আমরা চলতে চাই, কারণ চারি দিকে চলার ক্ষেত্র অবাধবিস্তৃত— কিন্তু, চলতে পারি নে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্ছে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মতো চলতে গিয়ে বারবার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু, শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে-ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে তখনও যেমন জানা যায় সে এই চলা ফেরা জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে বয়স্কদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকে না, তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্রপরিবর্তন হয়েছে সে কথা এক রকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন-কি, জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতরো বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে তখন সে দ্বিধা-হীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে, তখন অনেক দুঃখ-স্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না, কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয় —কারণ, এ লোকের জীবনই হচ্ছে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকে না, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে; তার অন্তরাত্মা যে ডালকে আশ্রয় করে তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রে সে অহংকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে অহংকার গোপনে সেই শ্রেয়কেই আশ্রয় ক'রে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি ক'রে প্রথম অবস্থায় বিরোধ-অসামঞ্জস্যের বিষম ধন্দের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি এখানে আমার পূর্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এইজন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই

প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু, এ কথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মতো আশ্রয় করেছি মাত্র বয়স্কের মতো একে আমি অধিকার করতে পারি নি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসংগতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি, সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ— একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি, সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ— এবং সেইজন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ এ কথা যদি সত্য হয় তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব, তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এইসঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যে লোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ এ লোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে না। এই আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝর্নাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানা সুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে, একটি বৃহৎ ধারায় সম্মিলিত হয়ে নদীজন্ম লাভ করে— তোমাদের ছোটো ছোটো জীবনের ধারাগুলি তেমনি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার ক'রে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জানতে— সেই জানার সংকীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছ— এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ, এই হচ্ছে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্তসম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোনো সংকীর্ণ ব্যবধান নেই; এখানে তিনিই পিতা হয়ে, প্রভু হয়ে আছেন য একঃ, যিনি এক— অবর্ণঃ, যাঁর জাতি নেই— বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজনসকল বিধান করছেন— বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি— স দেবঃ, সেই দেবতা। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়-বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫ বৈশাখ ১৩১৭

শ্রাবণসন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর যত-কিছু কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়— এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমত তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্‌ ঝর্‌ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরও গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুলছে— শিশু তার নূতন-শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেইরকম— তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই-যে হঠাৎ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে— সেও কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে। ওইরকম খুব বড়ো করেই বলতে চায়, ওইরকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়—কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়— সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে. তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রঙ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং

ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিসগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সংকোচ এবং নিত্য-ব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করছে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলছি, আমার কথা আজ থাক্। সংসারের কাজকর্মের সীমাকে, মনুষ্যলোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশ-ভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর-এক মূর্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখো— গাছের ফুল। তাকে দেখতে যতই শৌখিন হোক, সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজসজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হোক, তাকে ফল ফলাতেই হবে; নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিঁকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এইজন্যেই তার রঙ, এইজন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমনি তার পুষ্পজন্ম সফলতালাভের উপক্রম করে অমনি সে আপনার রঙিন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্মমভাবে বিসর্জন দেয়; তার শৌখিনতার সময়মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্‌হন্ করে ছুটে চলেছে; যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ত কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে যায় 'নামঞ্জুর'— তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ওই ফুলটিকে যে দেখছ অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রঙিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে; তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়, বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু, এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে : 'তুমি ভুল বুঝছ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করা; তার সঙ্গে সৌন্দর্যমাধুর্যের যে অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ সে তোমার নিজের পাতানো।'

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, 'কিছুমাত্র ভুল বুঝি নি। ওই ফুলটি কাজের পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে আঘাত করে। এক দিকে আসে বন্দীর মতো, আর-এক দিকে আসে মুক্তস্বরূপে— এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয়, এ কথা কেমন করে মানব। ওই ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্য-কারণসূত্রে ফুটে উঠেছে এ কথাটাও সত্য, কিন্তু সে তো বাহিরের সত্য— আর অন্তরের সত্য হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'

ফুল মধুকরকে বলে, 'তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি।' আবার মানুষের মনকে বলে, 'আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি।' মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে কিছুমাত্র ঠকে নি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস ক'রে তাকে ধরা দেয় তখন দেখতে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলে নি।

ফুল যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করছে তা নয়— মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ তা সে বরাবর করে আসছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী। প্রকৃতির দরজায় যে ফুলকে যথাঋতুতে যথাসময়ে মজুরের মতো হাজরি দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজ-দূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে দূত কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে করে এনেছিল; এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে— তখনি তিনি বুঝলেন রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি; রাক্ষস আমাদের কেবলই বলছে, 'আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'

কিন্তু, সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ওই ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে; তিনি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।'

যদি তখন আমরা জেগে থাকি তো তাকে বলি, 'তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা জানব কী করে।' সে বলে, 'এই দেখো আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, এর কেমন শোভা!'

তাই তো বটে। এ-যে তাঁরই আংটি, মিলনের আংটি। আর-সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দময়ের আনন্দস্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনি আমরা বুঝতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়—এর বাইরে আমার মুক্তি আছে; সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন, মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনা প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙিন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হোক-না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানাঘরের কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্য-কারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্‌ ঝম্‌ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির; একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের; বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি; একই সময়ে এক দিকে তার কর্ম, আর-এক দিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই-যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধকারসভায় আমাদের কাছে এ কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে, কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই; সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই করুণ গান জেগে উঠছে—

> তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী,
> অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
> বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
> হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে, তুই-যে বিরহিণী— তুই বেঁচে আছিস কী করে! তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে!'

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি, এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেননা, বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জ্বলার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে? ওই-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, যারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর-একজন বাঁধা থেকে দিনরাত্রি কেবল বোবার মতো কাজ করে যাচ্ছে— তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই, এ-যে বিরহের বেদনাগান, এ-যে মিলনের আহ্বানসংগীত। যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না সে-সব খবরকে এরাই তো চুপি চুপি বলে যায়, এবং মানুষ কবি সেই-সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায় কতকটা সুরে বেঁধে গাইতে থাকে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যত দূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার— তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' কিন্তু, তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়— এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহসন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না। কিন্তু, শুধু 'কেমন করে কাটবে' নয় তো, কেমন করে কাটবে **হরি বিনে** দিনরাতিয়া। সেইজন্যে 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে এমন একটি চির-জীবনের ধন কেউ আছে— তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে— বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে— সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন

থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।

দ্বিধা

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। এক দিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর-এক দিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারই সামঞ্জস্যসংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চির-জীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যত-কিছু অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্যশিল্প সমস্তই হচ্ছে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়-চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হচ্ছে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাকস্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিসের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে। গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে— ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্যসাধনের জন্যে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার আর সীমা নেই। উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই অথবা যেখানে তার মিলনসাধনের জন্যে বাইরের উপায় কাজ করে, সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে, তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক— এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।

যতদিন ভালো করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান-পতনের দুঃখ, সে বড়ো বিষম দুঃখ। যে ধর্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে সেই ধর্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা; এ কথা তার বলবার জো নেই যে 'এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চলব'। এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয়; সেই দুর্গতি যে কী নিদারুণ পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই— তারা কেবলমাত্র পশু, তারা কেবলমাত্র শরীরধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চলবে, এতে তাদের কোনো ধিক্কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসংকোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সংকোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ-আড়ালের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়। তার আহার বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত। নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-গুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন—এমন-কি, নিজের নিত্যসহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ, মানুষ-যে পশু এবং মানুষ দুইই। এক দিকে সে আপনার, আর-এক দিকে সে বিশ্বের। এক দিকে তার সুখ, আর-এক দিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না, কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক। যদি জানতে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে তা হলেই বুঝতে পারি, এ-সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই-সকল আপাত-অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায় অন্ধকারবাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি—বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে, সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না—উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয় তবে সেই-সমস্ত স্বার্থ-বিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে-সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবার বেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন-কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়—যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে—যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জন করতে প্রবৃত্ত করে—তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই—তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে, মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্ছে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধন। কারণ, স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাকলেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই তখনি আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনি আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য-সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানে না বলেই তার মাকে জানে না; যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে তখনি সে মাকে জানে।

সেইজন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গল-লোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলই টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে

যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে, এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই : মা মা হিংসী! আমাকে আঘাত কোরো না, আমাকে আর আঘাত কোরো না! আমি এমন করে কেবলই দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচি নে!

কিন্তু, এ পিতারই হাতের আঘাত, এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না—পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না, মানুষ পশুদের মতো অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই জন্যে মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না 'বিশ্বানি দেব সবিতদুর্রিতানি পরাসুব'—হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও! এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজনসাধনের প্রার্থনা নয় : মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে, 'আমাকে পাপ হতে মুক্ত করো। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না। পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারছি নে। হে অপাপ-বিদ্ধ নির্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা, এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারছে না। তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারছি নে।'

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। যা ভালো তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা; কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব—ভালো যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই 'যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব' এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা, দুঃখের প্রার্থনা—নাড়ীছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর-কেউ করতে পারে না।

পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। নমস্তেঽস্তু। যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা : তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা ব'লে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ, আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তা হলেই-যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়—আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায় ; সেখানে কোনো অহংকার টিঁকতেই পারে না—ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়। মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহংকারের একান্ত বিসর্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার ?—

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার। যিনি সুখের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার। যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার, যিনি চরমমঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে, কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা ব'লে নমস্কার করছে তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃতসাহিত্যে দেখা গেছে, 'পিতরৌ' বলতে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন— তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর-সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এইজন্যে তাকে দেখাশোনা, তাকে খাওয়ানো-পরানো সাজানো-নাচানো, তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্বপ্রকার আয়োজন ক'রে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু, পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সংকীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ ক'রে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এইজন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি একমাত্র হত, নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত, তা হলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়, তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোটো হয়ে না থেকে বড়ো হয়ে ওঠবার যে দুঃখ তা তাকে না দিলে চলে না। বড়ো হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে-যে সত্য হবে— তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান ভাব ও শক্তি, সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তিলাভ করবে— এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই, আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়— যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়— যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল-যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ— শরীরচালনা করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখতে পাই, বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত

রয়েছে যে, জগৎ চলবে, জীবন চলবে এবং সেইসঙ্গে আমি পদে পদে খুশি হতে থাকব। নক্ষত্রলোকের যে-সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্তী হোক-না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেইজন্য অত বড়ো অচিন্তনীয় বিরাট কাণ্ডও প্রয়োজনবিহীন গৃহসজ্জার মতো হয়ে উঠে আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুমকির কাজে খচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখতে পাচ্ছি, জগতের রাজা আমাকে খুশি করবার জন্য তাঁর বহুলক্ষযোজনান্তরেরও অনুচর-পরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুলতে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্য নয়।

কিন্তু, সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে, বলে যে, 'তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না। এই-সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে মুক্ত হয়ে তোমাকে থাকতে হবে, তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতনভাবে তার মাকে পায়, তেমনি এই-সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গললোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে তখনি সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনি আসক্তির পথে যাবে তখনি সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে; বস্তুকে যখনি চোখের উপরে টেনে আনবে তখনি তাকে আর দেখতে পাবে না, তখনি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।'

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে— এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগসাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গলবোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এই মঙ্গলবোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্ছে : মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়াপরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে, 'দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না। আমাকে পাপ থেকে মুক্ত করো। আমাকে সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।'

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করছে : নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার, আর সেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার— একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চড়ে যে দিকেই হেলি সেই দিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখতে হবে। তাই বলি : নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ। সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার

—মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করছেন, পালন করছেন, তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করছেন তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে। তখন : নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ নেই, বিরোধ নেই—তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর—তখন পিতা এবং মাতা একই—তখন একমাত্র পিতা এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার : নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঊর্ধ্বগামী একাগ্র এই নমস্কার, অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মতো দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার : নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

পূর্ণ

আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।'

তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়সের প্রান্ত—এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে! তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।

যে ছাত্র তার কলেজ-শিক্ষার প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে সে যখন শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাত হাতে কোনো ছেলেকে পাঠশালায় যেতে দেখে, তখন তাকে মনে মনে কৃপাপাত্রই বলে জ্ঞান করে। কেননা, কলেজের ছাত্র এ কথা নিশ্চয় জানে যে, ওই ছেলে শিক্ষার যে আরম্ভভাগে আছে সেখানে পূর্ণতার এতই অভাব যে, সেই শিশুশিক্ষা-ধারাপাতের মধ্যে সে রসের লেশমাত্র পায় না—অনেক দুঃখ ক্লেশ তাড়নার কাঁটাপথ ভেঙে তবে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যেখানে তার জ্ঞান নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে করতে আনন্দিত হতে থাকবে।

কিন্তু, মানুষের জীবন ব'লে যে শিক্ষালয়টি আছে তার আশ্চর্য রহস্য এই যে, এখানকার পাঠশালার ছোটো ছেলেকেও এখানকার এম. এ. ক্লাসের প্রবীণ ছাত্র কৃপাপাত্র বলে মনে করতে পারে না।

তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে তারাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না; এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মানুষের কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের এইখানে একটি প্রভেদ আছে। মানুষের ভারাবাঁধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু, ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ, সেও সুন্দর। সে যদি চারা অবস্থাতেই মারা যায় তবু তার কোথাও অসমাপ্তি ধরা পড়ে না। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয়, তার সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা।

একদিন তো শিশু ছিলুম, সেদিনের কথা তো ভুলি নি। তখন জীবনের আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তখন শরীরের শক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনা, যেমন

অল্প ছিল, তেমনি জীবনের ক্ষেত্র এবং উপকরণও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ঘরের মধ্যে যে অংশ অধিকার করে ছিলুম তা ব্যাপক নয়, এবং ধুলার ঘর আর মাটির পুতুলই দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অথচ আমার সেই বাল্যের জীবন আমার সেই বালক আমির কাছে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। সে-যে কোনো অংশেই অসমাপ্ত তা আমার মনেই হতে পারত না। তার আশাভরসা হাসিকান্না লাভক্ষতি নিজের বাল্যগণ্ডির মধ্যেই পর্যাপ্ত হয়ে ছিল।

তখন যদি বড়ো বয়সের কথা কল্পনা করতে যেতুম তবে তাকে বৃহত্তর বাল্য-জীবন বলেই মনে হত—অর্থাৎ রূপকথা খেলনা এবং লজঞ্জুসের পরিমাণকে বড়ো করে তোলা ছাড়া আর-কোনো বড়োকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করতুম না।

এ যেন ছবির তাসে ক খ শেখার মতো। কয়ে কাক, খয়ে খঞ্জন, গয়ে গাধা, ঘয়ে ঘোড়া। শুদ্ধমাত্র ক খ শেখার মতো অসম্পূর্ণ শেখা আর কিছু হতেই পারে না। অক্ষরগুলোকে যোজনা করে যখন শব্দকে ও বাক্যকে পাওয়া যাবে তখনি ক খ শেখার সার্থকতা হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে ক খ অক্ষর সেই কাকের ও খঞ্জনের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণতালাভ ক'রে শিশুর পক্ষে আনন্দকর হয়ে উঠে, সে ক খ অক্ষরের দৈন্য অনুভব করতেই পারে না।

তেমনি শিশুর জীবনে ঈশ্বর তাঁর জগতের পুঁথিতে যে-সমস্ত রঙচঙ-করা কখ'এর ছবির পাতা খুলে রাখেন তাই বারবার উল্টে-পাল্টে তার আর দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না—সে ছবি দেখেই খুশি হয়ে থাকে; মনে করে, এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তার পরে আঠারো বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম, সেদিন খেলনা লজঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন যে ভাবরাজ্যের সিংহ-দ্বারের সমুখে এসে দাঁড়ালুম সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্‌ করছে এবং ভিতর থেকে যে একটি নহবতের আওয়াজ আসছে তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্ছে। এতদিন ছিলুম বাইরে, কিন্তু সাহিত্যের নিমন্ত্রণচিঠি পেয়ে মানুষের মানসলোকের রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা গেল। মনে হল, এই যথেষ্ট, আর-কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এমনি করে মধ্যযৌবনে যখন পৌঁছনো গেল, তখন বাইরের দিকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তখন এই মানসলোকের বাহিরবাড়িতে ডাক পড়ল। মানুষ যেখানে বসে ভেবেছে, আলাপ করেছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে, সেখানে নয়—ভাব যেখানে কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সেই মস্ত খোলা জায়গায়। মানুষ যেখানে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, যেখানে অসাধ্যসাধনের জয়পতাকা হাতে অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নদী পর্বত সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেইখানে। সেখানে সমাজ আহ্বান করছে, সেখানে দেশ হাত বাড়িয়ে আছে—সেখানে উন্নতিতীর্থের দুর্গম শিখর মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সুমহৎ

ভবিষ্যতের দিকে তর্জনী তুলে রয়েছে। এই বা কী বিরাট ক্ষেত্র! এই যেখানে যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে এসেছেন, এখানে প্রাণ আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারলেই নিজেকে সার্থক বলে মনে করে।

কিন্তু, এইখানে এসেই যে সমস্ত ফুরোয় তা নয়। এর থেকেও বেরোবার দরজা আছে। সেই দরজা যখন খুলে যায় তখন দেখি, আরও আছে, এবং তার মধ্যে শৈশব যৌবন বার্ধক্য সমস্তই অপূর্বভাবে সম্মিলিত। জীবন যখন ঝর্নার মতো ঝরছিল তখন সে ঝর্নারূপেই সুন্দর, যখন নদী হয়ে বেরোল তখন সে নদীরূপেই সার্থক, যখন তার সঙ্গে চার দিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে তখন মহানদরূপেই তার মহত্ত্ব— তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে সংগত হল তখন সেই সাগরসংগমেও তার মহিমা।

বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর।

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে এই কথাই আমি চিন্তা করছি। আমি দেখছি তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন— তাঁর সামনে একটি অভাবনীয় তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পঞ্চাশে পদার্পণ করে আমার সামনেও সেই অভাবনীয়কেই দেখছি। নূতন আর-কিছুই নেই, শক্তির পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পথের সীমায় এসে ঠেকেছি, এ কথা কোনোমতেই বলতে পারছি নে। আমি তো দেখছি, আমিও একটি বিপুল বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। বাল্যের জগৎ, যৌবনের জগৎ, যা পার হয়ে এসেছি বলে মনে করেছিলুম, এখন দেখছি, তার শেষ হয় নি— তাকেই আবার আর-এক আলোকে আর-এক অর্থে আর-এক সুরে লাভ করতে হবে, মনের মধ্যে সেই একটি সংবাদ এসেছে।

এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি, অথচ চলেওছি। শিশুকালের যে পৃথিবী, যে চন্দ্রসূর্যতারা, এখনো তাই— স্থান-পরিবর্তন করতে হয় নি, অথচ সমস্তই বেড়ে উঠেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি যে পড়বে তাকে যদি কোনোদিন কালিদাসের কাব্য পড়তে হয় তবে তাকে স্বতন্ত্র পুঁথি খুলতে হয়। কিন্তু, এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে— সেই পুঁথিকে শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, যুবা পড়ছে কাব্যের মতো, এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে ভাগবত। কাউকে আর নড়ে বসতে হয় নি— কাউকে এমন কথা বলতে হয় নি যে 'এ জগতে আমার চলবে না— আমি একে ছাড়িয়ে গেছি— আমার জন্যে নূতন জগতের দরকার।'

কিছুই দরকার হয় না এইজন্যে যে, যিনি এ পুঁথি পড়াচ্ছেন তিনি অনন্ত-নূতন— তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত পাঠকে নূতন করে নিয়ে চলেছেন— মনে হচ্ছে না যে কোনো পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

এইজন্যেই পড়ার প্রত্যেক অংশেই আমরা সম্পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছি— মনে হচ্ছে, এই যথেষ্ট—মনে হচ্ছে, আর দরকার নেই। ফুল যখন ফুটছে তখন সে এমনি করে ফুটছে যেন সেই চরম, তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই। তার কারণ হচ্ছে, পরিণত ফলের মধ্যে যাঁর আনন্দ অপরিণত ফুলের মধ্যেও তাঁর আনন্দের অভাব নেই।

শৈশবে যখন ধুলোবালি নিয়ে, যখন নুড়ি শামুক ঝিনুক ঢেলা নিয়ে খেলা করেছি, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদিকালের ভগবান শিশুভগবান হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে শিশু না হতেন এবং তাঁর সমস্ত জগৎকে শিশুর খেলাঘর করে না তুলতেন, তা হলে তুচ্ছ ধুলোমাটি আমাদের কাছে এমন আনন্দময় হয়ে উঠত না। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মতো হয়ে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন, এইজন্যে শিশুর জীবনে সেই পরিপূর্ণস্বরূপের লীলাই এমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয়; কেউ তাকে ছোটো বলে, মূঢ় বলে, অক্ষম বলে অবজ্ঞা করতে পারে না—অনন্ত শিশু তার সখা হয়ে তাকে এমনি গৌরবান্বিত করে তুলেছেন যে, জগতের আদরের সিংহাসন সে অতি অনায়াসেই অধিকার করে বসেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

আবার সেইজন্যেই আমার উনিশ বৎসরের যুবাবন্ধুর তারুণ্যকে আমি অবজ্ঞা করতে পারি নে। যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল ধরে কত যুবাকেই যে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছেন তার আর সীমা নেই। তাই যৌবনের মধ্যে চরমের আস্বাদ পেয়ে চিরদিন যুবারা যৌবনকে চরমরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

প্রবীণরা তাই দেখে হেসেছে। মনে করেছে, যুবারা এই-সমস্ত নিয়ে ভুলে আছে কেমন করে! ত্যাগের মধ্যে, রিক্ততার মধ্যে যে বাধাহীন পরিপূর্ণতা সেই অমৃতের স্বাদ এরা পায় নি। তিনি চিরপুরাতন যিনি পরমানন্দে আপনাকে নিয়তই ত্যাগ করছেন, যিনি কিছুই চান না; তিনিই বৃদ্ধের বন্ধু হয়ে পূর্ণতার দ্বারস্বরূপ যে ত্যাগ, অমৃতের দ্বারস্বরূপ যে মৃত্যু, তারই অভিমুখে আপনি হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন।

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে না ধরা দিতেন তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তবে তিনি আমাদের কাছে 'না' হয়েই থাকতেন। কিন্তু, পদে পদে তিনিই আমাদের 'হাঁ'। বাল্যের মধ্যে যে হাঁ সে তিনিই, সেইখানেই বাল্যের সৌন্দর্য; যৌবনের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই যৌবনের শক্তি সামর্থ্য; বার্ধক্যের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই বার্ধক্যের চরিতার্থতা। খেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, এবং ত্যাগের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি।

এইজন্যেই পথও আমাদের কাছে এমন রমণীয়, এইজন্যে সংসারকে আমরা ত্যাগ করতে চাই নে। তিনি-যে পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। পথের

উপর আমাদের এই-যে ভালোবাসা এ তাঁরই উপর ভালোবাসা। মরতে আমরা যে এত অনিচ্ছা করি এর মধ্যে আমাদের মনের এই কথাটি আছে যে, 'হে প্রিয়, জীবনকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছ।'— ভুলে যাই, যিনি প্রিয় করেছেন মরণেও তিনিই আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

আমাদের বলবার কথা এ নয় যে, এটা অপূর্ণ, ওটা অপূর্ণ, অতএব এ-সমস্তকে আমরা পরিত্যাগ করব। আমাদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে, এরই মধ্যে যিনি পূর্ণ তাঁকে আমরা দেখব। ক্ষেত্রকে বড়ো করেই যে আমরা পূর্ণকে দেখি তা নয়, পূর্ণকে দেখলেই আমাদের ক্ষেত্র বড়ো হয়ে যায়। আমরা যেখানেই আছি, যে অবস্থায় আছি, সকলের মধ্যেই যদি তাঁকে দেখবার অবকাশ না থাকত, তা হলে কেউ কোনো কালেই তাঁকে দেখবার আশা করতে পারতুম না। কারণ, আমরা যে যতদূরেই অগ্রসর হই-না, অনন্ত যদি ধরা না দেন তবে কোনো কৌশলে কারও তাঁকে নাগাল পাবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

কিন্তু, তিনি অনন্ত বলেই সর্বত্রই ধরা দিয়েই আছেন— এইজন্যে তাঁর আনন্দরূপের অমৃতরূপের প্রকাশ সকল দেশে, সকল কালে। তাঁর সেই প্রকাশ যদি আমাদের মানবজীবনের মধ্যে দেখে থাকি তবে মৃত্যুর পরেও তাকে নূতন করে দেখতে পাব, এই আশা আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবজীবনে সে সুযোগ যদি না ঘটে থাকে, অর্থাৎ যদি না জেনে থাকি যে যা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সে তাঁরই আনন্দ, তবে মৃত্যুর পরে যে আরও-কিছু বিশেষ সুযোগ আছে এ কথা কল্পনা করবার কোনো হেতু দেখি নে।

অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু, তাঁর যে অন্ত নেই এ কথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান? নেতি নেতি ক'রে জানান না, ইতি ইতি ক'রেই জানান। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই এ কথা জানতে পারি, সর্বত্রই ইতি, সর্বত্রই সেই 'এষঃ'। জীবনেও সেই এষঃ, জীবনের পরেও সেই এষঃ। কিন্তু, তিনি নাকি অন্তহীন, সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনোদিন পুরাতন নন; চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জানব, নূতন করেই পাব, তাঁতে নূতন করেই আনন্দলাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মতো একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম তা হলে অনন্তকে পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব, এ কখনো হতেই পারে না। কিন্তু, সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতর রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চলব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই— তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র।

[১১.৪.১৩১৭]

মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি কোনো ইংরেজি বইয়ে পড়েছি যে, ঈশ্বরকে যে পিতা বলা হয়ে থাকে সে একটা রূপকমাত্র। অর্থাৎ, পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের যে রক্ষণ-পালনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য অবলম্বনে তাঁকে পিতা বলা হয়।

কিন্তু, এ কথা আমরা মানি নে। আমরা তাঁকে রূপকের ভাষায় পিতা বলি নে। আমরা বলি, পিতামাতার মধ্যে তিনিই সত্য পিতামাতা। তিনিই আমাদের অনন্ত পিতামাতা, সেইজন্যেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চিরকাল পেয়ে আসছে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মানুষের পিতামাতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে আসছেন। পিতার মধ্যে পিতারূপে যে সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে সত্য সে তিনি।

পিতামাতাকে যদি প্রাকৃতিক দিক থেকে দেখাই সত্য দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মর্তজীবনের প্রাকৃতিক কারণমাত্র যদি তাঁরা হতেন, তা হলে এই পিতা-মাতা-সম্ভাষণকে আমরা ভুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্তু, মানুষ পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড়ো জিনিসকে অনুভব করেছে —পিতামাতার মধ্যে এমন একটি পদার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ পিতামাতার সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে; পিতামাতার মধ্যে এমন একটা-কিছু পেয়েছে যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রসূর্যগ্রহ-তারাকে যিনি অনাদি-অনন্তকাল নিয়মিত করছেন সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে : পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা। এ কথা যে নিতান্তই হাস্যকর প্রলাপবাক্য এবং স্পর্ধার কথা হত যদি এ কেবলমাত্রই রূপক হত। কিন্তু, মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে বিশেষভাবে অনন্তের মধ্যে দেখেছে, এবং অনন্তকে বিশেষভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেইজন্যেই এমন দৃঢ় কণ্ঠে এত বড়ো অভিমানের সঙ্গে বলতে পেরেছে 'পিতা নোঽসি'।

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে অমৃতের ধারা লাভ করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও তার সীমা নেই, দেখেছে যেখান থেকে সূর্য-নক্ষত্র তাদের নিঃশেষহীন আলোক পাচ্ছে, জীবজন্তু যেখান থেকে অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চলে আজ পর্যন্ত কোনো শেষে গিয়ে পৌঁছল না, সেই জগতের অনাদি আদিপ্রস্রবণ হতেই ঐ অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে; অনন্ত ঐখানে আমাদের কাছে যেমনি ধরা পড়ে গেছেন অমনি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি—'পিতা নোঽসি'—বলেছি 'যাকেই পিতা বলে ডাকি-না কেন, তুমিই আমাদের পিতা'।

'তুমি যে আমাদেরই' অনন্তকে এমন কথা বলতে শিখলুম এইখান থেকেই। 'তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য কারবার নিয়ে তুমি আছ সে কথা ভাবতে গেলেও ভয়ে মরি, কিন্তু ধরা পড়ে গেছ এইখানেই—দেখেছি তোমাকে

পিতার মধ্যে, দেখেছি তোমাকে মাতার মধ্যে, তাই তুমি যত বড়োই হও-না কেন, পৃথিবীর এই এক কোণে দাঁড়িয়ে বলেছি : তুমি আমাদের পিতা। পিতা নোঽসি। আমাদের তুমি আমাদের। আমার তুমি আমার।'

এমন করে যদি তাঁকে না পেতুম তবে তাঁকে খুঁজতে যেতুম কোন্ রাস্তায়? সে রাস্তার অন্ত পেতুম কবে এবং কোন্‌খানে? যত দূরেই যেতুম তিনি দূরেই থেকে যেতেন। কেবল তাঁকে অনির্বচনীয় বলতুম, অগম্য অপার বলতুম।

কিন্তু সেই অনির্বচনীয় অগম্য অপার তিনিই আমার পিতা, আমার মাতা, তিনিই আমার— মানুষকে এই একটি অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনধিগম্য, এক মুহূর্তে এত আশ্চর্য সহজ হয়েছেন।

একেবারে আমাদের মানবজন্মের প্রথম মুহূর্তেই। মার কোলে মানুষের জন্ম, এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্তেই তার অধিকারের আর অন্ত নেই; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এত বড়ো স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জন করতে হয় নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে, বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার আপন হত না। মাতাই তাকে জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপগ্রহণ ক'রে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে— সে কে? এমনটা পারে কে? এ শক্তি আছে কার? সেই অনন্ত প্রেম যিনি সকলকেই চেনেন এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

এইজন্যে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন তখন জানাশুনা-চেনাপরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার হয় না, তখন রূপগুণ-শক্তিসামর্থ্যের আসবাব-আয়োজনও বাহুল্য হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন করে হিসেব করে চিনতে হয় না। চিরকাল তাঁর যে চেনাই রয়েছে, সেইজন্যে তাঁর আলো যেখানে পড়ে সেখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না।

শিশু মা-বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখলে তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল 'এসো এসো'। সেই ধ্বনি মা-বাপের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে এল, কিন্তু সে কি মা-বাপেরই কথা? সেটি যাঁর কথা তাঁকেই মানুষ বলেছে 'পিতা নোঽসি'।

শিশু জন্মালো আনন্দের মধ্যে, কেবল কার্যকারণের মধ্যে নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুশি, মা-বাপকে নিয়ে তার খুশি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আরম্ভ হল। এই যে আনন্দ এ আনন্দ ছিল কোথায়? এ আনন্দ আসে কোথা থেকে? যে পিতামাতার ভিতর দিয়ে শিশু একে পেয়েছে সেই পিতামাতা একে পাবে কোথায়? এ কি তাদের নিজের

সম্পত্তি? এই আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্তেই যেখান থেকে এসে পৌঁছল সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হয় তখনি এত বড়ো কথা সে অতি সহজেই বলে, 'পিতা নোঽসি। তুমিই আমার পিতা, আমার মাতা।'

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমাকে জানিয়েছেন, আজ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাঁকে বলছি, আজ তাঁর মাতাকে খুব বড়ো করে দেখবার দিন, বিশ্বমাতার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখবার দিন।

মা যখন ইন্দ্রিয়বোধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন তখন তাঁকে এত বড়ো করে দেখবার অবকাশ ছিল না। তখন তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তাঁর সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে—যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য সেই-খানেই আজ তাঁকে দেখে নিতে হবে। যিনি জন্মদান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়সাধন করিয়েছেন, আজ তিনি মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে দিয়ে সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মূর্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে দিন্।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি— শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে একটি মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে-দেখা কানে-শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি, সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারি নে।

আমার চোখে-দেখা কানে-শোনা দিয়েই তো আমি জগৎকে সৃষ্টি করি নি যে আমার দেখাশোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে চোখে দেখছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখি নে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি নে, তখনো তাঁরই মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা তো ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আমি যাকে দেখছি নে তিনি তাকে দেখছেন, আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়ছে না।

সেই অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের দেখার মধ্যেই আজ মাকে দেখতে হবে; আজ এই শ্রদ্ধাটিকে হৃদয়ে জাগ্রত করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, মা সত্যের মধ্যে আছেন; শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, তিনি কখনোই হারাতে পারেন না। সত্যের মধ্যে মা চিরকাল ছিলেন বলেই তাঁকে একদিন পেয়েছি, নইলে একদিনও পেতুম না—এবং সত্যের মধ্যেই মা আছেন বলেই আজও তাঁর অবসান নেই।

সত্যের মধ্যেই, অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে, এ কথা আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থত উপলব্ধি করি। যাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহপ্রেমের, আমাদের জীবনের গভীর যোগ নেই, তারা আছে কি নেই তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না—সুতরাং, মৃত্যুতে তারা আমাদের কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলেই জানি।

কিন্তু, এ মৃত্যুর অর্থ কী ভেবে দেখো। যে মানুষকে আনন্দের মধ্যে

দেখি নি তাকে অমৃতের মধ্যেই দেখি নি— আমার পক্ষে সে কেবলমাত্র চোখে-দেখা কানে-শোনার অনিত্য লোকেই এতদিন ছিল— যেখানে তাকে সত্যরূপে বৃহৎরূপে অমররূপে দেখতে পেতুম সেখানে সে আমাকে দেখা দেয় নি।

যেখানে আমার প্রেম সেইখানেই আমি নিত্যের স্বাদ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ চলে যায়, মানুষের মূল্যের সীমা থাকে না। সেই প্রেমের মধ্যে যে মানুষকে দেখেছি তাকেই আমি অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত সীমাকে অতিক্রম ক'রে তার মধ্যে অসীমকে দেখতে পাই, এবং মৃত্যুতেও সে আমার কাছে মরে না।

যাকে আমরা ভালোবাসি মৃত্যুতে সে যে থাকবে না এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে; প্রেম যে তাকে নিত্য বলেই জানে, সুতরাং মৃত্যু যখন তার প্রতিবাদ করে তখন সেই প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে এতই কঠিন হয়ে ওঠে। যে মানুষকে আমার অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখব কেমন করে।

মনের ভিতরে তখন একটি কথা এই ওঠে— প্রেম কি কেবল আমারই? কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়? যে শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালোবাসছি, আনন্দ পাচ্ছি, সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না? আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য, সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই? তাঁর সেই অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠি নি? যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই?

প্রিয়জনেরই মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই তো আমাদের শ্রদ্ধার দিন— সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি; আমরা বলি, মাকে দেখছি নে, কিন্তু মা আছেন। চোখে দেখে হাতে ছুঁয়ে যখন বলি 'মা আছেন' তখন সে তো শ্রদ্ধা নয়— আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শূন্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে সেখানে যখন বলি 'মা আছেন' তখন তাকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে যতক্ষণ পাহারা দিচ্ছি ততক্ষণ যাকে বিশ্বাস করি তাকে কি শ্রদ্ধা করি? গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল তারই উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকারময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করছে তাকেই তো যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন। মাতার জীবিতকালে যখন বলেছি 'মা তুমি আছ' তার চেয়ে ঢের পরিপূর্ণ করে বলা আজকের বলা যে 'মা তুমি আছ'। তার মধ্যে আর-একটি গভীরতর শ্রদ্ধার কথা আছে: পিতা নোঽসি। হে আমার অনন্ত পিতামাতা, তুমি আছ, তাই আমার মাকে কোনোদিন হারাবার জো নেই।

যেদিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন সেইদিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্ছে—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যম্— তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য, এই শ্রদ্ধা যেদিন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেই দিনই আমরা বলতে পারি 'আনন্দম্'— তিনিই আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

[১৮. ৫. ১৩১৭]

শেষ

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই-যে লেখা চলছে এই লেখার অন্য সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়িগুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে— একে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্ছে না।

বস্তুত, কবিতা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেননা, কোনো ভালো কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না, যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে— এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একেবারেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো-একটা বিশেষ উপলক্ষে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায় সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে— তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত, এ কেবল এক দিক থেকে থামা, অন্য দিক থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এইরকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, মানুষ থামতে লজ্জা বোধ করে। সেইজন্যেই আমরা ইংরেজের

মুখে প্রায় শুনতে পাই যে জিন্-লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

কোনো-একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে এ কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিস ব'লে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

কিন্তু, ভোগের বা দানের মধ্যে সঞ্চয় যখন আপনাকে ক্ষয় করতে থাকে তখন এক আকারে সঞ্চয়ের অবসান হয় বটে, কিন্তু আর-এক আকারে তারই সার্থকতা হতে থাকে। যেখানে সঞ্চয়ের এই সার্থক অবসান নেই সেখানে লজ্জাজনক কৃপণতা।

জীবনকে যারা এইরকম কৃপণের মতো দেখে তারা কোথাও কোনোমতেই থামতে চায় না, তারা কেবলই বলে 'চলো, চলো, চলো'। থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।

তারা যৌবনকে যৌবন পেরিয়েও টানাটানি করে নিয়ে চলে; সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কাঠ খড় এবং চেষ্টার আর অবধি থাকে না—তা ছাড়া কত লজ্জা, কত ভাবনা, কত ভয়।

ফল যখন পাকে তখন শাখা ছেড়ে যাওয়াই তার গৌরব। কিন্তু, শাখা ত্যাগ করাকে যদি সে দীনতা ব'লে মনে করে তবে তার মতো কৃপাপাত্র আর কে আছে।

নিজের স্থানকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই এই কথাটি মনের মধ্যে রাখতে হবে যে, এই অধিকারকে সম্পূর্ণ করে তুলে একে ত্যাগ করে যাব। 'এই অধিকারকে যেমন করে পারি শেষ পর্যন্ত টানাহেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে, তাতেই আমার সম্মান, আমার কৃতিত্ব' এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিখে এসেছে অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মতো এসে জোর করে টেনে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এইজন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এইজন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেননা, সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারি নে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র-পরিবর্তন হয়, সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে : পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু, সে বন তো আলস্যের বন নয়, সে-যে তপোবন। সেখানে মানুষের এত কালের সঞ্চয়ের চেষ্টা দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শই খুব বড়ো

জিনিস। ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল সে খুব সুন্দর, কিন্তু ফসল ফ'লে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন আরম্ভ হয় তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধানখেতের সমস্ত রৌদ্র-বৃষ্টির ইতিহাস নিবিড়ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে ব'লে কি তার কোনো অগৌরব আছে?

মানুষের জীবনকেও কেবল তার খেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখব না, এমন পণ করলে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়। তাই বলছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে জিনিসটা আদায় করি তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিসটাই দাবি করি, তা হলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয়, নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবি করতে পারি সেটা করার আদর্শ নয়—সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চলছে, কেবলই ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখতে পাই নে—যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবটি, এই স্থির রূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে; খেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে—এইজন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে সমাজে যেরকম দাবি সেই দাবি অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবি করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ ক'রে যোদ্ধা হবার জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র সেখানে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বললেই হয়, সেখানে কেবলই অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে জায়গায় থামে সে জায়গায় কিছুই পায় না, কেবল লজ্জা পায়; সেখানে কাজ একটা মদের মতো, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

সামঞ্জস্য

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারি দিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই;

চারি দিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে প্রবল বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য প্রতি মুহূর্তে প্রবল বেগে কোনো-এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই— আমরা সকালবেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে এ কথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেমনি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা, সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য তো সহজ সামঞ্জস্য নয়— এ তো মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে-সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা, তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা— কেউ বা পিছনের দিকে টানে, কেউ বা সামনের দিকে ঠেলে; কেউ বা গুটিয়ে আনে, কেউ বা ছড়িয়ে ফেলে; কেউ বা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্ছে, কেউ বা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্‌বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই-সমস্ত শক্তি অসংখ্য বেশে এবং অসংখ্য তালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে— তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত; কিন্তু এই-সমস্ত প্রবলতা বিরুদ্ধতা বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তংশিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্যসাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে, এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে— কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনোই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে : এষ সেতুর্বিধরণো লোকানামসম্ভেদায়।

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্‌গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করল। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা

করে কোনো ফল নেই; কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি, এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি-আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত ক'রে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে, তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো সেই দিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো— সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে, শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ ক'রে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না— বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলছে তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাঁদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য, এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে, এত বড়ো একটা বিচ্ছেদ কখনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না— কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধর্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে হৃদয়পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখতে দেখতে একেবারে চতুর্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেক দিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠল।

এখন আবার সকলে একেবারে উল্টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির

চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যেসমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে সাধনায় সেগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগল। তাঁর আর-সমস্তকেই খর্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগচাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগল এবং সেইরকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাববিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু, ভগবানকে এই রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ, মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনোই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনি মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক-না কেন, তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ, যেন পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র, যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষটা যাই হোক, ভক্তির প্রবলতা দেখলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়— কারণ প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এইরকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি, তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপুঞ্জ এক দিকে কাত হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু, সে তো এক দিক থেকে চুরি করে অন্য দিককে স্ফীত করা। যে দিক থেকে চুরি হয় সে দিক থেকে নালিশ ওঠে; তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় মানুষ কখনোই মনুষ্যত্ব লাভ করে না এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মতো ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল— মানুষ যখন পূজা করবার আবেগ-টাকেই প্রার্থনা করলে, কাকে পূজা করতে হবে সে দিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না, এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুত বেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার-বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল— জগদ্‌ব্যাপারের

সর্বত্রই একটা জ্ঞানের ন্যায়ের নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দিকে ধূলিসাৎ হতে চলল—তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে, কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান-নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করে নি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল; দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমন কি, ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশে তৃপ্তি-সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সর্বাংশের ক্ষুধা একদিন না জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়; ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্‌, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কিরকম প্রবল এবং তাকে আপনার মধ্যে কিরকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা

খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ, কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা-কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিস জগতে অনেক আছে— কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয়, যে সত্য চায়, সে তো ভুলতে চায় না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরোতেই হবে— তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে; কিন্তু উপায় নেই, তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই-যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসামাত্র নয়, কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়, এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে— তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয়, আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল, ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই, কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন— এইজন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণবর্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ এক-মুহূর্ত তিনি থামতে পারেন নি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হন নি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেইজন্যেই এ দেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী।

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ কথা বুঝেছেন, ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়— শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেননা সমস্ত রসের সার তিনি : রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাকাব্যের অর্থ বুঝেছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায় তখন বারবার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা— মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে; সে গণ্ডির মধ্যে

আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে এ কথা কাউকে বলে না যে 'তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই'। কেননা, আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়— আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত ক'রে, এতই নিবিড় ক'রে দেখে যে, সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য ব'লে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না; পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক-না, এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এপর্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন; আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদ-বিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না'এর দিক থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ'এর দিক থেকে নয়— এইজন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি-নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনোমতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন তা ভালো করে জানবার পূর্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন— জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এইজন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন— পরিমিত পদার্থের মতো করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মতো যাঁকে না-পাওয়া যায় না— যাঁকে পেতে গেলে এক দিকে জ্ঞানকে খর্ব করতে হয় না, অন্য দিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না— যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দিষ্ট নন— যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন যে 'যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানি নে সেও তাঁকে জানে'— এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন, ভগবৎপিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কিরকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল। অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম-ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্-শিবম্-অদ্বৈতম্— তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরি-

পূর্ণতায় পর্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্‌বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে, এই রসের গাম্ভীর্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন; কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন—তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুত যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন, তাঁরা জানেন যে, তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কিরকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ, মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এইরকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করে নি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশবাক্য-অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হোক, নির্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে

পারে নি। তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়, তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম— নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব-উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই-যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া— দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা— অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা একেই নির্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। এ কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে ইতি-পূর্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্যসাধন এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার-পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্মে যেখানে যথার্থ বীর্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার ক'রে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ ক'রে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেই দিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করি নি। দুর্বলতাবশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্বলতা এপর্যন্ত কেবলই বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন— তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারই মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন : তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতিদুর্গের যে রুদ্ধ দ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে— আপনার ধর্মকে সমাজকে, আপনার আচারব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডির মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে— সেই দ্বার বাইরের

পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে। আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আসতে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, হৃদয়ের সংকোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য ব্যবধানে আমাদের শতখন্ড করে দিচ্ছে, সেইখানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্ছে—সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে এবং সেইখানেই প্রবল-বেগে-চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছি। এইরকম সময়েই যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে ক'রে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশিলষ্টতা দূর হবে—যে বিশিলষ্টতা এ দেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলছে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচার-নিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদ-কাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করে-ছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না—ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্মে কি বিষয়-কর্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে কি ধর্মানুষ্ঠানে, সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্বাঙ্গীণ-ভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্যন্ত যা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার বা সৌন্দর্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটোবড়ো এবং আন্তরিক-বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না; সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে, নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন ক'রে তুলে, তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত দেখা

গেছে, তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি— সর্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসি পর্বতে একবার গিয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, এক দিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্বত্য গৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বসতেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করতেন, তেমনি আবার জ্ঞান-আলোচনার সহায়-স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিনখানি জ্যোতিষ্কসম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনের 'রোমের ইতিহাস' ছিল— তা ছাড়া এ দেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা-কিছু পরিণতি ঘটছে সমস্তই মনে-মনে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্ব-ব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমা-লঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে, গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্বদা কিরকম জাগ্রত ছিল তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক্ স্ট্রীটে বাস করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটী থেকে তিনি আমাকে পার্ক্ স্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধিস্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্ছি, কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবে না।' আমি বেশ বুঝতে পারলুম, শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত-শিব-অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল— সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণচিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে, সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় ক'রে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত, হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক। তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্ত কালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়ছে, এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে

নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করছে। সকল শক্তি সকল কর্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা-ক্ষুদ্রতায়-চঞ্চল বিরোধে-বিচ্ছিন্ন বিভীষিকায়-ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হোক। কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারি দিক ভরে যায়, সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে বিনাশের দিন দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে থাকে— আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্মসাধনায় ও কর্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে; সকল-প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসংগত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলছে; নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও দুর্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল-প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি— সেইজন্যই কোনো-প্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সংকোচমাত্র বোধ করি নে এবং আমাদের সর্ব-প্রকার চিরপ্রচলিত আচারবিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সংকুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য-অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলই নিজের অন্ধতার চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্বেই দুটি-একটি ক'রে ভক্তবিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চমস্বরে আনন্দবার্তা ঘোষণা করছে; আজ আমরা দেশের নব উদ্‌বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ময় কল্যাণসূর্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

সন্ধ্যা। ৭ পৌষ ১৩১৭

জাগরণ

প্রতিদিন আমাদের যে আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম

ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বল বেশ প'রে আমাদের সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন— জাগো, আজ আশ্রমবাসী সকলে জাগো।

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শ-স্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে বিশ্বের কত-হাজার-রকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠতে থাকে, তখনি আমাদের জাগা— আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুই দিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারছে, বলছে 'জাগো'। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আসছে, বলছে 'জাগো'। যেখানে সেই বড়োর আহ্বানে আমাদের ছোটোটি তখনি সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়ছে, প্রত্যেক তারটিকেই বলছে 'জাগো'। যে তারটি জাগছে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সংগীত। যে তার শিথিল, যে তার জাগছে না, সেই তারে আনন্দ নেই; সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সংগীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

এইরকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি? প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্ঘাটিত হয়েছে তা কি আমাদের স্মরণ আছে? জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে— মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে? অন্তরের মধ্যে আমাদের এই-যে জাগরণ, এই-যে নানা দিকের জাগরণ— গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন— এই মনুষ্যত্বের মুক্ত দ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে; সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না, ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে না-যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল 'স কৃপণঃ', সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই-যে জাগা এও কি একটিমাত্র জাগরণ? গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে— সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা? আমাদের চোখ-কান, আমাদের হাত-পা, তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ ক'রে

সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছে? তার পর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে— বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে; যেখানে সাড়া দিচ্ছে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্ছে; যেখানে সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্ছে, সেইখানেই তার চারি দিকে শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থান-পতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে বাতায়নে এই মহা উদ্‌বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে; বলছে, 'ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড়ো করে জানো।' বলছে, 'নিজের কৃত্রিম আচারের, কাল্পনিক বিশ্বাসের, অন্ধ সংস্কারের তমিস্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও : আত্মানং বিদ্ধি।'

এই-যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি—যে জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সংকোচ বিদীর্ণ ক'রে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি—সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরবরাগিণীর প্রভাতী গান ধরেছেন—আজ আমাদের উৎসব সার্থক হোক।

আমরা প্রত্যেকেই এক দিকে অত্যন্ত ছোটো, আর-এক দিকে অত্যন্ত বড়ো। যে দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি—কেবল আমার সুখদুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—যে দিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই—সে দিকটাতে আমি বিন্দুমাত্র, সে দিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে! আর, যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা—যে দিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে, আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে 'তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই—অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি', সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে! এই বড়োর দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটোর দিকে কখনোই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহংকারের অতীত সেই আমার বড়ো-আমিকে সকলের-চেয়ে-বড়ো-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়োদিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি, সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট, অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, এই-যে আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ম খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিলচরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু, এই-যে ঘর ভাঙাবার মূলে আমি, মিলিয়ে দেবার মূলেও হচ্ছেন উনি। পৃথক না হলে মিলনও হয় না; তাই দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগৎ জুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলই পরস্পর বোঝাপড়া করছে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা; তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলছে, আর-এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্ছে। এমনি করে আমি এবং আমি-না'র মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার-ভাঁটা চলেছে। এমনি করে আমি আমাকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানছি, এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে ব'লে আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব। যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার চিরদিনের দুঃখ; যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার চিরকালের আনন্দ। যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার স্বার্থ, সেই দিকে তার পাপ; যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার ত্যাগ, সে দিকে তার পুণ্য। যে দিকে সে পৃথক সেই দিকেই তার কঠোর অহংকার। যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির এক দিকে ভেদ এবং আর-এক দিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্ছে দ্বন্দ্বসমাধানের প্রার্থনা : অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো-র্মামৃতং গময়।

সাধক-কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন—

যব হম রহল রহা নহিঁ কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই, কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ, এই আমি এক দিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্য দিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্ছে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না, একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী; একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম-আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর-কোনোখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেইজন্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমাকে নইলে নয়, সেইজন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোটো হয়ে, সংসারী হয়ে, সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু, মানুষ আমির এই বড়ো দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, ভুলে থেকে বাঁচবে কী করে! তাই প্রতিদিনের মধ্যে-মধ্যে এক-একটি বড়োদিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে-মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়োদিনগুলি হচ্ছে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড়ো দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়োদিনগুলি সূর্যকান্ত-মণির মতো গাঁথা হয়ে যাচ্ছে; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়ো, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বলছিলুম, আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে; আজ নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে যোগ সেই যোগটি ঘোষণা করবার রোশনচৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজছে, কেবলই বাজছে, ভোর থেকে বাজছে। আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দক্ষেত্র। কেন? কেননা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চলছে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের সেই বড়ো কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে, আমাদের সমস্ত সংকল্পের মধ্যে, পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সংগীতটি আজ কে বাজাবেন? সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্ছে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুলছেন; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদমিলনের

ঝংকারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলই উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্ছে।

বীণার তারগুলো যখন বাজে না তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না; তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়, তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র, তবু এক—কেউ বা লোহার কেউ বা পিতলের, তবু এক—কেউ বা সরু সুরের কেউ বা মোটা সুরের, তবু এক—তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের, অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায়; দেখা যায়, আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হোক, গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বাণীতে, সংসারের বীণাতে, প্রতিদিন তার বাঁধা চলছে—সুর বাঁধা এগোচ্ছে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর। তখন চেষ্টার মূর্তি, কষ্টের মূর্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে, এক-এক সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে।

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয়, তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই—কেবলই বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি—দিনের পর দিন কেবলই খেটে মরা, কেবলই ওঠা পড়া, কেবলই অহংযন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া—কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই, কেবলই দিন-যাপন মাত্র।

কিন্তু, যিনি আমাদের বাজিয়ে তিনি কেবলই কি কঠিন হাতে নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই বাঁধছেন? তা তো নয়। সঙ্গে-সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে ঝংকারও দিচ্ছেন। কেবলই নিয়ম? তা তো নয়। তার সঙ্গে-সঙ্গেই আনন্দ। প্রতিদিন খেতে হচ্ছে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠছে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্তেই বিশ্ব-জগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মানতে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। দায়ও যেমন কঠোর খুশিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্ছে ওই। তিনি সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে-ক'টি তার বাঁধা হচ্ছে তাতে যে-ক'টি সুর বাজে কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুলতে পারেন। পাপী হোক, মূঢ় হোক, স্বার্থপর হোক, বিষয়ী হোক, যে হোক-না, বিশ্বের আনন্দের

একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়? তা হলেই হল; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝঞ্ঝনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা-কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চার দিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা-কোনো সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে, অহংকারের সঙ্গে যার মিল নেই—যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে—যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে—সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতিক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই সুরে সত্য আমাদের দুঃসাধ্যসাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকিয়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজে না তখন আমরা ধূলির ধূলি, তখন আমরা প্রকৃতির অতিভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট ক'রে, দুই হাত জোড় ক'রে, অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আলোকে সূর্যকে চন্দ্রকে পর্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড়ো ব'লে, দেবতা ব'লে, যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সংকল্প সংকীর্ণ, আমাদের আশা ছোটো, আকাঙ্ক্ষা ছোটো, বিশ্বাস ছোটো, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোটো। তখন কেবল খাও, পরো, সুখে থাকো, হেসে খেলে দিন কাটাও—এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু, সেই ভূমার সুর যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে তখনি কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়ো; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্যের দর্শক, জগৎ-ঐশ্বর্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দভাণ্ডারের অংশী—তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দরভীষণ সংগীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই। আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি, মর্তজীবনকে অনন্ত-জীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে। কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার

কত সুর, কত দেশে, কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবন-বীণা বাজে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখদুঃখের জন্ম-মৃত্যুর আলোক-অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত-অভিঘাতে, বাজে বাজে জীবন-বীণা বাজে। ধন্য আমার প্রাণ যে, সেই অনন্ত আনন্দসংগীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই আমিটুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মিড়ের পর মিড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠছে; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মতো এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে। কী সুন্দর আমি! কী মহৎ আমি! কী সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধ'রে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সংকোচ নেই, কোথাও সংকোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সংকোচ নেই— স্বার্থের সংকোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সংকোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সংকোচ— কিছুমাত্র না। সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্‌ করছে— তার উপর বিশ্বপতির আঙুল যখন যেম্‌নি এসে পড়ছে অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠছে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্ছে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্মরিত হয়ে উঠছে, পশু-পক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিলছে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্ছে না; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে, সকল ধর্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ সূর্যের সহস্র কিরণের মতো অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। সর্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, সে উন্মুক্ত; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কত কাল ধরে যে তা আমি নিজেও জানি নে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যতদিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জানছি, ছোটো চিন্তায় ছোটো বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারি দিকে শ্রী নেই; ততদিন তোমার জগদ্‌ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর

মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করছি ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই; ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ ব'লে গণ্য করি; ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারি নে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই; ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মতো আপনাকে কেবলই পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চাই— শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি— কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলি নে, ধর্ম বাঁচিয়ে চলি নে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলি নে! যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারি দিকের অনিয়ম অস্বাস্থ্য অজ্ঞান অপূর্ণতা অসৌন্দর্য অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না, চতুর্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না; নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি— কঠিন এবং প্রবল সংকল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারি নে, কি অব্যবস্থাকে কি অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত হই নে, পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারি নে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতার এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে-মনে গৃহে-গ্রামে সমাজে-স্বদেশে সর্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে— এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারি দিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হোক— আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্‌বোধনের বিপুল বাণী উদ্‌গীত হতে থাক্‌, আমরা অতিদীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ময় লোকে নিজেকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে অনুভব করি; আনন্দসংগীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল তোমার আশীর্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্যের আলোক, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আমাদের মন্ত্র; অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই— আমরা মানব না পরাভব, আমরা জানব না অবসাদ, আমরা করব না আত্মার অবমাননা, চলব দৃঢ়পদে, অসংকুচিত চিত্তে— চলব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ

এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে— তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তুরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে, চারি দিক থেকে আহ্বান আসতে থাকবে 'এসো এসো এসো'— আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরজীবনের সিংহদ্বার— কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ— অন্তরে বাহিরে কল্যাণ— আনন্দম্ আনন্দম্— পরিপূর্ণ-মানন্দম্।

৭ পৌষ ১৩১৭
প্রাতঃকাল

॥ ১৩ ॥

কর্মযোগ

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বলছে, ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে, দেখছি যা-কিছু সব নিয়মেই চলছে—এর মধ্যে আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাসছে।

সূর্য চন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠছে, অস্ত যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভয়ে চলছে পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয়, যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই—সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন-কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয় সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাই নে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে দেখে আমরা চমকে উঠি, তাকেও জোড়হাতে নিয়ম পালন করে চলতে হয়—একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন : ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে। তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে; বাতাসও মুক্ত নয়। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্র সূর্য চলছে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাটবার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে বলে মনেও হয় না, সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চলছে।

তবে তো দেখছি ভয়েই সমস্ত চলছে, কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানাঘরে আগাগোড়া কল চলছে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু তো আজ আনন্দের সুর উঠেছে, এ কথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে তো মানুষ এমন করে ডাকে—বলে, 'চল্ ভাই, আনন্দ করবি চল্!' এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন?

সে দেখতে পাচ্ছে, নিয়মের কঠিন দণ্ড একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে, তাকে আচ্ছন্ন করে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুটতে দেখি নি? দেখি নি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি,

সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য? দেখছি নে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরমরূপে প্রচার করছে না— একটি অনির্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারি দিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্ছে। সেইজন্যেই, যে উপনিষৎ একবার বলেছেন 'অমোঘ শাসনের ভয়ে যা-কিছু সমস্ত চলেছে', তিনিই আবার বলেছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্ছে। যিনি আনন্দস্বরূপ, মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাঁধন মানে। কিন্তু, যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্‌বোধন হয় নি সে বলে, 'এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখছি।' সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায়; কিন্তু, যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না— সে বলে, রস কিছুই নেই। সে মাথা নেড়ে বলছে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু, ওই-যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে : রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখতে পাচ্ছেন। জগতের নিয়ম তো তাঁর কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্ছে না। তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। জগতে তিনি ভয়কে দেখছেন না, আনন্দকেই দেখছেন। সেইজন্যেই বলছেন : আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্বত্র জানতে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি করে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন তিনিই বলেছেন : মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। এই মহৎভয়কে, এই উদ্যত বজ্রকে যাঁরা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন, তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয়, কিন্তু সে সে আনন্দেরই বন্ধন— সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজবন্ধনের মতো। তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুশি হয়ে গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না। কেননা, সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত, যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাঁধে, তাকে মারে, সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ— পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনই সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট শিশুর মতো কেঁদে উঠে বলে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আঘাত কোরো না। সে বলে, 'বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো; অন্তরে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো; আমাকে আচ্ছন্ন

ক'রে, আবৃত করে বেঁধে রাখো; কোথাও কিছু ফাঁক রেখো না, শক্ত ক'রে ধরো। তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি। আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা করো।'

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাতলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু, এই কথা মনে রাখতে হবে, নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে, তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে—মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ংকর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলই কর্ম সৃষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয়, তাকেও কেবলই সে তৈরি করে তুলছে। কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করে না। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে নানাবিধ কর্মের ভিতরে

কেবলই বন্ধনমুক্ত করে দিচ্ছে। যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে— ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উপনিষৎ বলেছেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, 'আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে।' তাঁরা সংসারের মধ্যে, কর্মের মধ্যে, আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখতাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখদুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখে এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করছে তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে; তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তর-বাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই-যে জীবনের আনন্দ, এই-যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না, এ আমাদের মোহ; এ কথা বলতে পারব না যে, একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্যদৃষ্টিতে দেখো। যদি তা দেখ তা হলে কর্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে? তা হলে আমরা দেখতে পাব, কর্মের দুঃখকে মানুষ বহন করছে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য— কর্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করছে, বহু ভার লাঘব করছে। কর্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম করছে— তার এক দিকে দায় আছে, আর-এক দিকে সুখও আছে। কর্ম এক দিকে অভাবের তাড়নায়, আর-এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এইজন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করছে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে— নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে

মারছে। কিন্তু, আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠল না। পশুপক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে তাতেই সে চুপ করে থাকতে পারলে না— কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। মানুষের মতো কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে। এখানে কত কাল থেকে সে কত ভাঙছে গড়ছে; কত নিয়ম বাঁধছে, কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্ছে; কত পাথর কাটছে, কত পাথর গাঁথছে; কত ভাবছে, কত খুঁজছে, কত কাঁদছে। এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড়ো বড়ো লড়াই লড়া হয়ে গেছে। এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে। এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়। এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায় নি, নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে। এইখানেই মানুষ সেই মহৎ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারি দিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্তমানের চেয়ে অনেক বড়ো— এইজন্যে কোনো-একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না। এইজন্যই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড়ো হবার জন্যই, এখনও সে যা হয়ে ওঠে নি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলই বারবার দুঃখ পেতে হচ্ছে। সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব। এই কথা মনে রেখে মানুষ আপনার কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে নি, কেবলই তাকে প্রসারিত করেই চলেছে। অনেক সময় এত দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে যে, কর্মের সার্থকতা বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, কর্মের স্রোতে বাহিত আবর্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক-একটা কেন্দ্রের চার দিকে ভয়ংকর আবর্ত করছে— স্বার্থের আবর্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত। কিন্তু, তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই; সংকীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে: কারণ, চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠতে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম করতে হবে, কর্ম করে বেঁচে থাকতে হবে, এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম করা এবং বাঁচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্ছে এই যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই; তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য অন্তর এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকতে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্ন-জলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয়, তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখো-না কেন, শরীরকে তো নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয়, এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই— তবু দেহটা নিজের

ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের কাজ করেও স্থির থাকতে পারে না। তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্তচলাচলেই তার তুষ্টি নেই, নানা প্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্বদাই তার চাই—কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে—দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে ভাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচি নে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যে দিকে ত্যাগ করব সেই দিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেন নি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন। তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব, বাইরের কর্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব—কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব, বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না—কিম্বা একেবারে এর উল্টো কথাটাই বলি, এবং এই বলে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল এক দিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি, তা হলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখছি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে—তাকে সে ভালো করে বিশ্বাসই করে না। এত দূর পর্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলছে 'বিশ্বজগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে', তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে—জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি, আর-এক দিকে সমাপ্তি; এক দিকে পরিণতি, আর-এক দিকে পরিপূর্ণতা; এক দিকে ভাব, আর-এক দিকে প্রকাশ—দুই একসঙ্গে গান এবং গান-গাওয়ার মতো অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্ছে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা যে, গান কোনো জায়গাতেই নেই, কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে। কেননা, আমরা যে গেয়ে-যাওয়াটাকেই দেখছি, কোনো সময়েই তো সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখছি নে—কিন্তু, তাই বলে কি এটা জানি নে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র ক'রে-যাওয়া চ'লে-যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্য জগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে, এই পণ করে বসে আছে। তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ। জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না। সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানে না।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যাপ্তির দিককে আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব, তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্যপরিণতির দিক দিয়ে দেখব না, এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়; আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থাণু হয়ে বসে আপনাকে আপনিই নিরীক্ষণ করতে চায়; আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্ব-সেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কত দূর বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি নি। আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর-বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্মকর্ম ইতিহাস-পুরাণ সমাজ-সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, আর-কোনো-প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁতভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখি নে। কিন্তু, আধ্যাত্মিকতা অন্তর-বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের এক দিকে নিয়ম, এক দিকে আনন্দ। তার এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে : ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি। আর-এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। এক দিকে বন্ধনকে না মানলে অন্য দিকে মুক্তিকে পাবার জো নেই। ব্রহ্ম এক দিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর-এক দিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনই মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতরো? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একে-বারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে তত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয়, তখন সেই তারে গান বাজে এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই

সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। এক দিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্য দিকে সে সংগীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয় নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু, তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না। সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে পারলেই সে বদ্ধ থেকেও এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তি লাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবল-মাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু, তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে, ব্যর্থতার মধ্যে, নিষ্ক্রিয়তালাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বলছিলুম, কর্মকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্ছে : যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ! যে যে কর্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে। অর্থাৎ, সমস্ত কর্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে। অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্ছে আত্মার মুক্তি। তখন কী আনন্দ যখন সকল কর্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে, কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতি-দিন একান্ত হয়ে ওঠে— সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ— তখন সংসারই তো আনন্দনিকেতন।

কর্মের মধ্যে মানুষের এই-যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই-যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে একে কে অবজ্ঞা করতে চায়! সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানবমাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টির ব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো-একটা ভাবরস-সম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনই শুনতে কি পাচ্ছ না— ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয়রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে! তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে; বনজঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মতো তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করছে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে ; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করছে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ

করে ফেলছে। তার চারি দিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্মের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই-যে বিজয়রথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে, তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও তার কেউ সারথি নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে না? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথির যথার্থ মিলন ঘটছে না? রথ চলেছে— শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্যোগও সেই সারথির অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারছে না; মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুব-দৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে না; আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ; আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথির— চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নাববার সময় মিলন রথীর সঙ্গে সারথির। ওরে, কে সেই নিত্যমিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়! তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চলতে চায় না! কে বলতে চায় 'আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে, নিশ্চেষ্টতার মধ্যে, একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিলব'! কে বলতে চায় এই সমস্তই মিথ্যা— এই বৃহৎ সংসার এই নিত্যবিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তর-বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকলপ্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চির-দিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা! যে লোক এ-সমস্তকেই মিথ্যা বলে কত বড়ো মিথ্যা তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড়ো বৃহৎ সংসারকে এত বড়ো ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়— ভীরু যে, পালাতে যে চায়, সে কোথাও তাঁকে পায় না। সাহস করে বলতে হবে, এই-যে তাঁকে পাচ্ছি, এই-যে এখনই, এই-যে এখানেই। বারবার বলতে হবে, আমার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্ছি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্ছি। কর্মের মধ্যে আমার যা-কিছু বাধা, যা-কিছু বেসুর, যা-কিছু জড়তা, যা-কিছু অব্যবস্থা, সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা, সাধনার দ্বারা, দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসংকোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করছেন।

উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ', ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কাকে বলেছেন? আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্‌ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ, পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া, এবং যিনি ক্রিয়াবান্‌, তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে, অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না। সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়— সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ তিনি

কর্ম না হলে বাঁচবেন কী করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এইজন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি 'আত্মরতিঃ', পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ; এবং তিনি 'আত্মক্রীড়ঃ', তাঁর সকল কাজই হচ্ছে পরামাত্মার মধ্যে—তাঁর খেলা, তাঁর স্নান-আহার, তাঁর জীবিকা-অর্জন, তাঁর পরহিতসাধন, সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে, ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটো বড়ো সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন— তিনি 'বহুধা-শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি'। তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন তো তিনি নিজেই; তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান করছেন। কাজ করছেন, তিনি কাজ করছেন —নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কী করে? তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলই উৎসর্গ করছে, সেই তো তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ওইখানে— ওইখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধা-শক্তিযোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলই দান করতে হবে। বেদে তাঁকে 'আত্মদা বলদা' বলেছে— তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্ছেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্ছেন যাতে করে আমরাও তাঁর মতো আপনাকে দিতে পারি। সেইজন্যে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন ঋষি তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছেন: স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজনটা মেটান— আমাদের সঙ্গে শুভ-বুদ্ধির যোগসাধন করেন। অর্থাৎ, শুধু এ হলে চলবে না যে, তাঁর শক্তি-যোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন; আমাদের শুভবুদ্ধি দিন, তা হলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব, তা হলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভবুদ্ধি হচ্ছে সেই বুদ্ধি যাতে সকলের স্বার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভ-বুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম, কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম নয়; আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম, কিন্তু অভাব-তাড়িতের কর্ম নয়; তখন আমাদের কর্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্তন নয়; তখন, যেমন আমরা দেখছি 'বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ', বিশ্বের সমস্ত

কর্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্ছে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্ছে, তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি—তাই আমার সকল কর্মই শান্তিময়, কল্যাণময়, আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন, তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তাঁর জ্ঞান শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমা শক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করছে। আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু, সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়; আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেননা, হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাই নে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়—আপনার সমস্ত কর্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাই নে। কর্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিই নে ব'লে, দান করি নে ব'লে, কর্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্মে তোমার আনন্দমূর্তি প্রত্যক্ষ করে কর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মতো তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মতো তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক, ফুলের গন্ধের মতো তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্। জীবনকে তার সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত ক্ষয়পূরণ, সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালোবাসতে পারি এমন বীর্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিতে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই ব'লে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মতো একে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব, এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধার-হীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্নসূর্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরি-শ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করছে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে; সেখানেই জলাজঙ্গল গর্তগাড়িকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করছে সেই-খানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ, চিত্তের আনন্দ, কেবলই কর্মের রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করছে

সেখানে সে মহৎ; সেখানে সে প্রভু; সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলই অভিশাপ দিচ্ছে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্মে মানুষের অনাস্থা, সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে; সেইখানেই নিখিলের প্রবেশ-দ্বার সংকীর্ণ। সেইখানেই যত সংকোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্মন্, আজ আমরা তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ— বিশ্বসংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখ-তাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমা সৃষ্টি চলছে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ। সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবল বেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মতো ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক, নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্মরধ্বনিকে বহন করে; আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখা-পল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক; আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক। দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহু তুলে আপনাকে একবার দিগ্‌-বিদিকে ঘোষণা করুক। মোহের আবরণকে উদ্‌ঘাটন করো, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও; এখনই এই মুহূর্তে অনন্ত দেশে কালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্যবিলসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই; তার পরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টি-ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি যেখানে নানা দিক থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করছে; যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোম-হুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মতো সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহা-নিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আত্মবোধ

কয়েক দিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে

আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কী আমাকে বলতে পার?' একজন বললে, 'বলা বড়ো কঠিন, ঠিক বলা যায় না।' আর-একজন বললে, 'বলা যায় বইকি— কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে, সবাইকে, শোনাও না কেন?' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ? কেউ কি আসছে?' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।'

আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ তো মিথ্যা বলে নি। আসছে, সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে চলতে হচ্ছে —আর যাবে কোথায়? আমরা প্রসন্নমনে হাসতে পারি— পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে করছি সবাই কেবল নিজের উদরপূরণের অন্ন খুঁজছে? নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চার দিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে? না, তা নয়। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অন্নের জন্যে, বস্ত্রের জন্যে, নিজের ছোটো-বড়ো কত শত দৈনিক আবশ্যকের জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে— কিন্তু কেবল তার সেই আহ্নিক গতিতে নিজেকে প্রদক্ষিণ করা নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে জেনে এবং না জেনে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে মহাকাশে আর-একটি কেন্দ্রের চার দিকে যাত্রা ক'রে চলেছে— যে কেন্দ্রের সঙ্গে সে জ্যোতির্ময় নাড়ির আকর্ষণে বিধৃত হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে সে আলোক পাচ্ছে, প্রাণ পাচ্ছে, যার সঙ্গে একটি অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে তার চিরদিনের মহাযোগ রয়েছে।

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন, এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে— আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকে বিশুদ্ধ ক'রে, প্রবল ক'রে, পরিপূর্ণ ক'রে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করছে। শিশুকাল থেকেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে শিক্ষিত ও সংযত করছে; এক-একটি বড়ো বড়ো লক্ষ্যের চার দিকে সে আপনার ছোটো ছোটো সমস্ত বাসনাকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করছে; এমন-সকল আচার-অনুষ্ঠানের সে সৃষ্টি করছে যাতে তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে তার সমাপ্তি নেই, সমাজ-ব্যবহারের মধ্যেও তার অবসান নেই। সে এমন একটি বৃহৎ আপনাকে চাচ্ছে যে আপনি তার বর্তমানকে, তার চার দিককে, তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটো নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে এই আপনির খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্তহাস্যে বলছে সবাইকেই আসতে হবে এই আপনির খোঁজ করতে। কেননা, এ তো কোনো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক। কলরবের তো অন্ত নেই— কত কলকারখানা, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত বাণিজ্যব্যবসায়ের কোলাহল আকাশকে মথিত করছে, কিন্তু মানুষের ভিতর থেকে সেই সত্যের ডাককে কিছুতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। মানুষের সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত অর্জন-বর্জনের মাঝখানে সে রয়েছে। কত ভাষায় সে কথা কইছে, কত কালে, কত দেশে, কত রূপে, কত ভাবে সমস্ত আশু প্রয়োজনের উপর সে জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করছে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করছে, কত বিকৃতি তাকে আক্রমণ করছে, কিন্তু সে বেঁচেই আছে। সে কেবলই বলছে, তোমার আপনিকেও পাও : আত্মানং বিদ্ধি।

এই আপনিকে মানুষ সহজে আপন করে তুলতে পারছে না, সেইজন্যে মানুষ সূত্রচ্ছিন্ন মালার মতো কেবলই খসে যাচ্ছে, ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু, যে বিশ্বজগতে সে নিশ্চিত হয়ে বাস করছে সেই জগৎ তো মুহুর্মুহু এমন করে খসে পড়ছে না, ছড়িয়ে পড়ছে না।

অথচ, এই জগৎটি তো সহজ জিনিস নয়। এর মধ্যে যে-সকল বিরাট শক্তি কাজ করছে তাদের নিতান্ত নিরীহ বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় যখন সামান্য একটা টেবিলের উপর দু-চার কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের লীলা দেখতে যাই তখন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়, তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি যে কী অদ্ভুত এবং কী প্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত এমন কত শত বাষ্পপদার্থ তাদের কত বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে কী কাণ্ড বাধিয়ে বেড়াচ্ছে তা আমরা কল্পনা করতেও পারি নে। তার উপরে জগতের মূল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ। আকর্ষণের উল্টো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগের উল্টো শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই-যে জগৎ, এখানকার আলোতে আমরা অনায়াসে চোখ মেলছি, এখানকার বাতাসে অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্ছি, এর জলে স্থলে অনায়াসে সঞ্চরণ করছি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতরটাতে কত রকমের কত কী কাজ চলছে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড স্বাস্থ্যের মধ্যে এক করে জানছি— দেহটাকে হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক পাকযন্ত্র প্রভৃতির জোড়াতাড়া ব্যাপার বলে জানছি নে।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ংকর হোক-না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ, জগৎটা আসলে যে কী তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন

কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে একসময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই— সেই-সকল সূক্ষ্মতম মূল বস্তুর যোগ-বিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু, বিজ্ঞানের সেই মূল বস্তুর দুর্গও আজ আর টেঁকে না। আদিকারণের মহা-সমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক-এক পা এগোচ্ছে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্‌ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে— সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠছে।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যা এক দিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর-এক দিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই হচ্ছে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জানতে হচ্ছে না; আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জলস্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের যোগবিয়োগ বা শক্তিবিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়— জল মানে আমারই একটি আপন সামগ্রী, সে আমার চোখের জিনিস, স্পর্শের জিনিস; সে আমার স্নানের জিনিস, পানের জিনিস; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্ব-জগৎ বলতেও তাই। স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কী তা আমরা ধারণা করতে পারি নে, কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে যে, দুর্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্ত-মনে আপনার ধুলোখেলার ঘরের মতো ব্যবহার করছে, কোথাও কিছু বাধছে না।

জড়জগতে যেমন মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কী তা কেমন করে বলব! পর্দার উপর পর্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব। সেই প্রাণ এক দিকে যত বড়ো প্রকাণ্ড রহস্যই হোক-না কেন, আর-এক দিকে তাকে আমরা কী সহজেই বহন করছি— সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্তে অগণ্য জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন শাখাপ্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জনতাকে সজন করে তুলছে— এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কত কাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্যালোকে উঠছে এবং সূর্যালোক থেকে অন্ধকারে নেবে পড়ছে। এ কী তেজ— কী বেগ— কী নিশ্বাস মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে! যেখানে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই— আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জিত উন্মথিত হয়ে উঠছে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র

আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে এক সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু, এখানেই সে আছে, এখনই সে আছে, আমার হয়ে আছে। তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ ক'রে, তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে সে আছে। সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বদ্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট মানবপ্রাণ তার পৃথিবীজোড়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, শীতগ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন, শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে দেশে দেশান্তরে, বংশে বংশান্তরে, বিরাজ করছে। এই অনির্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যেও আপন হয়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

তাই বলছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্বচনীয় ক্রিয়া চলছে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে, আপন হয়ে, ধরা দিয়েছে; তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করছি তা নয়, তাদের ভালোবাসছি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাই নে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে তো এইরকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনি সেখানে সে এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলতে পারছে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ডভাবে সমগ্র ক'রে, আপন ক'রে, লাভ করছে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কী কঠিন হয়েছে!

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারই মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারছে না, চারি দিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু, আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার— তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই মনে হয় এটা পাই নি, ওটা পাই নি; ততক্ষণ যা কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেননা, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিসকেই পাই নে; এমন কোনো আধার থাকে না যার মধ্যে কোনো-কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারি। ততক্ষণ আমরা বলি— সবই মায়া; সবই ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, আত্মাকে যখনই পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনই নিশ্চিত করে ধরতে পারি, তখনই সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারি দিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাই নি তখন যা কিছু অসত্য ছিল, আপনাকে পাবামাত্রই সেই সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে, প্রবৃত্তির কাছে, যারা মরীচিকার মতো ধরা দিচ্ছে অথচ দিচ্ছে না, কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে। এইজন্যে যে লোক

আত্মাকে পেয়েছে জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্য-রূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না; কারণ, তার কাছে জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্য ধরা দিয়েছে। সে নিজে সত্য হয়েছে, এইজন্য তার কাছে কোনো সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো—এই হচ্ছে আত্মবোধের, আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায় নি, প্রাণ পায় নি; তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখতে পারত না—তখন তার সৌন্দর্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনই জগতের গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মানিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারি দিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাই নে, কিছুই দিই নে; যখনই সমস্তকে সংহত সংযত ক'রে, এক ক'রে আত্মাকে পাই—যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি—তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়; সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। তখনই আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে, আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান। তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে, সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনাটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে—অসংখ্যের ভিড় ঠেলে, টানাটানি কাটিয়ে, এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটবে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠবে।

এইজন্যে মানুষের সামঞ্জস্য বিশ্বজগতের সামঞ্জস্যের মতো সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে ব'লেই নিজের ভিতরকার সমস্ত বিরুদ্ধ-তাকে সে একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করে—বেদনার পীড়ায় সেইগুলোই তার কাছে অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে—নিজের ভিতরকার এই সমস্ত বিরুদ্ধতার

দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে এতেই তার চিত্ত প্রতিহত হয়— কোনো-একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে তার এই সকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখবেদনার একটি আনন্দ-পরিণাম আছে, এটা সে সহজে দেখতে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি— যাতে আমার সুখ তাতেই আমার মঙ্গল নয়; যাকে আমি মঙ্গল বলে জানছি চার দিক থেকে তার বাধা পাচ্ছি। আমার শরীর যা দাবি করে আমার মনের দাবি সকল-সময় তার সঙ্গে মেলে না; আমি একলা যা দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে; আমার বর্তমানের দাবি আমার ভবিষ্যতের দাবিকে অস্বীকার করতে চায়। অন্তরে বাহিরে এই সমস্ত দুঃসহ বাধা-বিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে। অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্যশক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করছে। যাতে তার এই সমস্ত বিক্ষিপ্ততাকে মিলিয়ে এক করে দেবে, সহজ করে দেবে, তার প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষ্যকে কেবলই স্থির রাখবার চেষ্টা করছে। মানুষ আপনার অন্তর-বাহিরের এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ ঐক্যসাধনের চেষ্টা প্রতিদিনই করছে। সেই চেষ্টাই তার জ্ঞানবিজ্ঞান সমাজসাহিত্য রাষ্ট্রনীতি। সেই চেষ্টাই তার ধর্মকর্ম পূজা-অর্চনা। সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব, নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্ছে। সেই চেষ্টা খানিকটা সফল হচ্ছে, খানিকটা নিষ্ফল হচ্ছে; বারবার ভাঙছে, বারবার গড়ছে। কিন্তু, বারম্বার এই সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ আপনার এই স্বাভাবিক ঐক্যচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার ভিতরকার সেই এককে ক্রমশ সুস্পষ্ট করে দেখছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ এক তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ভূমাকে আশ্রয় করছে।

তাই বলছিলুম ঘুরে ফিরে মানুষ যা কিছু করছে— কখনো বা ভুল ক'রে, কখনো বা ভুল ভেঙে— সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চা'ক-না, সত্য করে চাচ্ছে এই আপনাকে; জেনে চাচ্ছে, না জেনে চাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাটভাবে একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মানুষ আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে পেতে চাচ্ছে। সে এক রকম করে বুঝতে পারছে— কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়; নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসংগীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা, সেই সংগীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধছে, সুরের যতই স্খলন হোক তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলই বলছে : তমেবৈকং জানথ আত্মানম্। সেই এককে জানো, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। ইহাই অমৃতের সেতু।

আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয় তখন তার প্রবৃত্তি

শান্ত হয়, সংযত হয়; তখন তার বুঝতে বাকি থাকে না এই তার এক কাকে খুঁজছে। তার প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে—কেননা, নানা বিষয়কে নিয়েই সে বাঁচে; নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার সার্থকতা। কিন্তু, যেটি হচ্ছে মানুষের এক, মানুষের আপনি, সে স্বভাবতই একটি অসীম এককে, একটি অসীম আপনিকে খুঁজছে—আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষৎ বলেন—'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি', যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা ক'রে প্রকাশ করছেন, 'তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ', তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন, 'তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্', তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর-কারও না।

আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তিতর্কের দৃষ্টি নয়। এ হচ্ছে 'দিবীব চক্ষুরাততং'। চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখতে পায় এ সেই-রকম দেখা। আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্ছে সে কোনো জিনিসকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্‌ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো করে দেখে না—সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখতে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক করে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখতে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম-আপনি। সেই পরম-আপনিকে যদি আপন করেই না জানা যায় তা হলে আর যেমন করেই জানা যাক্ তাঁকে জানাই হল না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না; ঠিক উল্টো। জ্ঞান সহজেই তফাত করে জানে; আপন করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই।

উপনিষৎ বলছেন—'এষ দেবো বিশ্বকর্মা', এই দেবতা বিশ্বকর্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করছেন; কিন্তু তিনিই 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', মহান-আপন-রূপে, পরম-এক-রূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌ৢপ্তো য এতৎ'—সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান, যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন, 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তাঁরাই অমৃত হন।

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে—মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের

মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে দিয়ে অনন্ত কালেও আমরা এককে পেতে পারি নে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট; তাই একেবারেই রস-রূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর-কিছুতে পাবার জো নেই।—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্ছে প্রকাশ— এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়; আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুটতে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারা ঘা মারতে হবে না— যা-কিছু বাধা আছে সেগুলো কেবল মোচন করতে হবে— দরজা খুলে দিতে হবে, তা হলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

সেইজন্যেই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা : আবিরাবীর্ম এধি। হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। মানুষের যা দুঃখ সে অপ্রকাশের দুঃখ— যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনও তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছেন না, তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে। এখনও তার মধ্যে বাধা-বিরোধের সীমা নেই; এখনও সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারছে না; এখনও তার এক ভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্ছে না; এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না। ভয় দুঃখ শোক অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়ছে; যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা, যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করছে; আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠছে না। এইজন্যেই মানুষের প্রার্থনা : রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা করো। যেখানে সেই আবিঃ'র আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে প্রসন্নতা নেই; যে দেশে সেই আবিঃ'র আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রসন্নতা চলে গেছে; যে গৃহে তাঁর আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধনধান্য থাকলেও শ্রী নেই; যে চিত্তে তাঁর প্রকাশ সমাচ্ছন্ন সে চিত্ত দীপ্তিহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল স্রোতের শৈবালের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এইজন্যে যে কোনো প্রার্থনা নিয়েই মানুষ ঘুরে বেড়াক-না কেন, তার আসল প্রার্থনাটি হচ্ছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক। এইজন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো

কান্না, পাপের কান্না। সে যে আপনার সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম একের সুরে মেলাতে পারছে না; সেই অমিলের বেসুর, সেই পাপ তাকে আঘাত করছে। মানুষের নানা ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করছে, তখন সে নিজেকে সেই পরম একের শাসনে বিধৃত দেখতে পাচ্ছে না— তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলছে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও; তা হলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়। তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের। কিন্তু, যে জাতি যে রকম পরিণতিই পা'ক-না কেন, সকলেই কোনো-না-কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড়ো আপনাকে চাচ্ছে। এমন একটি বড়ো যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্ছে, যা তার কেনাবেচার সামগ্রী, তা নিয়ে তো তাকে থাকতেই হয়; সেই সঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখাশোনা-খাওয়াপরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে। তাকেই আপনার সমস্ত সুখদুঃখের চেয়ে বড়ো বলে স্বীকার করছে। কেননা, মানুষ জানছে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই, তার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা আরাম-বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বলছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারছে যে, তার মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে; তাকে মুক্ত করতে হবে, তাকে যুক্ত করতে হবে। সেই দিকে চেয়েই মানুষ এক দিকে আপনার দীনতা আর-এক দিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে এবং সেই দিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায়— ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখতে চায়; তার পরম আপনকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার-বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি। এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণ, তার মনের মন। এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কী সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্বাঙ্গীণ রূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলই সুগম করে দিচ্ছেন—সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পারলেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলই বিশুদ্ধ করে তুলছেন—সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্ছেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্বতে জ্যোতিষ্কলোকে বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মতন্ত্রের মধ্যে অসীমকে দেখি, কিন্তু সেখানে আমরা অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখতে পাই নে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্ছে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখতে পাই—কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখতে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখব? ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি জগতে সে আর কোথায় দেখতে পাব? অগ্নি জল বায়ু সূর্য তারা যত উজ্জ্বল, যত প্রবল, যত বৃহৎ হোক, এই প্রকাশকে সে তো দেখাতে পারে না। তারা শক্তিকে দেখায়, কিন্তু শক্তিকে দেখানোর মধ্যে একটা বন্ধন, একটা পরাভব আছে। তারা নিয়মকে রেখামাত্র লঙ্ঘন করতে পারে না। তারা যা তাদের তাই হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, কেননা তাদের লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। এমনতরো জড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার আনন্দ পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার সর্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন—এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন, সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেননা, সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন। সেইখানেই সকলের চেয়ে বড়ো প্রকাশ—ইচ্ছার প্রকাশ, প্রেমের প্রকাশ। সেখানে আমরা তাঁকে মানতেও পারি, না মানতেও পারি; সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্বক তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব—প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব—সেই একটি মস্ত অপেক্ষা, একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেননা, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপ মলিনতার অবকাশ ঘটেছে—কেননা, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এত দূর পর্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি, জগদীশ্বর যদি থাকতেন তবে এমনটি ঘটতে পারত না—বস্তুত, সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন; সে জায়গা তিনি মানুষকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয়, কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চলতে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন, এও সেইরকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন, অথচ নেই। এইজন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করছি, আঘাত পাচ্ছি; ধুলায় আমাদের সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠছে; সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই; সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায়—এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয় নি। সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারিগান—

মাঝি, তোর বইঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না!

তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

এত বাধা বিরোধ, এত অসত্য, এত জড়তা, এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়—কারণ, বাধা না হলে প্রকাশ হতেই পারে না। জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুলছে, এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে যেখানে তাঁর প্রেমের মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি স্বীকার করেছেন, সে হচ্ছে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়—যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায়—তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।

এইজন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে সংকোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়,

আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ, তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে। এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়; এখানে জোর খাটে না। রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এইজন্যে ভক্ত যেদিন আপনার অহংকারকে বিসর্জন দেয়, ইচ্ছা করে আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, সেইদিন মানুষের মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন। সেইজন্যেই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়ছে, এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন; সেইজন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্ছে, বলছে : আবিরাবীর্ম এধি।

আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রের এই স্পর্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজকাল অন্য দেশের অন্য ভাষাতেও আভাস দিচ্ছে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখলুম। তিনি ভগবানকে ডেকে বলছেন—

> Thou hast need of thy meanest creature ;
> Thou hast need of what once was thine :
> The thirst that consumes my spirit
> is the thirst of thy heart for mine.

তিনি বলছেন : তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার প্রয়োজন আছে; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও; আমার চিত্তকে যে তৃষায় দগ্ধ করছে সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্যে তোমার হৃদয়ের তৃষা।

পশ্চিম-হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি, তাঁর নাম জ্ঞানদাস বঘেলি, তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন—

> অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
> বহ প্রভু অসীম ভাষায়—
> (তাই দীননাথ) আমি ক্ষুধিত, আমি তৃষিত,
> তাই তো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা তাই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই ভাষাই তো উষার আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের

স্বর্ণীকরণে। জগতে এই ভাষার তো আর কোনোই কাজ নেই। সে তো কেবলই হৃদয়ের প্রতি হৃদয়-মহাসমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরাম দাসের ভাষায় বলছে—

তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে
কে কৈল বাহির!

তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে; কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে। সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এসো, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এসো—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক। এই একটি বিরহ-বেদনা অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেইজন্যেই আমার মধ্যেও আছে।—

I have come from thee—why I know not;
but thou art, O God! what thou art
And the round of eternal being is the pulse
of thy beating heart.

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি কেন যে তা জানি নে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ; এই-যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা, এই হচ্ছে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।

অনন্তের মধ্যে এই-যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে রচনা করে তুলছে, কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বলছেন, এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ করব—এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার। তাই কবি বলছেন : আমি যে দুঃখ পাচ্ছি তাতে তুমি লজ্জা কোরো না প্রভু!—

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কী স্বামী!
তোমার সকল ব্যথার ব্যথী আমায়
কোরো নিশিদিন।
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব!
বিশ্ব তোমার বিরাট গেহ,
আমিও বিশ্বে লীন।

ভোগের সুখ তো আমি চাই নে—যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো; আমি যে তোমার পত্নী—আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব। সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেইজন্যেই, আমি বলছি নে 'আমাকে সুখ দাও'; আমি বলছি : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও।—

আমি তোমার ধর্মপত্নী, ভোগের দাসী নহি।
আমার কাছে লাজ কী স্বামী, নিষ্কপটে কহি।

আমায় প্রভু, দেখাইয়ো না সুখের প্রলোভন—
তোমার সাথে দুঃখ বহি সেই তো পরম ধন।
ভোগের দাসী তোমার নহি—তাই তো ভুলাও নাকো,
মিথ্যা সুখে মিথ্যা মানে দূরে ফেলাও নাকো।
পতিব্রতা সতী আমি—তাই তো তোমার ঘরে
হে ভিখারি, সব দারিদ্র্য আমার সেবা করে।
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই পাই না সুখের দান—
আমি তোমার প্রেমের পত্নী এই তো আমার মান।

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না। তখন সে বলে : যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। যা ভূমা তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায় তখন আর আরামকে চাইলে চলবে না, স্বার্থকে চাইলে চলবে না; তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই; তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না। তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তখন কর্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই। তখন ভক্ত বিশ্ব-বোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

ভক্তের জীবনের মধ্যে যখন সেই প্রকাশকে আমরা দেখি তখন কী দেখি? দেখি সে তর্কবিতর্ক নয়, সে তত্ত্বজ্ঞানের টীকাভাষ্য বাদপ্রতিবাদ নয়, সে বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়—সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না, সেও তেমনি। ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখতে পাই নে। তার আগাগোড়াই সেই একের মধ্যে সুন্দর হয়ে, মহৎ হয়ে, শক্তিশালী হয়ে মেলে। জ্ঞান মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম মেলে। বাহির মেলে, অন্তর মেলে। কেবল যে সুখ মেলে তা নয়, দুঃখও মেলে। কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে। কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে। সমস্তই আনন্দে মিলে যায়, রাগিণীতে মিলে ওঠে। তখন জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ বিপদ-সম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে, নিটোল অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্বচনীয় রূপ হচ্ছে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে সুখ এবং দুঃখ দুই'ই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুই'ই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুই'ই সার্থক; এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মতো মধুর সুরে বাজতে থাকে। এই প্রেমের মৃদুতাও যেমন সুকুমার, বীরত্ব তেমনি সুকঠিন। এই প্রেম দূরকে এবং নিকটকে, আত্মীয়কে

এবং পরকে, জীবনসমুদ্রের এ পারকে এবং ও পারকে প্রবল মাধুর্যে এক করে দিয়ে, দিগ্‌দিগন্তরের ব্যবধানকে আপন বিপুল সুন্দর হাস্যের ছটায় পরাহত করে দিয়ে উষার মতো উদিত হয়। অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন—পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তার সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে। তখন অসীমে সসীমে যে প্রভেদ সেই প্রভেদ কেবলই অমৃতে ভরে ভরে উঠতে থাকে, সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত আপনার পাপড়ি একটির পর একটি করে বিকশিত করতে থাকে। তখন জগতের সকল প্রকার—সকল আকাশের সকল তারা, সকল ঋতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে বাঁশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে। তখন, হে রুদ্র, হে চিরদিনের পরম দুঃখ, হে চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা, তোমার এ কী মূর্তি! এ কী 'দক্ষিণং মুখম্'। তখন তুমি নিত্য পরিত্রাণ করছ—সসীমতার নিত্যদুঃখ হতে, নিত্য বিচ্ছেদ হতে তুমি নিত্যই পরিত্রাণ করে চলেছ—এই গূঢ় কথা আর গোপন থাকে না। তখন ভক্তের উদ্‌ঘাটিত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মানবলোকে তোমার সিংহদ্বার খুলে যায়। ছুটে আসে সমস্ত বালক বৃদ্ধ—যারা মূঢ় তারাও বাধা পায় না, যারা পতিত তারাও নিমন্ত্রণ পায়। লোকাচারের কৃত্রিম শাস্ত্রবিধি টল্‌মল্ করতে থাকে এবং শ্রেণীভেদের নিষ্ঠুর পাষাণপ্রাচীর করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে। তোমার বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্ছে যে 'আমি তোমার'। এই কথা বলে সে নতশিরে তোমার নিয়ম পালন করে চলছে। মানুষ তার চেয়ে ঢের বড়ো কথা বলবার জন্য অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সে বলতে চায় 'তুমি আমার'। কেবল তোমার মধ্যে আমার স্থান তা নয়, আমার মধ্যেও তোমার স্থান। তুমি আমার প্রেমিক, আমি তোমার প্রেমিক। আমার ইচ্ছায় আমি তোমার ইচ্ছাকে স্থান দেব, আমার আনন্দে আমি তোমার আনন্দকে গ্রহণ করব, এইজন্যেই আমার এত দুঃখ, এত বেদনা, এত আয়োজন। এ দুঃখ তোমার জগতে আর-কারও নেই। নিজের অন্তর বাহিরের সঙ্গে দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর কেউ বলছে না 'আবিরাবীর্ম এধি'। তোমার বিচ্ছেদবেদনা বহন করে জগতে আর-কেউ এমন করে কাঁদছে না যে 'মা মা হিংসীঃ'। তোমার পশুপক্ষীরা বলছে, 'আমার ক্ষুধা দূর করো, আমার শীত দূর করো, আমার তাপ দূর করো।' আমরাই বলছি : বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো। কেন বলছি? নইলে, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন না হওয়ার যে দুঃখ সে দুঃখ কেবল আমার নয়; সে দুঃখ অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এইজন্যে, মানুষ যে দিকেই ঘুরুক, যাই করুক, তার সকল চেষ্টার মধ্যেই সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে : আবিরাবীর্ম এধি। এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়। আরাম-ঐশ্বর্যের পুষ্পশয্যার মধ্যে শুয়েও সে ভুলতে পারে না। দুঃখ-যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভুলতে পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার

মধ্যে প্রকাশিত হও; তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত সুখদুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও। সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগযুগান্তরের উপরে নিস্তব্ধবিরাজমান যে পরম-এক তুমি সেই মহা-এক তুমি আমার মধ্যে আমার হও। সেই এক তুমি 'পিতা নোঽসি'— আমার পিতা। সেই এক তুমি 'পিতা নো বোধি'— আমার বোধের মধ্যে আমার পিতা হও, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে প্রভু হও, আমার প্রেমের মধ্যে প্রিয়তম হও।— এই প্রার্থনা জানাবার যে গৌরব মানুষ আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে বহন করেছে— এই প্রার্থনা সফল করবার যে গৌরব আপন ভক্তপরম্পরার মধ্য দিয়ে কত কাল হতে লাভ করে এসেছে— মানুষের সেই শ্রেষ্ঠতম গভীরতম চিরন্তন গৌরবের উৎসব আজ এই সন্ধ্যাবেলায়, এই লোকালয়ের প্রান্তে, অদ্যকার পৃথিবীর নানা জন্মমৃত্যু হাসিকান্না কাজকর্ম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটিতে। মানুষের সেই গৌরবের আনন্দধ্বনিকে আলোকে সংগীতে পুষ্পমালায় স্তবগানে উদ্‌ঘোষিত করবার এই উৎসব। বিশ্বের মধ্যে তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌', মানুষের ইতিহাসে তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌', আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌'— এই কথা জানতে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি— তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়— আনন্দের দ্বারা —শিশু যেমন সহজ বোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেইরকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বারা। হে উৎসবের অধিদেবতা, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই উৎসবকে সফল করো; এই উৎসবের মধ্যে, হে আবিঃ, তুমি আবির্ভূত হও। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্তাকাশে তোমার দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হোক। প্রতিদিন আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জেনে যে দুঃখ পেয়েছি, সেই বোধ হতে, সেই দুঃখ হতে এখনই আমাদের পরিত্রাণ করো। সমস্ত লোভ-ক্ষোভের ঊর্ধ্বে ভূমার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করে বিশ্বমানবের বিরাট সাধন-মন্দিরে আজ এখনই তোমাকে নত হয়ে নমস্কার করি। নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কার সত্য হোক, নমস্কার সত্য হোক।

সন্ধ্যা। ১১ মাঘ ১৩১৭

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

একটি গান যখনই ধরা যায় তখনই তার রূপ প্রকাশ হয় না— তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কী এবং তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা সমে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁচেছে। যে-

সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দু-সমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল, ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই-যে আঘাত দেবার কাজ, এ একটা সমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে; হিন্দু-সমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, এই চেষ্টা নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও সত্যমিথ্যার ভিতর দিয়ে ঘুরে নানা শাখা প্রশাখার পথ খুঁজতে খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে সত্যের মূর্তি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না, কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে— হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে।

এই চিত্ত যখন জেগেছে তখন হিন্দুসমাজ আর তো অন্ধভাবে কালের স্রোতে ভেসে যেতে পারে না। তাকে এখন থেকে দিক্‌নির্ণয় করে চলতেই হবে, নিজের হালটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ভুল অনেক করবে, কিন্তু ভুল করবার শক্তি যার হয়েছে ভুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বলছিলুম, ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের কাজটা সমে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু, এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়েছে? যে পথিকরা পান্থশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের দ্বারে আঘাত করেই সে কি চলে যাবে, কিম্বা জাগরণের পরেও কি সেই দ্বারে আঘাত করার বিরক্তিকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না? এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবে না?

নিরুদ্ধ উৎসের বাধা দূর করবার জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত মাটি খোঁড়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজটা বিশেষভাবে আমারই। সেই খনন-করা কূপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি, কিন্তু যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বেরিয়ে পড়ে তখন কোদাল ফেলে দিয়ে সেই গর্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে ঝর্নাটা দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিস; তার উপরে আমারই সিল-মোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সংকীর্ণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে; তখন আমরাই তার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এইরকম দুই অধ্যায় আছে। যতদিন বাধা দূর করবার পালা ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব; ততদিন আমাদের কাজ চারি দিক থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন-কি, চারি দিকের বিরুদ্ধ; ততদিন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত তীব্র।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছনো যায় যেখানে বিশ্বের মর্মগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিস সকলেরই জিনিস; সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে নিজেকে তারই অনুবর্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষ্যপরিবর্তন হয়; তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে, পদে পদে আপনাকেই তীব্রভাবে অনুভব করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থকতার সম্মুখে এসে পৌঁছে নিজের এতদিনকার সমস্ত ভাঙাগড়ার চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি?

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে, সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিন-ব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল। সেই সংকটের সময়ে অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয় নি।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে— ব্রাহ্মসমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু, ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্ছি এবং সামাজিক কর্তব্যসাধন করে উপকার পাচ্ছি, এইটুকুমাত্র স্বীকার করেই থামতে পারি নে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড়ো করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয়সাধনের বর্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু, চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে

তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্যসাধনাকেই, ব্রহ্মসাধনাকেই, নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমান-ধর্ম প্রবল ধর্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম নয়। এই ধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল তখনকার ধর্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে পাই নে। কারণ, সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু, সেই মুসলমান-অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমানধর্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি, হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয় আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক রবিদাস কবীর দাদু প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করছেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম—ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ সম্বন্ধে কিরকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান-ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এইজন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক তার মর্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাশ্চাত্যজগতের সত্য আপনার জয়ঘোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে না শত্রুর আঘাত হবে? প্রথম যেদিন সে শৃঙ্গধ্বনি করে এসেছিল সেদিন তো মনে করেছিলুম, সে বুঝি মৃত্যুবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা মনে করেছিল, ভারতবর্ষের সত্যসম্বল নেই, অতএব এইবার তাকে তার জীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি!

কিন্তু, তা হয় নি। পৃথিবীর নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহু দিনের অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধনভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা

হয়েছে— ভয় নেই, কোনো অভাব নেই— এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দ-ভোজে পূর্ব পশ্চিম এক পঙ্‌ক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার-উদ্‌ঘাটনই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। অনেক দিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, তালায় মরচে পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ায় খোলবার সময় কঠিন ধাক্কা দিতে হয়েছে; সেটাকে যেন বিরোধের মতো বোধ হয়েছিল।

কিন্তু, বিরোধ নয়। বর্তমান কালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ-প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীন কালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার, সকল জটিলতার, যথার্থ সমাধান করে দেবে— এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কণ্ঠে আজ ফুটে উঠছে।

ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয়, তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বলতে যে কী বোঝায় উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে।—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়— এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি জল তরুলতাকে আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে— আমাদের চৈতন্য সেখানে পরম-চৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করছে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই-যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বত্র জানা নয়, সর্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্ছে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের

বিচ্ছেদ না রাখা—সমস্তকে ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা—জীবনের এমন পরিপূর্ণতা, জগদ্‌বাসের এমন সার্থকতা আর কী হতে পারে!

কালের বহুতর আবর্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে জিনিস তো একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। তাকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা, এই ব্রহ্মসাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখলে মনুষ্যত্বের কোনো-একটা চরম তাৎপর্য থাকে না—সে একটা পুনঃপুনঃ আবর্তমান অন্তহীন ঘূর্ণার মতো প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ পেয়েছিল মাঝে তাকে হারাতে হয়েছে। কারণ, পুনর্বার তাকে বৃহত্তর ক'রে, পূর্ণতর ক'রে পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল—সেইটিকে শোধন করে নেবার জন্যেই তাকে হারাতে হয়েছে। একবার তার কাছে থেকে দূরে না গেলে তাকে বিশুদ্ধ ক'রে, সত্য ক'রে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলুম কেন? আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে অন্তর ও বাহির, আত্মার দিক ও বিষয়ের দিক সমান ওজন রেখে চলতে পারে নি। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলুম—তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম—তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে পর্যন্ত একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্যাপ্ত করে তুলতে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল, ভক্তি তখন বিচিত্র কর্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিস জড় নয় সে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে টিকতে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য খুঁজতে হয়। জীব যখন খাদ্যাভাবে নিজের চর্বি ও শারীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে, কিন্তু ক্রমশই নীরস ও নির্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তির হৃদয়বৃত্তিও কেবল আপনাকে আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না—আপনাকে পোষণ করবার জন্যে, রক্ষা করবার জন্যে, আপনার বাইরে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু, ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল—এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিতে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে চলছিল। সে বিষয়-রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপাকার করে তুলেছিল—তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই সংগ্রহ, কাজের উত্তেজনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্যরাজ্যে য়ুরোপ গভীরতম চরম ঐক্যটি পায় নি বটে, তবু তার সর্বব্যাপী একটি বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বাঁধা। কোথায় বাঁধা, কার হাতে বাঁধা—এই সমস্ত বন্ধন কোন্‌খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্যবসিত য়ুরোপ তা দেখে নি।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ ক'রে, বিশ্বব্যাপী ক'রে, প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরের বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল; আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতিদূর গহন জ্ঞান-দুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারি দিকে রাজত্ব করছিল আচার-বিচার, বাহ্য অনুষ্ঠান এবং ভক্তিরসমাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসাধনকে পুঁথির অন্ধকারসমাধি থেকে মুক্ত ক'রে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ-পিতামহের সামগ্রী নয়। বলে উঠল, এ খৃস্টানি, এ'কে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্য গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায়, তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন-কি, সকলের চেয়ে বিরুদ্ধে হয়ে প্রতিভাত হন। এ দিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু, সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে, আপনার চেয়ে বড়োকে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র পৃথিবীজোড়া, এবং সেই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু, তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল 'আমি'; তার মন্ত্র ছিল 'জোর যার মুলুক তার'। সে যে অস্ত্রপাণি রক্ত-

বসনা শক্তিদেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউ বা বলে স্বাজাত্য, কেউ বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু, কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসছে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে— কিন্তু, এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না। প্রয়োজনবোধকে যত বড়ো নাম দেও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড়ো সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোল এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্য প্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকতে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাতবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনো দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনোই শুষ্ক হয় নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি— কিন্তু, তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি, যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্ক তুষার-স্রুত এই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র

জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।

১২ মাঘ ১৩১৭

সুন্দর

পশ্চিম আকাশের 'পরে তখনও সূর্যাস্তের ধূসর আভা ছিল; আমাদের আশ্রমে শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুলছিল। আমার হৃদয় একটি বৃহৎ সৌন্দর্যের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে বর্তমান মুহূর্ত তার সীমা হারিয়ে ফেলেছিল; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত যুগের সুদূর অতীত কালের সন্ধ্যার মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল. যেদিন প্রত্যহ সূর্যের উদয় এ দেশে তপোবনের পর তপোবনে পাখির কাকলি এবং সামগানকে জাগিয়ে তুলতে এবং দিনের অবসানে পাটলবর্ণ নিঃশব্দ গোধূলি কত নদীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোমধেনুগুলিকে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আনত, ভারতবর্ষের সেই সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্যাবর্তের দিগন্তপ্রসারিত সমতল ভূমিতে সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে যে আশ্চর্য সৌন্দর্যের মহিমা প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আর্যপিতামহেরা তাকে একদিনও একবেলাও উপেক্ষা করেন নি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিদায় দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃহী তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু. কেবল ভোগীর মতো নয়, ভাবুকের মতো নয়। সৌন্দর্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন—সমস্ত চাঞ্চল্য দমন ক'রে, মনকে স্থির শান্ত ক'রে, উষা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন। আমার মনে হল, নদীসংগমে সমুদ্রতীরে পর্বতশিখরে যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানেই তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেন নি; সেখানে তাঁরা এমন একটি তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো-একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন. যাতে স্বভাবতই সেই সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন হতে পারে।

এই সুন্দরের মহান রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি এই প্রার্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোটো না ক'রে ভক্তি-বৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ করে যেন জানতে পারি। অর্থাৎ, কেবলই তাকে নিজের করে নেবার ব্যর্থ বাসনা ত্যাগ ক'রে আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আমার মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল, সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডির মধ্যে সৌন্দর্যকে অত্যন্ত শৌখিন রকম করে দেখতে চাই— তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি; সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই; এই-জন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোটো করে দেখতে গেলে তার মধ্যে যে-সমস্ত বিরোধ বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়োর মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখতে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠি নে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে, তার সমস্ত ছোটোকে আমরা বড়ো করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়, কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এইজন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি মানবসংসারে তেমন সহজে দেখতে পাই নে।

আজ এই সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজগতের মূর্তিকে যে এমন সুন্দর করে দেখছি এর জন্যে আমাদের কোনো সাধনা নেই। যাঁর এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে সুন্দর করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করতে যাই তা হলে এর মধ্যে যে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার আর অন্ত নেই। এখনই অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যে আগ্নেয় বাষ্পের ভীষণ ঝড় বইছে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম তা হলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মূর্ছিত হয়ে যেতুম। টুকরো টুকরো করে যদি দেখ তা হলে এর মধ্যে কত ঘাতসংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে! এই-যে আমাদের চোখের সামনেই ওই গাছটি এই তারাখচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে যদি আংশিকভাবে দেখতে যাই তা হলে দেখতে পাব এর মধ্যে কত গ্রন্থি কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে। আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব নেই; কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা-কিছু তুচ্ছ—যা-কিছু ব্যর্থ—যা-কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য যে কাটাছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডী-কাটা

জিনিস নয়, বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন এত বড়ো বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করছে। সেই-যে শক্তিকে দেখতে পাই সে অতি ভীষণ, সে কাটছে ভাঙছে টানছে জুড়ছে; সে তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্যনিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে, তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে ক্রন্দনী রোদন করে উঠছে। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখলে এমন ভয়ংকর তারই অখণ্ড সত্যরূপ কী পরমশান্তিময় সুন্দর! সেই ভীষণ যদি সর্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য থাকত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলই বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্য থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলছে। সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ংকর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে, সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য। জগতে এই মুহূর্তেই যেমন আকাশজোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘরধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সংগীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন—তাঁর ভয়ংকর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুলছে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্ছে, এখনই এ আমরা কত সহজে কী অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছি—আমাদের মনে ভয় নেই, ভাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানবসংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করছে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ংকর ঘাতসংঘাত সর্বদাই বড়ো করে প্রত্যক্ষ করছি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষদারিদ্র্য হানাহানি-কাটাকাটির মন্থন কেবলই চারি দিকে চলছে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাকত তা হলে সমস্ত শিথিল হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আকার-আয়তন-হীন কদর্যতায় পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চলছে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ত তেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্য বেগে উদ্গত হয়ে উঠছে; তারই ভয়ংকর পেষণ-ঘর্ষণে রাজ্যসাম্রাজ্য শিল্পসাহিত্য ধর্মকর্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠছে। এই সংসারের মাঝখানে আছেন 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' —কিন্তু, এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না; তাঁরা মহাসৌন্দর্যকেই দেখেন; তাঁরা অমৃতকেই দেখেন। য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অনেকে এমনভাবে বলেন, যেন প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের

আদর্শ। যেন যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি, প্রকৃতির মধ্যে যেন উপরে ওঠবার কোনো বেগ নেই। সেইজন্যেই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু, আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি— সে তো জড়যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্ত কাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্যন্ত তাকে তো তার পথের কোনো-একটা জায়গায় থেমে থাকতে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্পসংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌঁচেছে; এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে; কত ঝড়, কত প্লাবন, কত ভূমিকম্প, কত অগ্নি-উচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘনমেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে। যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভালো করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ, কত অদ্ভুত পাখি, কত আশ্চর্য জন্তু কোন্ নেপথ্যগৃহ থেকে এই সৃষ্টিরঙ্গভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে— আজ তারা অর্ধ-রাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু, প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায় নি। থেমে যদি যেত তা হলে এখনই সা-কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদি-অন্ত-হীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে। কেবলই তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন করে করেই এগোতে হচ্ছে; কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। এইজন্যেই এত দুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্তু, সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোটো ছোটো সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলই ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুটিকেই আমরা একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ, দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়— এইজন্যে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অবিরত অতিভীষণ ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখতে পাচ্ছি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা— এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সব সময়ে আমরা এই দুটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারি নে তার কারণ পূর্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের

অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্ছে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সেই সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করছে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখছি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখছি নে, সেইজন্যেই 'আবিঃ' আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্ছেন না, সেইজন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানব-চরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে, কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে—তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী তার দীপ্তি, কী তার সৌন্দর্য, কী তার পবিত্রতা! কিন্তু, সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ! কত দুঃখের দারুণ দাহে ওই সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে! সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু, সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কত সুন্দর! শুধু তাই নয়, তাঁর চারি দিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্তির উপকরণ; পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্‌দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেইরকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখি নে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখব, ভীষণকে সুন্দর বলে জানব, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' যিনি তাঁকে, ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয়-অপ্রিয় সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড ক'রে, এক ক'রে, সুন্দর ক'রে দেখব। যিনি 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দলীলার নিত্য-

সহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাকব— নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ-কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্যকে যখন আমাদের দুর্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারি দিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে; তখন সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভবুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে; সেই সৌন্দর্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলুম, সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার; প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র; বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।

১৫ চৈত্র ১৩১৭

বর্ষশেষ

আজকের বর্ষশেষের দিবাবসানের এই-যে উপাসনা এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারবে? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক— তোমরা জীবনের আরম্ভমুখেই রয়েছ; শেষ বলতে যে কী বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। বৎসরের পর বৎসর এসে তোমাদের পূর্ণ করছে, আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করছে। তোমরা এই-যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করছ এর জন্য তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি— তোমরা কেবল নিচ্ছ এবং খাচ্ছ। আর, আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আসছি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা শোধ করছি। ঘরে যা সঞ্চয় করে বসে ছিলুম, মনে করেছিলুম কোনো কালে এ আর খরচ করতে হবে না, সেই সঞ্চয়ে টান পড়েছে; আজ কিছু যাচ্ছে, কাল কিছু যাচ্ছে— অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পূর্বাচলের যাত্রী, সূর্যোদয়ের দিকেই তোমাদের মুখ— সেই দিকে যিনি তোমাদের অভ্যুদয়ের পথে আহ্বান করছেন তাঁকে তোমরা পূর্বমুখ করেই প্রণাম করো। আমরা পশ্চিম-অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে উপাসনা

করি—সেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান আসছে; সেই আহ্বানও সুন্দর সুগম্ভীর এবং শান্তিময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।

অথচ এই পূর্বপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ষারম্ভ—একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারম্ভ—কেউ কাউকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারে না। পূর্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মঙ্গলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই—এক দিকে যিনি শিশুর আর-এক দিকে তিনিই বৃদ্ধের। একদিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে তাঁর একস্বরূপের দিকে আমাদের আশীর্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্ছেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত হয়েছে। কোনো শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না—ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়—বিরাম যে কেবল কর্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায়, এই কথাটি আজ এই চৈত্রপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকাশে যেন মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জগতে যা-কিছু চলে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়, তার দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্ছেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্বেই আমি বলেছি, তোমাদের বয়সে তোমরা যেমন প্রতিদিন কেবল নূতন-নূতনকে পাচ্ছ আমাদের বয়সে আমরা তেমনি কেবল দিতেই আছি, আমাদের কেবল যাচ্ছেই। এই কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তা হলে কিজন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, কোন্ ভয়ংকর শূন্যতাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি? তা হলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরত না, আতঙ্কে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু, স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, জীবনের সমস্ত যাওয়া কেবলই একটি পাওয়াতে এসে ঠেকছে—সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেখানে দেখছি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।

এইটিই বড়ো একটি আশ্চর্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া, তাতে পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই পাইনি-পাইনি কান্নাটা থেকে যায়—অন্তরের সে কান্নাটা সকল সময়ে শুনতে পাই নে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো-একটা জায়গায় ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুনতে দেয় না।

কিন্তু, একটু একটু করে রিক্ত হতে হতে অন্তরাত্মা যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছেছে সেটি কী গভীর পাওয়া, কী বিশুদ্ধ পাওয়া! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবামাত্র মৃত্যুভয় চলে যায়—তাতে এ ভয়টা আর থাকে না যে, যা-কিছু

যাচ্ছে তাতে আত্মার কেবল ক্ষতিই হচ্ছে। সমস্ত ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নদী আপন গতিপথে দুই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রকে পেতে পেতে চলে—সমুদ্রে যখন সে এসে পৌঁছয় তখন আর নূতন-নূতনকে পায় না—তখন তার দেবার পালা। তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই থাকে। কিন্তু, আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই তো পরিপূর্ণ পাওয়া। তখন সে দেখে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিয়েও কিছুতেই তার লোকসান আর হয় না। বস্তুত কেবলই আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার প্রধান উপায়। যখন আপনার নানা জিনিস থাকে তখন আমরা মনে করি সেই থাকাতেই সমস্ত-কিছু আছে, সে-সব ঘুচলেই একেবারে সব শূন্যময় হয়ে যাবে। সেইজন্যে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা।

এইজন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে। যদি না থাকত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্ অবকাশ দিয়ে আমরা দেখতে পেতুম, তা হলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম; সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু, বিষয় কেবলই মেঘের মতো সরে যাচ্ছে, কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে ব'লেই যিনি সরে যাচ্ছেন না—মিলিয়ে যাচ্ছেন না—তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তাই আমি বলছি, আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বন্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখো। কিছুই থাকছে না, সবই চলেছে, এইটিই লক্ষ্য করো। মন শান্ত ক'রে, হৃদয় শুদ্ধ ক'রে, এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে এই সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্ছে এমন একটি থাকা স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে, তার হিসাব রাখতে কে পারে—তা অনেক, তা অসংখ্য—কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে, সমস্ত দিয়ে, যাঁকে পাচ্ছি তিনি এক। 'গেছে গেছে' এ কথাটা যতই কেঁদে বলি-না কেন, 'তিনি আছেন' 'তিনি আছেন' এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠছে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগছে সেখানে ভালো করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা-কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও, দেখো : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি

তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ করো—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণুপরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু এক জায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কলশব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্মমরণ এই নিঃশব্দ সংগীতে বিলীন হয়ে রয়েছে : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আজ আমি আমার জীবনের দেওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানের আসনটিতে বসে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি। এই জায়গাটিতে তিনি যে আজ আমাকে বসতে দিয়েছেন এজন্যে আমি আমার মানবজীবনকে ধন্য মনে করছি। তাঁর যে বাহু গ্রহণ করে এবং তাঁর যে বাহু দান করে এই দুই বাহুর মাঝখানটিতে তাঁর যে বক্ষ, যে কোল, সেই বক্ষে, সেই কোলে আমি আমার জীবনকে অনুভব করছি। এক দিকে অনেককে হারিয়েও আর-এক দিকে এককে পাওয়া যায় এই কথাটি জানবার সুযোগ তিনি ঘটিয়েছেন। জীবনে যা চেয়েছি এবং পাই নি, যা পেয়েছি এবং চাই নি, যা দিয়ে আবার নিয়েছেন, সমস্তকেই আজ জীবনের দিবাবসানের পরম মাধুর্যের মধ্যে যখন দেখতে পাচ্ছি তখন তাদের দুঃখবেদনার রূপ কোথায় চলে গেল! আমার সমস্ত হারানো আজ আনন্দে ভরে উঠছে—কেননা, আমি যে দেখতে পাচ্ছি তিনি রয়েছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে কিছুই হয় নি—আমার যা-কিছু গেছে তাতে তাঁকে কিছুই কমিয়ে দিতে পারে নি, সমস্তই আপনাকে সরিয়ে তাঁকেই দেখাচ্ছে। সংসার আমার কিছুই নেয় নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয় নি—একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনও তিনিই আছেন এমন আনন্দ আর কিছু নেই, এমন অভয় আর কী হতে পারে!

আজ আমার মন তাঁকে বলছে, বারে বারে খেলা শেষ হয়, কিন্তু হে আমার জীবন-খেলার সাথি, তোমার তো শেষ হয় না। ধুলার ঘর ধুলায় মেশে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায়, কিন্তু যে তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ, সেই তুমি খেলার আরম্ভেও যেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ। যখন খেলায় খুব করে মেতেছিলুম তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল; তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে এল তখন তোমাকে ধরেছি, তোমাকে চিনেছি। তখন আমি তোমাকে বলতে পেরেছি, খেলা আমার হারিয়ে যায় নি, সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে; দেখতে পাচ্ছি ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আবার তুমি গোপনে নূতন আয়োজন করছ, সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্তরে অনুভব করছি।

এবারকার এ খেলার ঘরটাকে তা হলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ভাঙাচোরা আবর্জনার আঘাতে পদে পদে ধুলোর উপরে পড়তে হয়—এবার সে-সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়ে দাও, কিছুই আর বাকি রেখো না। এই-সমস্ত

ভাঙা খেলনার জোড়াতাড়া খেলা এ আর আমি পেরে উঠি নে। সব তুমি লও লও, সব কুড়িয়ে লও। যত বিঘ্ন দূর করো, যত ভগ্ন সরিয়ে দাও, যা-কিছু ক্ষয় হবার দিকে যাচ্ছে সব লয় করে দাও—হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নূতনের জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো।

[৩০ চৈত্র ১৩১৭]

নববর্ষ

আজ নববর্ষের প্রাতঃসূর্য এখনো দিক্‌প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে নি—এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম প্রণামটিকে আমাদের অনন্ত কালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি। এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক।

এই-যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই-যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যূষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো—কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না; আকাশ-ভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল; কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল, তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে—সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায় নি— আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এইজন্যেই বসন্ত যেদিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিনে বাতাসে নবীনতার আশিস্‌মন্ত্র পড়ে দেয় সেদিন দেখতে দেখতে তখনই অনায়াসে শুকনো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়—এই-যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়—কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু, মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসি-মুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়— বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মতো আর্তস্বরে ক্রন্দন

করে ওঠে, এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্‌গের মতো দিকে দিগন্তে চমকিত হতে থাকে।

মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশি দিনের সন্তান নয়, তবু জগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে যেন প্রাচীন। কেননা, সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত— যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাকতে পারছে না। সে আপনার শত-সহস্র সংস্কারের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে— সেই তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস-মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখতে দেখতে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শতসহস্র বৎসরের মহারণ্যও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষার-রত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মতো। চারি দিকের জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারি দিকের বিরাট প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন— সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহু কালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে— প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না— অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারি দিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার। সেইজন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্মস্থানে গিয়ে পড়ে— তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি 'প্রভু, তুমি আমাকেই মারছ'; বলি 'আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা করো'; কিম্বা বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি 'তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, এ আমি গ্রহণ করব না'।

মানুষ-সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করছে। প্রকৃতির কত লক্ষ

কোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসংগত সুসংহত করে না তুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা— ততক্ষণ তার যুদ্ধ-অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুলছে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং সুষমার পরিবর্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারি দিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।

সেইজন্যে বিশ্বজগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মতো অবিশ্রাম চলেছে, এক দিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেইজন্যেই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো-একটা বিশেষ দিন নেই—সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না—তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়—বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেইজন্যে আমি বলছি, এই প্রত্যূষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই-যে অরুণালোকের সহজ নির্মলতা, এই-যে পাখির কাকলির স্বাভাবিক মাধুর্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়—যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ, যেন মনে না করি একে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি, এই আলোকের নির্মলতা আমারই নির্মলতা, এই আকাশের শান্তি আমারই শান্তি; মনে যেন না করি, স্তব পাঠ ক'রে, নামগান ক'রে কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ করে আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

জগতের মধ্যে এই মুহূর্তে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ করেছেন তিনি আজ নববর্ষকেও আমাদের দ্বারে প্রেরণ করলেন, এই কথাটিকে সত্যরূপে মনের মধ্যে চিন্তা করো। একবার ধ্যান করে দেখো, আমাদের সেই নববর্ষের কী ভীষণ রূপ। তার অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বলছে। প্রভাতের এই শান্ত নিঃশব্দ সমীরণ সেই ভীষণের কঠোর আশীর্বাদকে অনুচ্চারিত বজ্রবাণীর মতো বহন করে এনেছে।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়— পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে; আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন; তিনি তাকে সহজ জীবন দেন নি। সেইজন্যেই সাধনা করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়; তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলছি, আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে নববর্ষ পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে তো সহজ দান নয়, আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি তবে মাথা তুলতে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি 'তোমার এ ভার বহন করতে পারি নে, প্রভু— মনুষ্যত্বের অতি-বিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর'।

প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন, তাই তো মানুষের ব্রত এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনো-মতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, কর্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্যেই তার উপরে এত দাবি। এইজন্যে নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব করে চলতে হয়; এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসম্বরণ।

মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন, 'তুমি বীর।' তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মতো আর তো সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, 'হে বীর, জাগ্রত হও। একটি দরজার পর আর-একটি দরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আর-একটি পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ করো; তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না, ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক।'

এই যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র— সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্বল কণ্ঠে বলি 'আমার বল নেই', সেইটেই আমাদের মোহ। দুর্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনিককে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা করে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শানিত অস্ত্র সব ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। সে-সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়ছি, ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষতবিক্ষত করছে। এ-সমস্ত তো সঞ্চয় করে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণহস্তের দৃঢ়মুষ্টিতে;

পথ কেটে বাধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এসো, এসো, দলে দলে বাহির হয়ে পড়ো— নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্বগগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠছে— সমস্ত অবসাদ কেটে যাক, সমস্ত দ্বিধা সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে যাক— জয় হোক তোমার, জয় হোক তোমার প্রভুর।

না না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মতো গ্রহণ করো।

প্রভু, আজ তোমাকে কোনো জয়বার্তা জানাতে পারলুম না। কিন্তু, যুদ্ধ চলছে, এ যুদ্ধে ভঙ্গ দেব না। তুমি যখন সত্য, তোমার আদেশ যখন সত্য, তখন কোনো পরাভবকেই আমার চরম পরাভব বলে গণ্য করতে পারব না। আমি জয় করতেই এসেছি— তা যদি না আসতুম তবে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে এক মুহূর্ত আমি দাঁড়াতে পারতুম না। তোমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তোমার সূর্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমার সমীরণ আমার মধ্যে প্রাণের সংগীত বাজিয়ে তুলেছে। তোমার মহামনুষ্যলোকে আমি অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি; তোমার এত দানকে, এত আয়োজনকে আমার জীবনের ব্যর্থতার দ্বারা কখনোই উপহসিত করব না। আজ প্রভাতে আমি তোমার কাছে আরাম চাইতে, শান্তি চাইতে দাঁড়াই নি। আজ আমি আমার গৌরব বিস্মৃত হব না। মানুষের যজ্ঞ-আয়োজনকে ফেলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ বিশ্রামের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করব না। যতবার আমরা সেই চেষ্টা করি ততবার তুমি ফিরে ফিরে পাঠিয়ে দাও, আমাদের কাজ কেবল বাড়িয়েই দাও, তোমার আদেশ আরও তীব্র, আরও কঠোর হয়ে ওঠে। কেননা, মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকবে তার এ লজ্জা তুমি স্বীকার করতে পার না। দুঃখ দিয়ে ফেরাও— পাঠাও তোমার মৃত্যু-দূতকে ক্ষতিদূতকে। জীবনটাকে নিয়ে যতই এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি ততই তাতে সহস্র দুঃসাধ্য গ্রন্থি পড়ে গেছে— সে তো সহজে মোচন করা যাবে না, তাকে ছিন্ন করতে হবে। সেই বেদনা থেকে আলস্যে বা ভয়ে আমাকে লেশমাত্র নিরস্ত হতে দিয়ো না। কতবার নববর্ষ এসেছে, কত নববর্ষের দিনে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। কিন্তু, কত মিথ্যা আর বলব, বারে বারে কত মিথ্যা সংকল্প আর উচ্চারণ করব, বাক্যের ব্যর্থ অলংকারকে আর কত রাশীকৃত করে জমিয়ে তুলব! জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক— সেই বেদনার বহ্নিশিখায় তুমি আমাকে পবিত্র করো। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি— তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিন বলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দসংগীত

বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তা হলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাব। তা হলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

[১ বৈশাখ ১৩১৮]

বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা

কর্ম করতে করতে কর্মসূত্রে এক-এক জায়গায় গ্রন্থি পড়ে— তখন তাই নিয়ে কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে, খুলতে, সেরে নিতে চার দিকে কত রকমের টানাটানি করতে হয়— তাতে মন উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেই রকমের একটা গ্রন্থি পড়েছিল— তাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ মন্দিরে বসেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা বুঝি করতে হবে; এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার আঘাত ছিল। কী করলে জট ছাড়ানো হবে, জঞ্জাল দূর হবে, হিতবাক্য তোমরা অবহিতভাবে শুনতে পারবে— সেই কথা আমার মনকে ভিতরে ভিতরে তাড়না দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখতে দেখতে উত্তর-পশ্চিমে ঘনঘোর মেঘ করে এসে সূর্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মতো ধুলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে।

আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপর একটা কোলাহল জেগে উঠল; তার পরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল— পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্মরে আকাশ ভরে গেল— ঘনধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ, এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে-সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে-সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারি দিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। স্নান ও পানের জলের কিরকম ব্যবস্থা করা হবে সেজন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম; মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল— দেখতে দেখতে জলে একেবারে চার দিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়,

ক্ষণে ক্ষণে নয়— চিন্তা করে নয়, চেষ্টা করে নয়— পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্যাপ্ত বর্ষণ, এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা, আমারও মন থেকে সমস্ত প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমারই ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে নেই, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা এক মুহূর্তে অনুভব করলে। পরিপূর্ণতাকে শনৈঃ শনৈঃ করে একটুর সঙ্গে আর-একটুকে জুড়ে গেঁথে কোনো কালে পাবার জো নেই। সে মৌচাকের মধু ভরা নয়, সে বসন্তের এক নিশ্বাসে বনে বনে লক্ষকোটি ফুলের নিগূঢ় মর্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানেও পূর্ণস্বরূপের শক্তি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ করছে— যখন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাশ্যের অপার-মরুভূমিকেও সরসতায় অভিষিক্ত করে অকস্মাৎ সে কী আশ্চর্যরূপে দেখা দেয়। বহু দিনের মৃত পত্র তখন এক মুহূর্তে ঝেঁটিয়ে ফেলে, বহু কালের শুষ্ক ধূলিকে এক মুহূর্তে শ্যামল করে তোলে— তার আয়োজন যে কোথায় কেমন করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখতেও দেয় না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন, সে যে কী বাধাহীন, কী প্রচুর, কী মধুর, কী গম্ভীর, সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে; আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করছে।

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই— কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার মন বলছে না। কেবল ইচ্ছা করছে, বিশ্বজগতের মধ্যে যে-একটি পরমগম্ভীর অন্তহীন আশা জেগে রয়েছে, কোনো দুঃখবিপত্তি-অভাবে যাকে পরাস্ত করতে পারছে না, গানের সুরে তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন করে দিই। বলি, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই— তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন দেখা দেবে সে পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাকবে— যে দীনতা কোনোদিন পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে। নামবে তোমার বর্ষণ, একেবারে ঝর ঝর করে ঝরতে থাকবে তোমার প্রসাদধারা— গহ্বর যত গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ অন্তরের অন্তরতম গভীরতার মধ্যে অনুভব করি সেখানটি ধীরে ধীরে ভরে উঠছে। বারিধারা ঝরছে ঝরছে— সমস্ত ধুয়ে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত নবীন হয়ে উঠছে, শ্যামল হয়ে উঠছে। বাইরে কেউ দেখতে পাচ্ছে না— বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত নিবিড় অন্ধকার; তারই মধ্যে নেমে আসছে তাঁর নিঃশব্দচরণ দূতগুলি; ভরে ভরে নিয়ে আসছে তাঁরই সুধাপাত্র।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বসে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই— এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে-ঘেরা আশ্রমের তরুশাখাগুলির মধ্যে, তবে প্রত্যেক ধূলিকণাটির মধ্যে কী গূঢ় গভীর পুলক অনুভব করব! সেই পুলকোচ্ছ্বাসের গন্ধে আকাশ ভরে গিয়েছে— প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাতাটি আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে— তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাপ্ত আনন্দ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আজ নিঃশব্দে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। চারি দিকের এই মূক অব্যক্ত প্রাণের খুশির সঙ্গে মানুষ তুমিও খুশি হও! এই সহসা-অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুশি, এই এক মুহূর্তে সমস্ত অভাবের দীনতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে খুশি, সেই খুশির সঙ্গে মানুষ তোমার সমস্ত মন প্রাণ শরীর আজ খুশি হয়ে উঠুক। আজকের এই গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহু দিনের কর্মক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে যাক— পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এসো, এসো, তুমি এসো— আমার দিক্‌ দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এসো! হে গোপন, তুমি এসো! প্রান্তরের এই নির্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে তুমি এসো! সমস্ত গাছের পাতা সমস্ত তৃণদলের সঙ্গে আজ পুলকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এসো, আজ তুমি বিনা সাধনের ধন হয়ে ধরা দাও— তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শলাভের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি।

[৬ বৈশাখ ১৩১৮]

সত্যবোধ

আজকের এই প্রান্তরের উপর জ্যোৎস্নার আলোক দেখে আমার অনেক দিনের আরও কয়েকটি জ্যোৎস্নারাত্রির কথা মনে পড়ছে।

তখন আমি পদ্মানদীতে বাস করতুম। পদ্মার চরে নৌকা বাঁধা থাকত। শুক্লপক্ষের রাত্রিতে কতদিন আমি একলা সেই চরে বেড়িয়েছি। কোথাও ঘাস নেই, গাছ নেই— চাঁদের আলোর সঙ্গে বালুচরের প্রান্ত মিশিয়ে গেছে— সেই পরিব্যাপ্ত শুভ্রতার মধ্যে একটিমাত্র যে ছায়া সে কেবল আমার।

সেই আমার নির্জন সন্ধ্যায় আমার একজন সঙ্গী জুটল। তিনি আমাদের একজন কর্মচারী। তিনি আমার পাশে চলতে চলতে অনেক সময়েই দিনের কাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। সে-সমস্তই দেনাপাওনার কথা, জমিদারির কথা, আমাদের প্রয়োজনের কথা।

সেই আমার কানের কাছে সেই একটিমাত্র মানুষের একটুখানি কণ্ঠের ধ্বনি এত বড়ো নক্ষত্রলোকের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিত,

এবং এত বড়ো একটি নিভৃত শুভ্রতার উপরেও যেন ঘোমটা পড়ে যেত, তাকে আর যেন আমি স্পষ্ট করে দেখতেই পেতুম না।

তার পরে তিনি চলে গেলে হঠাৎ দেখতে পেতুম আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম— সেইজন্যে চার দিকের বড়োকে আমি আর সত্য বলে জানতে পারছিলুম না, এত বড়ো শান্তিময় সৌন্দর্যময় আকাশভরা প্রত্যক্ষ বর্তমানও আমার কাছে একেবারে কিছুই-না হয়ে গিয়েছিল।

এই নিয়ে কতদিন মনের মধ্যে আমি বিস্ময় অনুভব করেছি। এই কথা মনে ভেবেছি, যতক্ষণ কেবল আমারই সংক্রান্ত কথা হচ্ছিল, আমারই বিষয়কর্ম, আমারই আয়োজন প্রয়োজন— আমার মনের মধ্যে আমিই যখন একমাত্র প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলুম— বস্তুত তখনই আমার বিশ্বের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম। ততক্ষণ চাঁদ আমার কাছ থেকে তার জ্যোৎস্না ফিরিয়ে নিয়েছিল; নদীর কলধ্বনি আমাকে একেবারে নগণ্য করে দিয়ে পাশে থেকেও আমাকে অস্পৃশ্যের মতো পরিহার করে চলে গিয়েছিল; এই দিগন্ত-ব্যাপী শুভ্র আকাশের মধ্যে তখন আমি আর ছিলুম না— আমি নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিলুম।

শুধু তাই নয়, তখন আমার মনের মধ্যে যে ভাব, যে ভাবনা, চারি দিকের বিশ্বজগতের সঙ্গে তার যেন কোনো সত্য যোগ নেই। নিখিলের মাঝখানে তাকে ধরে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় সে একটা অদ্ভুত মিথ্যা। জমি-জমা হিসাব-কিতাব মামলা-মকদ্দমা এ-সমস্ত শূন্যগর্ভ বুদ্‌বুদ্‌ বিশ্বসাগরের মধ্যে কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে মুহূর্তে মুহূর্তে কত শতসহস্র বিদীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তা হোক, তবু সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদেরও স্থান আছে। সমুদ্রের সমগ্র সত্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ঐ বুদ্‌বুদেরও যেটুকু সত্য সেটুকুকে একেবারে অস্বীকার করবার দরকারই হয় না। কিন্তু, আমরা যখন এই বুদ্‌বুদের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে সমুদ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারে হারাই তখনই আমাদের বিপদ ঘটে।

আমরা বড়োর মধ্যে আছি এই কথাটি যখন আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকে তখন ছোটোকে স্বীকার করে নিলে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। বড়ো জগতে আমাদের বাস, বড়ো সত্যে আমাদের চির-আশ্রয় এই কথাটি যাতে ভুলিয়ে দেয় তাতেই আমাদের সর্বনাশ করে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে বড়োতে আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। ছোটোখাটোর মধ্যে সহজেই আমাদের চলে যায়। কিন্তু, যাতে তার কেবলমাত্র চলে যায় মানুষকে তার মধ্যে তো মানুষ থাকতে দেয় নি। মানুষকে সকল দিকেই মানুষ তার থেকে বাইরে টেনে আনছে।

এই-যে তোমরা মানবশিশু, পৃথিবীতে তোমরা সকলের চেয়ে ছোটো; আজ তোমাদের আমরা এই মন্দিরে এনেছি জগতে সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তাঁকে

প্রণাম করতে। বাহির থেকে দেখলে কারও হাসি পেতে পারে, মনে হতে পারে এর কী দরকার।

কিন্তু, মনকে একবার জিজ্ঞাসা কোরো, এত বড়ো আকাশ, এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই বা আমাদের জন্মাবার কী দরকার ছিল। আমাদের চার দিকে যথোপযুক্ত স্থানটুকু রেখে তার চার দিকে বেড়া তুলে দিলে কোনো অসুবিধা হ'ত না—বরঞ্চ অনেক বিষয়ে হয়তো সুবিধা হ'ত, অনেক কাজ হয়তো সহজ হতে পারত।

কিন্তু, ছোটোর পক্ষেও বড়োর একটি গভীরতম অন্তরতম দরকার আছে। সে এক দিকে অত্যন্ত ছোটো হয়েও আর-এক দিকে অত্যন্ত বড়োকে এক মুহূর্তের জন্যেও হারায় নি—এই সত্যের মধ্যেই সে বেঁচে আছে। তার চার দিকে সমস্তই তাকে কেবল বড়োর কথাই বলছে। আকাশ কেবলই বলছে 'বড়ো'; আলোক কেবলই বলছে 'বড়ো'; বাতাস কেবলই বলছে 'বড়ো'। দিবসের পৃথিবী তাকে বলছে 'বড়ো'; রাত্রের নক্ষত্রমণ্ডলী তাকে বলছে 'বড়ো'। গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে নদী সমুদ্র প্রান্তর সকলেই তার কানের কাছে অহোরাত্র এই এক মন্ত্রই জপ করছে 'বড়ো'। ছোটো মানুষটি বড়োর মধ্যেই দৃষ্টি মেলেছে, সে বড়োর মধ্যেই নিশ্বাস নিচ্ছে, সে বড়োর মধ্যেই সঞ্চরণ করছে।

এইজন্যে মানুষ ছোটো হয়েও কিছুতেই ছোটোতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। এমন-কি, ছোটোর মধ্যে যে সুখ আছে তাকে ফেলে দিয়ে, বড়োর মধ্যে যে দুঃখ আছে তাকেও মানুষ ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থনা করে। মানুষের জ্ঞান সূর্য চন্দ্র তারার মধ্যেও তত্ত্ব সন্ধান করে বেড়ায়—তার শক্তি কেবলমাত্র ঘরের মধ্যে আপনাকে আরামে আটকে রাখতে পারে না। এই বড়োর দিকেই মানুষের পথ, সেই দিকেই তার গতি, সেই দিকেই তার শক্তি, সেই দিকেই তার সত্য—এই সহজ কথাটি কখন সে ভুলতে থাকে? যখন সে আপন হাতের-গড়া বেড়া দিয়ে আপনার চার দিক ঘিরে তুলতে থাকে। তখন এই জগৎ থেকে যে বড়োর মন্ত্রটি দিনরাত্রি উঠছে সেটি তার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পায় না। আমরা ছোটো হয়েও বড়ো, এই মস্ত কথাটি তখন দিনে দিনে ভুলে যেতে থাকি এবং আমাদের সেই এক বড়ো দেবতার আসনটি ছোটো ছোটো শতসহস্র অপ-দেবতা এসে অধিকার করে বসে।

বড়োর মধ্যেই আমাদের বাস এই সত্যটি স্মরণ করবার জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আছে : ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। এই কথাটা একেবারে ভুলে গিয়ে যখন আমরা নিশ্চয় করে মনে করে বসি ঘরের মধ্যেই আমাদের বাস, ধনের মধ্যেই আমাদের বাস, তখনই হৃদয়ের মধ্যে যত রাজ্যের উৎপাত জেগে ওঠে—যত কাম ক্রোধ লোভ মোহ। বদ্ধ জলে বদ্ধ বাতাসে যেমন কেবলই বিষ জমে তেমনি যখনই মনে করি আমাদের সংসারক্ষেত্রই আমাদের কর্মক্ষেত্রই আমাদের সত্য আশ্রয়, তখনই বিরোধ বিদ্বেষ সংশয় অবিশ্বাস পদে পদে জেগে উঠতে থাকে; তখনই আপনাকে ভুলতে পারি নে এবং অন্যকে কেবলই আঘাত করি।

যেমন আপনার সংসারের মধ্যেই সমস্ত জগৎকে না দেখে জগতের মধ্যেই আপনার সংসারকে দেখলে তবে সত্য দেখা হয় এবং সেই সত্যকে আশ্রয় করে থাকলে নিজের প্রবৃত্তির বিকৃতি সহজে ঘটতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক মানুষকেও আমাদের সত্য করে দেখা চাই।

আমরা মানুষকে সত্য করে কখন দেখি নে? কখন তাকে ছোটো করে দেখি? যখন আমার দিক থেকে তাকে দেখি, তার দিক থেকে তাকে দেখি নে। আমার পক্ষে সে কতখানি এইটে দিয়েই আমরা মানুষকে ওজন করি। আমার পক্ষে তার কী প্রয়োজন, আমি তার কাছ থেকে কতটা আশা করতে পারি, আমার সঙ্গে তার ব্যবহারিক সম্বন্ধ কতখানি, এই বিচারের দ্বারাই আমরা মানুষকে সীমাবদ্ধ করে জানি। যেমন আমরা পৃথিবীতে অধিকাংশ সময়ে এই ভাবেই বাস করি যে কেবল আমার বিষয়সম্পত্তিকে আমার ঘরবাড়িকে ধারণ করবার জন্যই বিশ্বজগৎটা রয়েছে, তার অস্তিত্বের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই—তেমনি আমরা মনে করি, আমার প্রয়োজন এবং আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সম্বন্ধকে বহন করবার জন্যেই মানুষ আছে। আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও সে যে কতখানি তা আমরা দেখি নে।

জগৎকে অহরহ ছোটো করে দেখলে যেমন নিজেকেই ছোটো করে ফেলা হয়, তেমনি মানুষকে কেবলই নিজের ব্যবহারিক সম্বন্ধে ছোটো করে দেখলে নিজেকেই আমরা ছোটো করি। তাতে আমাদের শক্তি ছোটো হয়ে যায়, আমাদের প্রীতি ছোটো হয়ে যায়। জগতে যাঁরা মহাত্মা লোক তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে দেখেছেন, নিজের সংস্কার বা নিজের প্রয়োজনের দ্বারা তাকে টুকরো করে দেখেন নি। এতে করে তাঁদের নিজেদের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে তাঁরা দেখেছেন বলেই নিজেকে তাঁরা মানুষের জন্যে দান করতে পেরেছেন।

নিজের দিক থেকেই যখন আমরা অন্যকে দেখি তখন আমরা অতি অনায়াসেই অন্যকে নষ্ট করতে পারি। এমন গল্প শোনা গেছে, ডাকাত মানুষকে খুন করে ফেলে শেষকালে তার চাদরের গ্রন্থি থেকে এক পয়সা মাত্র পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনের দিক থেকে দেখে মানুষের প্রাণকে সে এক পয়সার চেয়েও ছোটো করে ফেলেছে। নিজের ভোগপ্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষকে আমরা ভোগের উপায় বলে দেখি, তাকে আমরা মানুষ বলে সম্মান করি নে—আমার লুব্ধ বাসনা দ্বারা অনায়াসেই আমরা মানুষকে খর্ব করতে পারি। বস্তুত মানুষের প্রতি অত্যাচার অবিচার ঈর্ষা ক্রোধ বিদ্বেষ এ সমস্তেরই মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে আমরা আমার দিক থেকে দেখার দরুন তার মূল্য কমিয়ে দিই এবং তার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এর ফল হয় এই যে, এতে করে আমাদের নিজেরই মূল্য কমে যায়। অন্যকে নামিয়ে দিলেই আমরা নেমে যাই। কেননা, মানুষের যথার্থ আশ্রয় মানুষ—

আমরা বড়ো হয়ে পরস্পরকে বড়ো করি। যেখানে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ নামিয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণকেও নীচে নামতে হয়েছে, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শূদ্র যদি বড়ো হত সে স্বতই ব্রাহ্মণকে বড়ো করে রাখত। রাজা যদি নিজের প্রয়োজন বা সুবিধা বুঝে প্রজাকে খর্ব করে রাখে তবে নিজেকে সে খর্ব করেই। কারণ, কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন নয়—প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষকে মূল্য দান করে। যেখানে মানুষ ভৃত্যকে ভৃত্যমাত্র মনে না ক'রে মানুষ বলে জ্ঞান করে সেখানে সে মনুষ্যত্বকে সম্মান দেয় বলেই যথার্থরূপে নিজেকেই সম্মানিত করে।

কিন্তু, আমাদের তামসিকতাবশত জগতেও যেমন আমরা সত্য করে বাস করি নে মানুষকেও তেমনি আমরা সত্য করে দেখতে পারি নে। সেইজন্যে জগৎকে কেবলই আমার সম্পত্তি করে তুলব এই কথাই আমার অহোরাত্রের ধ্যান হয় এবং সেইজন্যই অধিকাংশ জগৎই আমার কাছে থেকেও না-থাকার মতো হয়ে যায়—মানুষকেও তাই আমরা আমাদের নিজের সংস্কার স্বভাব ও প্রয়োজনের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই দেখি। সেইজন্যে মানুষের যে দিকটা নিত্য সত্য, যে দিকটা মহৎ, সে দিকটা আমাদের চোখেই পড়ে না; সেইজন্যে ব্যবসায়ীর মতো আমরা কেবলমাত্র তার মজুরির দাম দিই, আত্মীয়ের মতো তার মনুষ্যত্বের কোনো দাম দিই নে। এইজন্যে যদিচ আমরা বড়োর মধ্যেই আছি তবু আমরা বড়োকে গ্রহণ করি নে; যদিচ সত্যই আমাদের আশ্রয় তবু সে আশ্রয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি।

এইরকম অবস্থায় মানুষকে আমরা অতি অনায়াসেই আঘাত করি, অপমান করি। মানুষকে এরকম উপেক্ষা ক'রে, অবজ্ঞা ক'রে, আমাদের যে কোনো প্রয়োজনসিদ্ধি হয় তা নয়—এমন-কি, অনেক সময় হয়তো প্রয়োজনের ব্যাঘাত ঘটে—কিন্তু, এ একটা বিকৃতি। বৃহৎ সত্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে স্বভাবতই যে বিকৃতি দেখা দেয় এ সেই বিকৃতি। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বজগতের মধ্যে আমরা আমাদের পরিবেষ্টনকে সংকীর্ণ করে নিয়েছি বলেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলো দূষিত হয়ে উঠতে থাকে; সেই দূষিত প্রবৃত্তিই মারীরূপে আমাদের নিজেকে এবং অন্যকে মারতে থাকে।

এই আশ্রমে আমাদের যে সাধনা সে হচ্ছে এই বিশ্বে এবং মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভের সাধনা। সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বোধ করতে চাই। এ সাধনা সহজ নয়—কিন্তু, কঠিন হলেও তবু সত্যের সাধনাই করতে হবে। এ আশ্রম আমাদের সাধনার ক্ষেত্র—সে কথা ভুলে গিয়ে যখনই একে আমরা কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্র বলে মনে করি তখনই আমাদের আত্মার বোধশক্তি বিকৃত হতে থাকে, তখনই আমাদের আমিটাই বলবান হয়ে ওঠে। তখনই আমরা পরস্পরকে আঘাত করি, অবিচার করি। তখন আমাদের উক্তি অত্যুক্তি হয়, আমাদের আচার অত্যাচার হয়ে পড়ে।

কর্ম করতে করতে কর্মের সংকীর্ণতা আমাদের ঘিরে ফেলে—কিন্তু দিনের

মধ্যে অন্তত একবার মনকে তার বাইরে নিয়ে গিয়ে উদার সত্যকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্মপ্রয়োজনের অতীত ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে। সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন এমনভাবে যাপন করতে হবে যাতে বোঝা যায় যে আমরা সত্যকে মানি। আমাদের সত্য করে বাঁচতে হবে— সমস্ত মিথ্যার জাল, সমস্ত কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতেই হবে— জগতে যিনি সকলের বড়ো তিনিই আমার জীবনের ঈশ্বর এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা যে তাঁর মধ্যে বেঁচে আছি এ কথা কি জীবনে একদিনও অনুভব করে যেতে পারব না? এই নানা সংস্কারে আঁকা, নানা প্রয়োজনে আঁটা, আমির পর্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই চার দিকে দেখতে পাব জগৎ কী আশ্চর্য অপরূপ! মানুষ কী বিপুল রহস্যময়! তখন মনে হবে, এই সমস্ত পশুপক্ষী গাছপালাকে এই যেন আমি প্রথম সমস্ত মন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি— আগে এরা আমার কাছে দেখা দেয় নি। সেইদিনই এই জ্যোৎস্নারাত্রি তার সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দেবে— এই আকাশে এই বাতাসে একটি চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সেইদিন আমাদের মানবসংসারের মধ্যে জগৎ-সৃষ্টির চরম অভিপ্রায়টিকে সুগভীরভাবে দেখতে পাব— এবং অতি সহজেই দূর হয়ে যাবে সমস্ত দাহ, সমস্ত বিক্ষোভ, এই অহমিকাবেষ্টিত ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত দুঃসহ বিকৃতি।

[২৯ চৈত্র ১৩১৭]

সত্য হওয়া

বিশ্বচরাচরকে যিনি সত্য করে বিরাজ করছেন তাঁকেই একেবারে সহজে জানব এই আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের আত্মার মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে, এই কথাটি নিয়ে সেদিন আলোচনা করা গিয়েছিল।

কিন্তু, এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যিনি সকলের চেয়ে সত্য, যাঁর মধ্যে আমরা আছি, তাঁকে নিতান্ত সহজেই কেন না বুঝি— তাঁকে জানবার জন্যে নিয়ত এত সাধনা এত ডাকাডাকি কেন?

যার মধ্যে আছি তার মধ্যেই সহজ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে— এখানে তারই উল্লেখ করব।

মাতার গর্ভে ভ্রূণ অচেতন হয়ে থাকে। মাতার দেহ থেকে সে রস গ্রহণ করে, তাতে তাকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না। মায়ের স্বাস্থ্যেই তার স্বাস্থ্য, মায়ের পোষণেই তার পোষণ, মায়ের প্রাণেই তার প্রাণ।

যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিশ্চেষ্টতা থেকে একেবারে সচেষ্টতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। এখানে আলোক অজস্র, আকাশ উন্মুক্ত, এখানে সে কোনো

আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু, তবু এই মুক্ত-আকাশ প্রশস্ত পৃথিবীতে বাস করেও এই মুক্তির মধ্যে সঞ্চরণের সহজ অধিকার সে একেবারেই পায় না। অনেক দিন পর্যন্ত সে চলতে পারে না, বলতে পারে না। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে, তার হৃদয়ে মনে যে-সমস্ত শক্তি আছে, যে-সমস্ত শক্তির দ্বারা সে এই পৃথিবীর মধ্যে সহজ হয়ে উঠবে, তাকে অক্লান্ত চালনা করে অনেক দিনে তবে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

ভূমিষ্ঠ শিশু গর্ভবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে, তবু অনেক দিন পর্যন্ত গর্ভের সংস্কার তার ঘোচে না। সে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নিদ্রিত অবস্থাতেই তার অধিকাংশ সময় কাটে।

কিন্তু, জড়ত্বের এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও তবু আমরা জানি সে চেতনার ক্ষেত্রে বাস করছে, জানি তার এই নিশ্চেষ্ট নিশ্চলতা চিরকালের সত্য নয়। এখনও যদিচ সে চোখ বুজে কাটায় তবু সে যে আলোকের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এ কথা সত্য, এবং এই সত্যটি ক্রমশই তার দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণতারূপে অধিকার করতে থাকবে।

তৎপূর্বে তার চেষ্টা এবং কষ্ট অল্প নয়। বারবার সে পড়ে পড়ে যাচ্ছে; বারবার সে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু, তার এই কষ্ট দেখে, এই অক্ষমতা দেখে আমরা কখনোই বলি নে যে, তবে ওর আর কাজ নেই— ও থাক্ মায়ের কোলেই দিন-রাত পড়ে থাক্। আমরা তাকে ধরে ধরে বারম্বার চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত করি। কেননা, আমরা নিশ্চয় জানি, এই মানবশিশু যেখানে জন্মেছে সেইখানে সঞ্চরণের শক্তিটা যদিও চোখে দেখতে পাচ্ছি নে তবু সেইটেই ওর পক্ষে সত্য, অক্ষমতাই যদিচ চোখে দেখতে পাচ্ছি তবু সেইটেই সত্য নয়। এই নিশ্চিত বিশ্বাসে ভর করে শিশুকে আমরা অভ্যাসে প্রবৃত্ত রাখি বলেই অবশেষে একদিন তার পক্ষে চলা বলা এমনি সহজ হয়ে যায় যে, তার জন্যে এক-মুহূর্ত চেষ্টা করতে হয় না।

মানুষের মধ্যে আত্মা মুক্তির ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে। পশুর চিত্ত বিশ্ব-প্রকৃতির গর্ভে আবৃত। সে প্রাকৃতিক সংস্কারের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে অনায়াসে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতির চেষ্টা তার মধ্যে চেষ্টারূপে কাজ করছে। ভ্রূণের মতো সে কেবল নিচ্ছে, কেবল বাড়ছে, আপনার প্রাণকে কেবল পোষণ করছে। এমনি করে বিশ্বের মধ্যে মিলিত হয়ে সে চলছে বলে ভ্রূণের মতো আপনাকে সে আপনি জানে না।

মানুষের আত্মা প্রকৃতির এই গর্ভ থেকে অধ্যাত্মলোকে জন্মেছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকৃতির ভিতর থেকে কেবল অন্ধভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চয় করতে থাকবে, এ আর হতেই পারে না। এখন সে কর্তা— এখন সে সৃষ্টি করবে, আপনাকে দান করবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিক্ষেত্রে জন্মেছে যদিচ এই কথাটাই সত্য, তবু একেবারেই এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমরা পাচ্ছি নে। প্রকৃতির গর্ভবাসের মধ্যে বদ্ধ

অবস্থার যে সংস্কার তা সে এই মুক্তলোকের মধ্যে এসেও একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আত্মশক্তির সাধনার দ্বারাই সচেষ্টভাবে সে যে আপনাকে এবং জগৎকে অধিকার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এ কথা এখনও তাকে দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না—এখনও সে যেন প্রবৃত্তির নাড়ির দ্বারা প্রকৃতি থেকে রস শোষণ করে কেবল জড়ভাবে আপনাকে পুষ্ট করতে থাকবে এমনি তার ভাব; আপনার মধ্যে তার আপনার যে একটি সত্য আশ্রয় আছে এখনও তার উপরে নির্ভর দৃঢ় হয় নি, এইজন্যে প্রকৃতিকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে; এইজন্যেই শিশুর মতোই সে সব জিনিসকে মুঠোয় নিতে এবং মুখে পুরতে চায়; জানে না জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিসকে নির্লিপ্তভাবে অথচ পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করবার দিন তার এসেছে। এখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারাই সে আপনাকে পাবে; আপনাকে ত্যাগ করার দ্বারা, দান করার দ্বারাই সে আপনাকে পূর্ণ-ভাবে সপ্রমাণ করবে—সত্যের মধ্যেই তার যথার্থ স্থিতি, সংসার ও বিষয়ের গর্ভের মধ্যে নয়—সেই সত্যের মধ্যে তার ক্ষয় নেই, তার ভয় নেই—আপনাকে নিঃসংকোচে শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়ে এই অমর সত্যকে প্রকাশ করবার পরম সুযোগ হচ্ছে মানবজন্ম, এ কথাটাকে এখনও সে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারছে না।

মানুষের মধ্যে এই দুর্বল দ্বিধা দেখেই একদল দীনচিত্ত লোক মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে—মানুষের আত্মাকে তারা দেখতে পায় না; তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণানিদ্রাতুর অহংটাকেই চরম বলে জানে, অন্যটাকে কল্পনা বলে স্থির করে।

কিন্তু, শিশু যদিচ মায়ের কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে এবং অচেতনপ্রায় ভাবে তার স্তনপান করছে, অর্থাৎ যদিচ তার ভাব দেখে মনে হয় সে একান্তভাবে পরাশ্রিত, তবু যেমন সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়—বস্তুত সে স্বাধীন কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেই জন্মলাভ করেছে—তেমনি মানুষের আত্মা সম্বন্ধেও আমরা আপাতত যত বিরুদ্ধ প্রমাণই পাই-নে কেন, তবু এই কথাই নিশ্চিত সত্য যে বিষয়রাজ্যের সে দীন প্রজা নয়, পরমাত্মার মধ্যেই তার সত্য প্রতিষ্ঠা। সে অন্য যে-কোনো জিনিসকেই মুখে প্রার্থনা করুক, অন্য যে-কোনো জিনিসের জন্যই শোক করুক, তার সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরেই পরমাত্মার মধ্যে একান্ত সহজ হবার প্রার্থনাই সত্য, এবং তাঁর মধ্যে প্রবুদ্ধ না হবার শোকই তার একমাত্র গভীরতম ও সত্যতম শোক।

শিশুকে সংসারে যে আমরা এত বেশি অক্ষম বলে দেখি তার কারণই হচ্ছে সে একান্ত অক্ষম নয়। তার মধ্যে যে সত্য ক্ষমতা ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করে আছে তারই সঙ্গে তুলনা করেই তার বর্তমান অক্ষমতাকে এমন বড়ো দেখতে হয়। এই অক্ষমতাই যদি নিত্য সত্য হত তা হলে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো চিন্তারই উদয় হত না।

সূর্যগ্রহণের ছায়া যেমন সূর্যের চেয়ে সত্য নয় তেমনি স্বার্থবদ্ধ মানবাত্মার দুর্বলতা মানবাত্মার চেয়ে বড়ো সত্য নয়। মানুষ অহংকে নিয়ে যতই নাড়া-চাড়া করুক, তাই নিয়ে জগতে যত ভয়ানক আন্দোলন আলোড়ন যত উত্থান-পতনই হোক-না কেন, তবু সেটাই চরম সত্য কদাচ নয়। মানুষের আত্মাই তার সত্য বস্তু বলেই তার অহংএর চাঞ্চল্য এত বেশি প্রবল করে আমাদের আঘাত করে। এই তার অন্তরতম সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠার সাধনাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরম সাধনা। এই সত্যের মধ্যে সত্য হতে গেলে বদ্ধভাবে জড়ভাবে হওয়া যায় না—বাধা কাটিয়ে তাকে লাভ না করলে লাভ করাই যায় না। সেইজন্য মানুষের আত্মা যে মুক্তিক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে সেই ক্ষেত্রের সত্য অধিকার সে নিশ্চেষ্টভাবে পেতেই পারে না। এইজন্যেই তার এত বাধা—এবং তার এই-সকল বাধার দ্বারাই প্রমাণ হয়, অসত্যপাশ হতে মুক্ত হওয়াই তার সত্য পরিণাম।

শিশু যখন চলতে গিয়ে পড়ছে তখন যেমন তাকে বারম্বার পতন সত্ত্বেও চলার অভ্যাস করতে দেওয়া হয়, কারণ সকলেই জানে পড়াটাই তার চরম নয়, সেইরকম প্রত্যহ সত্যলোকে ব্রহ্মলোকে চলার অভ্যাস মানুষকে করতেই হবে। কোনো আলস্য কোনো ক্লেশে নিরস্ত হলে চলবে না।

প্রত্যহ তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে চিন্তা করা, স্মরণ করা, এইটেই হচ্ছে পন্থা। সংসারে যতই বাঁধা থাকি-না কেন তবু সমস্ত খণ্ডতা, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে সেই অনন্ত সত্যকে স্বীকার করার দ্বারা মানুষ আপনার আত্মাকে সম্মান করে। বিষয়ের দাসত্ব যতই করি তবু সেইটেই পরম সত্য নয়, প্রতিদিন এই কথা মানুষকে কোনো-এক সময় স্বীকার করতেই হবে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই কথাই সত্য, এবং এই সত্যেই আমি সত্য; ধনজনমানের দ্বারা আমি সত্য নই। আমি সত্যলোকে জ্ঞানলোকে বাস করি, আমি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রতি দিনের ব্যবহারে আমি এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন এখনও করতে পারছি নে—তবু মানুষকে এক দিকে আকাশে মাথা তুলে এবং এক দিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলতে হবে যে, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই কথাই সত্য। এই সত্য, এই সত্য, এই সত্য— প্রতিদিন বলতে হবে; বিমুখ মনকেও বলতে হবে; ক্ষীণ কণ্ঠকেও উচ্চারণ করাতে হবে। নিয়ত বলতে বলতে আমরা যে সত্যলোকে বাস করছি এই বোধটি ক্রমশই আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে। তখন অর্ধচেতন অবস্থায় দিন কাটবে না, তখন বারবার ধুলোর উপর পড়ে পড়ে যাব না, তখন আলোর দিকে আকাশের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখব, তখন বাইরের সমস্ত বস্তুকেই আমার আত্মার চেয়ে বড়ো করে জানব না, এবং প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনাকেই প্রকৃত আত্মপরিচয় বলে মনে করব না।

ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে, জানতে পারছি নে বলে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করব না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে—বারবার তাঁকে বলতে হবে, 'এই তুমি, এই

তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতি মুহূর্তে; এই তুমি আমার অনন্ত কালে।' বলতে বলতে তাঁর নামে আমার সমস্ত শরীর বাজতে থাকবে, আমার মন বাজতে থাকবে, আমার বাহির বাজতে থাকবে, আমার সংসার বাজতে থাকবে। আমার চিত্ত বলবে 'সত্যং', আমার বিশ্বচরাচর বলবে 'সত্যং'। ক্রমে আমার প্রতি দিনের প্রত্যেক কর্ম বলতে থাকবে 'সত্যং'। বেহালা-যন্ত্র যতই পুরাতন হয় ততই তার মূল্য বেশি হয়— তার কারণ, অনেক দিন থেকে সুর বাজতে বাজতে বেহালার কাষ্ঠফলকের পরমাণুগুলি সুরের ছন্দে ছন্দে সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন সুরকে আর সে বাধা দেয় না। সেইরকম আমরা প্রতিদিন তাঁকে যতই ডাকতে থাকি ততই আমাদের শরীর মনের সমস্ত অণুপরমাণু তাঁর সত্য নামে এমন সত্য হয়ে উঠতে থাকে যে, বাজতে আর দেরি হয় না, কোথাও কিছুমাত্র আর বাধা দেয় না।

এই সত্যনাম মানুষের সমস্ত শরীরে মনে, মানুষের সমস্ত সংসারে, সমস্ত কর্মে, একতান আশ্চর্য স্বরসম্মিলনে বিচিত্র হয়ে বেজে উঠবে বলে বিশ্বমহা-সভার সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্রভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে। সমস্ত গ্রহনক্ষত্র, সমস্ত উদ্ভিদ্‌ পশুপক্ষী মানুষের লোকালয়ের দিকে কান পেতে রয়েছে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের চিত্ত দিয়ে তাঁর অমৃতরস আস্বাদন করে মানুষের কণ্ঠে তাঁকে সমস্ত আকাশে ঘোষণা করে দেব, এরই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতি যুগ যুগান্তর ধরে তার সভা রচনা করছে। বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু এই সুরের স্পন্দনে পুলকিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখনই তোমরা জেগে ওঠো, এখনই তোমরা তাঁকে ডাকো : এই বনের গাছপালার মধ্যে তার মাধুর্য শিউরে উঠতে থাকবে, এই তোমাদের সামনেকার পৃথিবীর মাটির মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হতে থাকবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকাগৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ। নিজের উদরপূরণ এবং স্বার্থসাধনের জন্য নয়। এই কথা প্রত্যহ মনে রেখে নিখিল জগতের সাধনাকে আমরা আপনার সাধনা করে নেব। আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখব জানব, সত্যে সঞ্চরণ করব এবং অসংকোচে ঘোষণা করব 'তুমিই সত্য'।

[২০ বৈশাখ ১৩১৮]

সত্যকে দেখা

এই জগতে কেবল আমরা যা চোখে দেখছি, কানে শুনছি, তাতেই আমাদের চরম তৃপ্তি হচ্ছে না। আমরা কাকে দেখতে চাচ্ছি একেবারে সমস্ত মন সমস্ত হৃদয় মেলে দিয়ে? আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়ে, আমাদের যা-কিছু আছে তার সমস্তকে দিয়ে, যেন আমরা কাকে দেখতে পাব। আমাদের সেই সমস্তটিকে এখনও মেলা হয় নি— আমাদের চক্ষু মন হৃদয় সমস্তকে একটি উন্মীলিত শতদলের মতো একেবারে এক করে খুলে দেওয়া হয় নি। সেইজন্যে হাজার হাজার বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে একটার পর আর-একটাকে দেখে চলেছি, কিন্তু যাকে নিয়ে এই সমস্ত বস্তুই বাস্তব সেই অখণ্ড সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, জগতে কেবল আমরা বস্তুকে দেখব না, সত্যকে দেখব, এই একটি নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে গভীর করে জাগছে। এই যেমন মাটি জল আলো আমরা চোখ মেলে সহজে দেখছি তেমনি এই সমস্ত দেখার মধ্যে এমনি সহজেই সত্যকে দেখব, এই ইচ্ছা আমাদের সকল ইচ্ছার মূলে নিত্যনিয়ত রয়েছে।

শাবক পাখির যখন চোখ ফোটে নি, যখন আলো যে কী সে জানেও না, তখন তার প্রাণের মূলে সেই আলো দেখবার বাসনা নিহিত হয়ে কাজ করছে, যতক্ষণ সে আলো দেখে নি ততক্ষণ সে জগৎকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটু একটু করে জানছে— সমস্তকে এক মুহূর্তে এক আলোতে একযোগে জানা সে কাকে বলে তা সে বোঝেও না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই বিশ্বের জ্যোতিতেই যে তার চোখের জ্যোতির সার্থকতা এই তত্ত্বটি তার অন্ধতার অন্ধকারে তার মুদ্রিত চোখের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

তেমনি আমার মধ্যে যে এক সত্য আছে. যাকে অবলম্বন করে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা পরস্পর গ্রথিত হয়ে একটি অর্থ লাভ করে, সেই আমার মধ্যেকার সত্য বিশ্বের সত্যকে আপনার চরম সত্য বলে সর্বত্র অতি সহজে উপলব্ধি করবে— এই আকাঙ্ক্ষাটি তার মধ্যে অহরহ গূঢ়ভাবে রয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষাটির গভীর ক্রিয়া-ফলে আমাদের আত্মার মুদ্রিত চোখ একদিন ফুটবে — সেদিন আমরা যে দিকে চাব কেবল খণ্ড বস্তুকে দেখব না, অখণ্ড সত্যকে দেখব।

যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা. এই হচ্ছে আমাদের সকল দেখার চরম সাধনা। সেই দেখাটি খুলবে, সেই চোখটি ফুটবে, এইজন্যেই তো রোজ আমরা দুবেলা তাঁর নাম করছি, তাঁকে প্রণাম করছি। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, তাঁর দিকে মুখ তুলতে তুলতে ভিতরের সেই শক্তি ক্রমে জাগ্রত হবে, বাধা কেটে যেতে থাকবে, আত্মার চোখ খুলে যাবে। যেমনি খুলে যাবে অমনি আর তর্ক নয়, যুক্তি নয়, কিছু নয়— অমনি সহজে দেখা অমনি

আমার মনের আনন্দের সঙ্গে সেই আকাশ-ভরা আনন্দের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকা; অমনি আমার সমস্ত শরীরে তাঁর স্পর্শ, সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি। অমনি তখনই অতি সহজে উপলব্ধি যে, তাঁরই আনন্দে আলোক আমার চোখের তারায় আলো হয়ে নাচছে, তাঁরই আনন্দে বাতাস আমার দেহের মধ্যে প্রাণ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। অমনি জানতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীর মাটি আমাকে ধরে আছে এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমাকে ধরে আছেন— এই সংসার আমার আশ্রয় এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমার আশ্রয়। তখন এ কথা বুঝতে কিছু বিলম্ব হবে না যে, আলোক আছে বলে দেখছি তা নয়, তিনিই আমার অন্তরে ও বাইরে সত্য হয়ে আছেন বলেই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে আমার দেখার যোগ হচ্ছে— তাঁর শক্তিতেই তাঁকে দেখছি— তাঁরই ধী দিয়ে তাঁকে ধ্যান করছি তাঁরই সুরে আমার কণ্ঠ তাঁরই নাম করছে, তাঁরই আনন্দে আমি তাঁর স্মরণে আনন্দ পাচ্ছি।

তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা জান বা না জান তোমাদের গভীর আত্মার পরম চাওয়ার ধন হচ্ছেন তিনি। আমাদের এই আমি সেই পরম আমির মুখোমুখি হয়ে না বসতে পারলে কখনোই তার প্রেম চরিতার্থ হবে না। আর-সমস্তকে সে ধরছে, ছাড়ছে, হারাচ্ছে; তাই সে এমন একটি আমিকে আপনার প্রত্যক্ষ বোধে চাচ্ছে যার মধ্যে সে চিরন্তনরূপে সম্পূর্ণরূপে আছে— অন্য জিনিসের মতো যাকে ধরতে হয় না, ছুঁতে হয় না, রাখতে হয় না। আমাদের এই ভিতরকার একলা আমি সেই-যে তার পরম সাথিকে সাক্ষাৎ করে জানতে চায়, তার কান্না কি শুনতে পাচ্ছ না? তাকে আর তুমি পদে পদে ব্যর্থ কোরো না— তার কান্না থামাও। তোমার আপনকে তুমি আপনি সার্থক করবার জন্যে এসো এসো, প্রতিদিন সাধনায় বোসো। সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথম কথা যেন মনে পড়ে, তিনি আছেন, আমি তাঁর মধ্যে আছি। যদি অর্ধরাত্রে জেগে ওঠ তবে একবার চোখ চেয়ে দেখে মনকে এই কথাটি বলিয়ে নিয়ো যে, 'তিনি তাঁর সমস্ত লোক লোকান্তরকে নিয়ে অন্ধকারকে পরিপূর্ণ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আছি।' মধ্যাহ্নে কাজ যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে তোমাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে, তখন মুহূর্তকালের জন্যে আপনাকে থামিয়ে এই কথাটি বোলো, 'তুমি আছ, আমি তোমার মধ্যে আছি।' এমনি করেই সকল সময়ে সকল দেখার মধ্যে সত্যকে দেখা সহজ হয়ে যাবে। প্রতিদিন উপাসনায় যখন তাঁর কাছে বসবে মনকে বিমুখ হতে দিয়ো না। তিনি আছেন, তাঁরই সামনে এসে বসেছি, এই সহজ কথাটি যেন এক মুহূর্তেই মন সহজ করে বলতে পারে— যেন এক নিমেষেই একেবারেই তোমার মাথা তাঁর পায়ের কাছে এসে ঠেকে। প্রথম কিছুদিন মন চঞ্চল হতে পারে, কিন্তু প্রতি-দিন বসতে বসতে ক্রমেই বসা সত্য হয়ে উঠবে— ক্রমেই তাঁর কাছে পৌঁছতে আর দেরি হবে না।

[১৭ বৈশাখ ১৩১৮]

শুচি

প্রসঙ্গক্রমে আজ দ্বিপ্রহরে আমার একটি পবিত্র বাল্যস্মৃতি মনের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। বালক-বয়সে যখন একটি খৃস্টান বিদ্যালয়ে আমি অধ্যয়ন করেছিলুম তখন একটি অধ্যাপককে দেখেছিলুম যাঁর সঙ্গে আমার সেই অল্প-কালের সংসর্গ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে।

শুনেছিলুম তিনি স্পেনদেশের একটি সম্ভ্রান্ত ধনীবংশীয় লোক, ভোগৈশ্বর্য সমস্ত পরিত্যাগ করে ধর্মসাধনায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ, কিন্তু তিনি তাঁর মণ্ডলীর আদেশক্রমে এই দূর প্রবাসে এক বিদ্যালয়ে নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনার কাজ করছেন।

আমাদের ক্লাসে অল্প সময়েরই জন্য তাঁকে দেখতুম। ইংরাজি উচ্চারণ তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল, সেজন্যে ক্লাসের ছেলেরা তাঁর পড়ানোতে শ্রদ্ধা-পূর্বক মন দিত না; বোধ করি সে তিনি বুঝতে পারতেন, কিন্তু তবু সেই পরম পণ্ডিত অবজ্ঞাপরায়ণ ছাত্রদের নিয়ে অবিচলিত শান্তির সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করে যেতেন।

কিন্তু, নিশ্চয়ই তাঁর সেই শান্তি কর্তব্যপরায়ণতার কঠোর শান্তি নয়। তাঁর সেই শান্ত মুখশ্রীর মধ্যে আমি গভীর একটি মাধুর্য দেখতে পেতুম। যদিচ আমি তখন নিতান্তই বালক ছিলুম, এবং এই অধ্যাপকের সঙ্গে নিকট-পরিচয়ের কোনো সুযোগই আমার ছিল না, তবু এই সৌম্যমূর্তি মৃদুভাষী তাপসের প্রতি আমার ভক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল।

আমাদের এই অধ্যাপকটি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁকে স্মরণ করলে আমার মন আকৃষ্ট হত। আমি তাঁর মধ্যে কী দেখতে পেতুম সেই কথাটি আজ আমি আলোচনা করে দেখছিলুম।

তাঁর যে সৌন্দর্য সে একটি নম্রতা এবং শুচিতার সৌন্দর্য। আমি যেন তাঁর মুখের মধ্যে, তাঁর ধীর গতির মধ্যে, তাঁর শুচিশুভ্র চিত্তকে দেখতে পেতুম।

এ দেশে আমরা শুচিতার একটি মূর্তি প্রায়ই দেখতে পাই, সে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যেন নিজের চতুর্দিককে কেবলই নিজের সংশ্রব থেকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলতে থাকে। তার শুচিতা কৃপণের ধনের মতো কঠিন সতর্কতার সঙ্গে অন্যকে পরিহার করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এইরকম কঠোর আত্মপরায়ণ শুচিতা বিশ্বকে কাছে টানে না, তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখে।

কিন্তু, যথার্থ শুচিতার ছবি আমি আমার সেই অধ্যাপকের মধ্যে দেখে-ছিলুম। সেই শুচিতার প্রকৃতি কী, তার আশ্রয় কী?

আমরা শুচিতার বাহ্য লক্ষণ এই একটি দেখেছি, আহারে বিহারে পরিমিত ভাব রক্ষা করা। ভোগের প্রাচুর্য শুচিতার আদর্শকে যেন আঘাত করে। কেন করে? যা আমার ভালো লাগে তাকে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা এবং ভোগ

করার মধ্যে অপবিত্রতা কেন থাকবে? বিলাসের মধ্যে স্বভাবত দূষণীয় কী আছে? যে-সকল জিনিস আমাদের দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শ-বোধকে পরিতৃপ্ত করে তারা তো সুন্দর, তাদের তো নিন্দা করবার কিছু নেই। তবে নিন্দাটা কোন্‌খানে?

বস্তুত নিন্দাটা আমারই মধ্যে। যখন আমি সর্বপ্রযত্নে আমাকেই ভরণ করতে থাকি তখনই সেটা অশুচিকর হয়ে ওঠে। এই আমার দিকটার মধ্যে একটা অসত্য আছে যেজন্য এই দিকটা অপবিত্র। অন্নকে যদি গায়ে মাখি তবে সেটা অপবিত্র, কিন্তু যদি খাই তাতে অশুচিতা নেই— কারণ গায়ে মাখাটা অন্নের সত্য ব্যবহার নয়।

আমার দিকটা যখন একান্ত হয় তখন সে অসত্য হয়, এইজন্যেই সে অপবিত্র হয়ে ওঠে— কেননা কেবলমাত্র আমার মধ্যে আমি সত্য নই। সেইজন্য যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে দিই তখন আত্মা অসতী হয়ে ওঠে, সে আপনার শুচিতা হারায়। আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো— তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়েই সত্য হয়। তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা। তার সেই স্বামী সম্বন্ধেই উপনিষদ বলেছেন : এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমো লোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। ইনিই তার পরম গতি, ইনিই তার পরমা সম্পদ, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আনন্দ।

কিন্তু, যখন আমি সমস্ত ভোগকে আমার দিকেই টানতে থাকি, যখন অহোরাত্রি সমস্ত জীবন আমি এমন করে চলতে থাকি যেন আমার স্বামী নেই —আমার স্বামীর সংসারকে কেবলই বঞ্চনা করে নিজের অংশকেই সকলের চেয়ে বড়ো করতে চাই— তখনই আমার জীবন আগাগোড়া কলঙ্কে লিপ্ত হতে থাকে, তখন আমি অসতী। তখন আমি সত্যের ধন হরণ করে অসত্যের পূরণ করবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা চিরকালের মতো সফল হতেই পারে না; যা-কিছু কেবল আমার দিকেই টানব তা নষ্ট হবেই, তার বৃহৎ সফলতা স্থায়ী সফলতা হতেই পারে না— তার জন্যে ভয় ভাবনা এবং শোকের অন্ত নেই। অসত্যের দ্বারা সত্যকে আঁকড়ে রাখা কোনোমতেই চলে না। ভোগের ফুলের মাঝখানে একটি কীট আছে, সে কীট আমি, এই অসত্য আমি— সে ফুলে ফল ধরে না। ভোগের তরণীর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে, সে ছিদ্র আমি, এই অসত্য আমি— এ তরণী অতৃপ্তিদুঃখের সমুদ্র কখনোই পার হতে পারে না, পথের মধ্যেই সে ডুবিয়ে দেয়।

সেইজন্যে শুচিতার সাধনা যাঁরা করেন ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না; কেননা এই স্বামিবিমুখ আমির উপকরণ যতই জোগাতে থাকি ততই সে উন্মত্ত হয়ে উঠতে থাকে, ততই তার অতৃপ্তিই তীক্ষ্ন অঙ্কুশাঘাত করে তাকে প্রলয়ের পথে দৌড় করাতে থাকে। এইজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই উচ্চসাধনার একটা প্রধান অঙ্গ ভোগকে খর্ব করা, সুখের ইচ্ছাকে পরিমিত করা। অর্থাৎ

এমন করে চলা যাতে নিজের দিকেই সমস্ত বোঝা বাড়তে বাড়তে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে সেই দিকটাতেই কাত হয়ে না পড়ি।

কিন্তু, আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ধনমান ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন বলেই যে আমার কাছে এমন মনোহর হয়ে উঠেছিলেন তা নয়। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত, যেখানে তিনি সত্য সেইখানেই তাঁর মনটি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রভুর সঙ্গে মিলনের দ্বারা সর্বদা তিনি সম্পূর্ণ হয়ে আছেন। একটি অলক্ষ্য উপাসনার দ্বারা ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাঁকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে— পরম পবিত্রস্বরূপ স্বামীকে তিনি তাঁর আত্মার মধ্যে বরণ করে নিয়েছেন, এইজন্য সুনির্মল শান্তিময় শুচিতায় তাঁর সমস্ত জীবন দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সত্য তাঁকে পবিত্র করে তুলেছে, বাইরের কোনো নিয়ম নয়।

আমরা যখন কেবল নিজেরটি নিয়েই থাকি তখন আমরা আমাদের বড়ো আত্মাটির প্রতি বিমুখ হই; তাতে কেবলই আমাদের সত্যহানি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে। তাই স্বার্থের জীবন ভোগের জীবন কেবলই মলিনতা দিয়ে আমাদের লিপ্ত করতে থাকে— এই গ্লানি থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন— তিনি আমাদের বাঁচান। আমার নিজের সেবা আমার পক্ষে বড়ো লজ্জা, আমার স্বামীর সেবাতেই আমার গৌরব। আমার নিজের সুখের দিকেই যখন আমি নেমে পড়ি তখন আমার বড়ো আমিকে একেবারেই অস্বীকার করি বলেই ভয়ানক ছোটো হয়ে যেতে থাকি; সেই ছোটো আপনাকে ভরতে গিয়েই আপনাকে যথার্থ ভাবে হারাতে থাকি। মানুষ যে ছোটো নয়, মানুষ যে সেই বড়োর যোগে বড়ো। সেই তার বড়োর আনন্দেই সে আনন্দিত হোক, সেই তার বড়োর সম্বন্ধে সে জগতের সকলকে আপনার করে নিক। সেই তার বড়ো আপনাকে হারিয়ে সে বাঁচবে কেমন করে! আর-কিছুতেই বাঁচতে পারবে না, ধন মান খ্যাতি কিছুতেই না। সত্য না হলে বাঁচব কী করে? আমি কি আপনাকে দিয়ে আপনাকে পূর্ণ করে তুলতে পারি! হে আমার পরম সত্য, আমি আমার অন্তরে বাহিরে কেবল নিজেকেই আশ্রয় করতে চাচ্ছি বলে কেবল অসত্যের মধ্যে অশুচি হয়ে ডুবছি— আমার মধ্যে হে মহান্, হে পবিত্র, তোমার প্রকাশ হোক, তা হলেই আমি চিরদিনের মতো রক্ষা পাব। হে প্রভু, পাহি মাং নিত্যং, পাহি মাং নিত্যম্।

[২২ চৈত্র, বুধবার ১৩১৭]

বিশেষত্ব ও বিশ্ব

আমার একটি পরমস্নেহাস্পদ ছাত্র আমাকে বলছিলেন, 'কাল সন্ধ্যাবেলা যখন আমরা ঝড়বৃষ্টিতে মাঠে বেড়াচ্ছিলুম তখন আমার মনে কেবল এই একটা চিন্তা উঠছিল যে, প্রকৃতির মধ্যে এই-যে এত বড়ো একটা আন্দোলন চলছে আমাকে

এ যেন দৃক্‌পাতও করছে না— আমি যে একটা ব্যক্তি ও তার কোনো-একটা খবরও রাখছে না।'

আমি তাঁকে বললুম— সেইজন্যেই তো বিশ্বপ্রকৃতির উপরে পৃথিবীসুদ্ধ লোক এমন দৃঢ় করে নির্ভর করতে পারে; যে বিচারক কোনো বিশেষ লোকের উপর বিশেষ করে তাকায় না তারই বিচারের উপর সর্বসাধারণে আস্থা রাখে।

এ উত্তরে আমার ছাত্রটি সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মনের ভাব এই যে, বিচারকের সঙ্গে তো আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ নয়; কাজের সম্বন্ধ। আমার মধ্যে যখন একটি বিশেষত্ব আছে, আমি যখন ব্যক্তিবিশেষ, তখন স্বভাবতই সেই বিশেষত্ব একটি বিশেষ সম্বন্ধকে প্রার্থনা করে। যখন সেই বিশেষ সম্বন্ধকে পায় না তখন সে দুঃখ বোধ করে; প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সেই দুঃখ আছে। সে আমাকে বিশেষ ব্যক্তি বলে বিশেষভাবে মানে না। তার কাছে আমরা সকলেই সমান।

আমি তাঁকে এই কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম যে, মানুষের বিশেষত্ব তো একটি ঐকান্তিক পদার্থ নয়। মানুষের সত্তার সে একটা প্রান্তমাত্র। মানুষের এক প্রান্তে তার বিশ্ব, অন্য প্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই নিয়ে তবে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ। যদি আপনার সৃষ্টিছাড়া নিজত্বের মধ্যে মানুষের যথার্থ আনন্দ থাকত তা হলে নিজেরই একটি স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে সে বাস করতে পারত; সেখানে তার নিজের সুবিধা অনুসারে সূর্য উঠত কিম্বা উঠত না। সেখানে তার যখন যেমন ইচ্ছা হত তখন তেমনি ঘটত; কোনো বাধা হত না, সুতরাং কোনো দুঃখ থাকত না। সেখানে তার কাউকে জানবার দরকার হত না, কেননা সেখানে তার ইচ্ছামতই সমস্ত ঘটছে। এই মুহূর্তেই তার প্রয়োজন অনুসারে যেটা পাখি পরমুহূর্তেই সেটা তার প্রয়োজনমত তার মাথার পাগড়ি হতে পারে। কারণ, পাখি যদি চিরদিনই পাখি হয়, যদি তার পক্ষিত্বের কোনো নড়চড় হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কোনো-না-কোনো অবস্থায় আমাদের বিশেষ ইচ্ছাকে সে বাধা দেবেই— সব সময়েই আমার বিশেষ ইচ্ছার পক্ষে পাখির দরকার হতেই পারে না। আমার মনে আছে, একদিন বর্ষার সময় আমার মাস্তুল-তোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নীচে দিয়ে যাচ্ছিলুম— মাস্তুল সেতুর গায়ে ঠেকে গেল। এ দিকে বর্ষানদীর প্রবল স্রোতে নৌকাকে বেগে ঠেলছে, মাস্তুল মড়্‌মড়্ করে ভাঙবার উপক্রম করছে। লোহার সেতু যদি সেইসময় লোহার অটল ধর্ম ত্যাগ করে, যদি এক ফুট মাত্র উপরে ওঠে, কিম্বা মাস্তুল যদি কেবল এক সেকেণ্ড মাত্র তার কাঠের ধর্মের ব্যত্যয় করে একটুমাত্র মাথা নিচু করে, কিম্বা নদী যদি বলে ক্ষণকালের জন্যে আমার নদীত্বকে একটু খাটো করে দিই— এই বেচারার নৌকোখানা নিরাপদে বেরিয়ে চলে যাক', তা হলেই আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। কিন্তু, তা হবার জো নেই— লোহা সে লোহাই, কাঠ সে কাঠই, জলও সে জল। এইজন্যে লোহা-কাঠ জলকে আমার জানা চাই— এবং তারা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে

আপনার ধর্মের কোনো ব্যতিক্রম করে না বলেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে জানতে পারে। নিজের যথেচ্ছাঘটিত জগতের মধ্যে সমস্ত বাধা ও চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বাস করি নে বলেই বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা ধর্মকর্ম যা-কিছু মানুষের সাধনের ধন সমস্ত সম্ভবপর হয়েছে।

একটা কথা ভেবে দেখো, আমাদের বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল যে ইচ্ছা সে ইচ্ছা কাকে চাচ্ছে। যদি আমাদের নিজের মনের মধ্যেই তার তৃপ্তি থাকত তা হলে মনের মধ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে বানিয়ে তাকে স্থির করে রাখতে পারতুম। কিন্তু, ইচ্ছা তা চায় না। সে আপনার বাইরের সমস্ত-কিছুকে চায়। তা হলে আপনার বাইরে একটা সত্য পদার্থ কিছু থাকা চাই। যদি কিছু থাকে তবে তার একটা সত্য নিয়ম থাকা দরকার, নইলে তাকে থাকাই বলে না। যদি সেই নিয়ম থাকে তবে নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাকে সে সব সময়ে খাতির করে চলতেই পারে না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, যে বিশ্বকে নিয়ে আমার বিশেষত্ব আনন্দিত সেই বিশ্বের কাছে তাকে বাধা পেতেই হবে, আঘাত পেতেই হবে। নইলে সে বিশ্ব সত্য বিশ্ব হত না; সত্য বিশ্ব না হলে তাকে আনন্দও দিত না। ইচ্ছা যদি আপনার নিয়মেই আপনি বাঁচত, সত্যের সঙ্গে সর্বদা যদি তার যোগ ঘটবার দরকার না হত, তা হলে ইচ্ছা বলে পদার্থের কোনো অর্থই থাকত না— তা হলে ইচ্ছাই হত না। সত্যকে চায় বলেই আমাদের ইচ্ছা। এমন-কি, আমাদের ইচ্ছা যখন অসম্ভবকে চায় তখনও তাকে সত্যরূপে পেতে চায়, অসম্ভব কল্পনার মধ্যে পেয়ে তার সুখ নেই।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের বিশেষত্বের পক্ষে এমন একটি বিশ্ব-নিয়মের প্রয়োজন যে নিয়ম সত্য, অর্থাৎ যে নিয়ম আমার বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে না।

বস্তুত, আমি আমাকেই সার্থক করবার জন্যেই বিশ্বকে চাই। এই বিশ্ব যদি আমারই ইচ্ছাধীন একটা মায়া-পদার্থ হয় তা হলে আমাকেই ব্যর্থ করে। আমারই জ্ঞান সার্থক, বিশ্বজ্ঞানে আমারই শক্তি সার্থক বিশ্বশক্তিতে, আমারই প্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে। তাই যখন দেখছি তখন এ কথা কেমন করে বলব 'বিশ্ব যদি বিশ্বরূপে সত্য না হত— সে যদি আমারই বিশেষ ইচ্ছানুগত হয়ে স্বপ্নের মতো হত তা হলে ভালো হত'? তা হলে সে যে আমারই পক্ষে অনর্থকর হত।

এইজন্যে আমরা দেখতে পাই, আমির মধ্যে যার আনন্দ প্রচুর সেই তার আমিকে বিশেষত্বের দিক থেকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। আপনার শক্তিতে যার আনন্দ সে কাজকে সংকীর্ণ করতে পারে না, সে বিশ্বের মধ্যে কাজ করতে চায়। তা করতে গেলেই বিশ্বের নিয়মকে তার মানতে হয়; বস্তুত এমন অবস্থায়, বিশ্বের নিয়মকে মানার যে দুঃখ সেই দুঃখ সম্পূর্ণ স্বীকার করাতেই তার আনন্দ। সে কখনোই দুর্বলভাবে কান্নার সুরে বলতে পারে না, 'বিশ্ব

কেন আপনার নিয়মে আপনি এমন স্থির হয়ে আছে? সে কেন আমার অনুগত হচ্ছে না?' বিশ্ব আপনার নিয়মে আপনি স্থির হয়ে আছে বলেই মানুষ বিশ্বক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে। কবি যখন নিজের ভাবের আনন্দে ভোর হয়ে ওঠেন তখন তিনি সেই আনন্দকে বিশ্বের আনন্দ করতে চান। তা করতে গেলেই আর নিজের খেয়ালমতো চলতে পারেন না। তখন তাঁকে এমন ভাষা আশ্রয় করতে হয় যা সকলের ভাষা, যা তাঁর খেয়ালমতো একেবারে উল্টোপাল্টা হয়ে চলে না। তাঁকে এমন ছন্দ মানতেই হয় যে ছন্দে সকলের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হয়। তিনি বলতে পারেন না 'আমার খুশি আমি ছন্দকে যেমন-তেমন করে চালাব'। ভাগ্যে এমন ভাষা আছে যা সকলের ভাষা, ভাগ্যে ছন্দের এমন নিয়ম আছে যাতে সকলের কানে মিষ্ট লাগে, সেইজন্যেই কবির বিশেষ আনন্দ আপনাকে বিশ্বের আনন্দ করে তুলতে পারে। এই বিশ্বের ভাষা বিশ্বের নিয়মকে মানতে গেলে দুঃখ আছে. কেননা সে তোমাকে খাতির করে চলে না— কিন্তু, এই দুঃখকে কবি আনন্দে স্বীকার করে। সৌন্দর্যের যে নিয়ম বিশ্ব-নিয়ম তাকে সে নিজের রচনার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে চায় না— একটুও শৈথিল্য তার পক্ষে অসহ্য। কবি যতই বড়ো হবে, অর্থাৎ তার বিশেষত্ব যতই মহৎ হবে, ততই বিশ্বনিয়মের সমস্ত শাসন সে স্বীকার করবে— কারণ, এই বিশ্বকে স্বীকার করার দ্বারাই তার বিশেষত্ব সার্থক হয়ে ওঠে।

মানুষের মহত্ত্বই হচ্ছে এইখানে; সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে—এবং তাতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ। মানুষের আমির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে মেলবার পথ বড়ো রকম করে আছে বলেই মানুষের দুঃখ এবং তাতেই মানুষের আনন্দ। বিশ্বের সঙ্গে পশুর যোগ নিজের খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধে—এই প্রয়োজনের তাড়নাতেই পশুকে আপনার বাইরে যেতে হয়, এই দুঃখের ভিতর দিয়েই সে সুখ লাভ করে। মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মস্ত প্রভেদ হচ্ছে এই. মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানা রকম করে নেয় তেমনি মানুষ আপনাকে বিশ্বের কাছে নানা রকমে দেয়। তার সৌন্দর্যবোধ, তার কল্যাণচেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায়—তা না করতে পেলেই সে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার নেবার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব। এ কথা যখন সত্য তখন তুমি যদি বল 'বিশ্বপ্রকৃতি আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে মেনে চলে না বলে আমার দুঃখবোধ হচ্ছে' তখন তোমাকে বুঝে দেখতে হবে, মেনে চলে না বলেই তোমার আনন্দ। বিশেষকে মানে না বলেই সে বিশ্ব, এবং সে বিশ্ব বলেই বিশেষের তাতে প্রতিষ্ঠা। দুঃখের একান্ত অভাব যদি ঘটত, অর্থাৎ যদি কোথাও কোনো নিয়ম না থাকত, বাধা না থাকত, কেবল আমার ইচ্ছাই থাকত, তা হলে আমার ইচ্ছাও থাকত না; সে অবস্থায় কিছু থাকা না-থাকা একেবারে সমান। অতএব তুমি যখন মাঠে বেড়াচ্ছিলে তখন ঝড়বৃষ্টি যে তোমাকে কিছুমাত্র মানে নি এ কথাকে যদি বড়ো করে দেখি তা হলে এর মধ্যে কোনো ক্ষোভের কারণ দেখি নে।

তা হলে এইটেই দেখতে পাই : ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য, ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁরই অটল নিয়মে অগ্নি ও সূর্য তাপ দিচ্ছে এবং মেঘ বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হচ্ছে। তারা সহস্রের ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত নয়, একের শাসনে চালিত। এইজন্যেই তারা সত্য, তারা সুন্দর; এইজন্যেই তাদের মধ্যেই আমার মঙ্গল; এইজন্যেই তাদের সঙ্গে আমার যোগ সম্ভব; এইজন্যেই তাদের কাছ থেকে আমি পাই এবং তাদের মধ্যে আমি আপনাকে দিতে পারি।

১৩১৯

॥ ১৫ ॥

পিতার বোধ

যা প্রাণের জিনিস তাকে প্রথার জিনিস করে তোলার যে কত বড়ো লোকসান সে কথা তো প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্তু, আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে তো ফাঁকি দিয়ে সারি নে; অন্নজলকে তো-সত্যকারই অন্নজলের মতো ব্যবহার করে থাকি; কেবল আমার ভিতরকার এই-যে মানুষটি, ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতি-প্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়ারৌদ্রপাতে যার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না— সেই আমার অন্তরতম চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে, কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি— তাকে আমার মন না দিয়ে, কেবল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি! সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড়ো, এইজন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য-সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই!

আমাদের এই বাইরের মানুষের এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাত হচ্ছে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই-না কেন, সে সেটা পায়— আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেইজন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে : শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেননা, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে; একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে, আর-একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্য শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুধু টাকাই দিই, তা হলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন-কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনোই সম্পূর্ণ দান নয়— সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে, কিন্তু সে দান ধর্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা তো নয়।

বস্তুত, প্রতি মুহূর্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করছি— সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করছি— সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি দান যখনই বন্ধ হয়ে যাবে তখনই প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এই-রকম মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারছি ততই দান করছি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণে দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশ-যজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান তো আমাদের চলছেই, কিন্তু কী দান করছি এবং সেটা পৌঁচচ্ছে কোন্‌খানে সে তো আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাইরের জিনিস কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা-কিছু পাচ্ছি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করছি? সে তো সমস্তই দেখছি বাইরেই এসে জমছে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে তো এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু, নিজেকে এই-যে আমরা দান করছি— এই-যে আমার চেষ্টা, এই-যে আমার সমস্তই, এ কি পূর্ণদান হচ্ছে? শ্রদ্ধার দান হচ্ছে? ধর্মের দান হচ্ছে? এতে করে আমরা বাড়াচ্ছি, কিন্তু বড়ো হতে পারছি কি? এতে করে আমরা সুখ পাচ্ছি, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি নে; এতে করে তো আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারছে না। মানুষ বললে যতখানি বোঝায় ততখানি তো ব্যক্ত হয়ে উঠছে না।

কেন এমন হচ্ছে? কেননা, এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আনছি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার করছি যে, আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা— সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাই দিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলছি।

নিজেকে যে লোক কেবলই ধন মান জোগাচ্ছে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করছে, সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলই অপমান করছে; তাকে সে কিছুই দিচ্ছে না, কিছু দেবার যোগ্যই মনে করছে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্ছে, কিন্তু শ্রদ্ধা দিচ্ছে না— এবং 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌' এই উপদেশবাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করছে নিজের বেলাতেই।

কিন্তু, সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে তো আমরা বিনাশ করতে পারি নে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটিকে আমরা যে চিরদিনই কেবল অভুক্ত রেখে দিচ্ছি তার দুর্গতি তো কোনো আরামে কোনো আড়ম্বরে চাপা পড়ে না। আমরা যার সেবা করি সে তো আমাদের বাঁচায় না; আমরা যার ভোগের সামগ্রী জুগিয়ে চলি সে তো আমাদের এমন একটি কড়িও ফিরিয়ে দেয় না যাকে আমাদের চিরানন্দপথের সম্বল বলে বুকের কাছে যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিতে পারি। আরামের পর্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন তো বিনা আহ্বানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়; তখন তো বুকের রক্ত দিয়েও তার দাবি নিঃশেষে চুকিয়ে মিটিয়ে দিতে পারি নে।

আর, অকস্মাৎ বজ্রের মতো মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক তো কিছুতে ভরিয়ে তুলতে পারি নে। যখন এক দিকে ভার চাপতে চাপতে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির ঠেকাঠেকি হতে থাকে, অবশেষে ভিতরে ভিতরে পাপের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে একদিন যখন বিনাশের দাবানল দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন লোকজন সৈন্যসামন্ত কাকে ডাকব যে তার উপরে এক-ঘড়াও জল ঢেলে দিতে পারে? মূঢ়, কাকে প্রবল করে তুমি বলী হলে? কাকে ধনদান করে তুমি ধনী হতে পারলে? কাকে প্রতিদিন রক্ষা করে করে তুমি চিরদিনের মতো বেঁচে গেলে?

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্ আশ্রয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছে? আমরা এত দিন ধরে তাকে কোন্ ভরসা দিয়ে এলুম? বাহিরের বৈঠকখানায় আমরা ঝাড়লণ্ঠন খাটিয়ে দিলুম, কিন্তু অন্তরের ঘরের কোণটিতে আমরা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালালুম না। রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল; সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে ধুলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কী বলে তাকে আশ্বাস দিলুম!

তার সেই মর্মভেদী রোদনে আমাদের নিশীথরাত্রির প্রমোদসভায় যখন ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বড়োই ব্যাঘাত করতে লাগল, আমাদের মত্ততার মাঝখানে তার সেই গভীর ক্রন্দন আমাদের নেশাকে যখন ক্ষণে ক্ষণে ছুটিয়ে দেবার উপক্রম করলে, তখন আমরা তাকে কোনোমতে থামিয়ে রাখবার জন্যে তার দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে তাকে বলে এসেছি, 'ভয় নেই তোমার, আমি আছি।' মনে করেছি, এই বুঝি তার সকলের চেয়ে বড়ো অভয়মন্ত্র যে 'আমি আছি'। নিজের সমস্ত ধনসম্পদ মানমর্যাদাকে একটা মমতার সূত্রে জপমালার মতো গেঁথে ফেলে তার হাতে দিয়ে বলেছি, 'এইটেকেই তুমি দিনরাত্রি বারবার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবলই একমনে জপ করতে থাকো, আমি, আমি, আমি। আমি সত্য, আমি বড়ো, আমি প্রিয়।'

তাই নিয়ে সে জপছে বটে 'আমি আমি আমি', কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়া আর কিছুতেই থামছে না। তার ভিতরকার এ কোন্ একটা মহাবিষাদ অশ্রুবিন্দুর গুটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জপে যাচ্ছে, 'না, না, না। নয়, নয়, নয়।' কোন্ তাপসিনীর করুণ বীণায় এমন উদাস-করা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তুলছে, 'ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হল রে— সকালবেলাকার আলোক ব্যর্থ হল, রাত্রিবেলাকার স্তব্ধতা ব্যর্থ হল— মায়াকে খুঁজলুম, ছায়াকে পেলুম, কোথাও কিছুই ধরা দিল না।'

ওরে মত্ত, কোন্ মাভৈঃ বাণীটির জন্যে আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে? সে হচ্ছে চিরদিনের সেই সত্য বাণী : পিতা নোহসি। পিতা, তুমিই আছ।

তুমি আছ পিতা, তুমি আছ— আমাদের পিতা তুমি আছ— এই বাণীতেই

সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, কোনো ভয় আর কোথাও রইল না।

আর, ওটা কী ভয়ানক মিথ্যা—ঐ যে 'আমি আছি'! কই আছ, তুমি আছ কোথায়? তুমি ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনাগুলোকে আশ্রয় করে বলছ 'আমি আছি'? যে বুদ্‌বুদ্‌টি যখনই ফেটে যাচ্ছে তাতে তখনই তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সংসারে দীর্ঘনিশ্বাসের যে লেশমাত্র তপ্ত হাওয়াটুকু তোমার গায়ে এসে লাগছে তাতে একেবারে তোমার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্ছে। তুমি আছ কিসের উপরে? তুমি কে? অথচ আমার অন্তরের মানুষ যখন বলছে 'চাই' তখন তুমি অহংকার করে তাকে গিয়ে বলছ, 'আমি আছি। তুমি আমাকেই চাও, তুমি আমাকে নিয়েই খুশি থাকো।' এ তোমার কেমন দান! তোমার প্রকাণ্ড বোঝা বইবে কে! এ যে বিষম ভার! এ যে কেবলই বস্তুর পরে বস্তু, কেবলই ক্ষুধার পরে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ। এ তো তোমাকে আশ্রয় করা নয়, এ যে তোমাকে বহন করা। তুমি যে পঙ্গু, তোমার যে পা নেই, তুমি যে কেবলই অন্যের উপরেই ভর দিয়ে সংসারে চলে বেড়াও। তোমার এ বোঝা যেখানকার সেইখানেই পড়ে পড়ে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে যেতে থাক্। যে মানুষটি যাত্রী, যে পথের পথিক, অনন্তের অভিমুখে যার ডাক আছে, সে তোমার এই ভার টেনে টেনে বেড়াবে কেন! এই-সমস্ত বোঝার উপর দিনরাত্রি বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাকবে, সে সময় তার কোথায়! এইজন্যে সে তাঁকেই চায় যাঁর উপরে সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না। তুমি কি সেই নির্ভর নাকি! তবে কী ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপছ 'আমি আছি'!

পিতা নোঽসি— পিতা, তুমি আছ, তুমি আছ— এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত-কিছু পূর্ণ। 'সত্যং' এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন, সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে : পিতা নোঽসি। পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।

কিন্তু, তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে। তুমি আছ এ তো শুধু একটা মন্ত্র নয়। তুমি আছ এটা তো শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। তুমি আছ এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে না যেতে পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম, কেনই বা কিছু দিনের জন্য নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম, শেষকালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল!

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে ফেলেছি। জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমিকেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি; প্রতি দিনের সমস্ত খাজনা তারই হাতে শেষ কড়াটি পর্যন্ত জমা করে দিয়েছি। আমি-বোধটা একেবারে

অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে; সে যদি বড়ো দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারি নে।

সেইজন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে : পিতা নো বোধি। তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ, এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও। পিতা নো বোধি। পিতার বোধ দিয়ে আমার সমস্তকে সমস্তটা ভরে তোলো, কিছুই আর বাকি না থাক্। আমার প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস পিতার বোধ নিয়ে আমার সর্বশরীরে প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক, আমার সর্বাঙ্গের স্পর্শচেতনা পিতার বোধে পুলকিত হয়ে উঠুক। পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিষিক্ত করে দিক! পিতা নো বোধি। আমার জীবনের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক, আমার জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক! আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত বিরোধ, পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই। এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাক্—নিকট হতে দূরে, দূর হতে দূরান্তরে, আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে—প্রসারিত হতে থাক্—প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায়।

প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি : পিতা নো বোধি। কিন্তু, একবারও মনেও আনি নি কত বড়ো চাওয়া চাচ্ছি; মনেও আনি নি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড়ো সাধনা করতে হবে। কত ত্যাগ, কত ক্ষমা, কত পাপের স্খালন, কত সংস্কারের আবরণ-মোচন, কত হৃদয়ের গ্রন্থি-ছেদন—জীবনকে সত্য করতে না পারলে সেই অনন্ত সত্যের বোধকে পাব কেমন করে! নিজের নিষ্ঠুর স্বার্থকে ত্যাগ করতে না পারলে সেই অনন্ত করুণার বোধকে গ্রহণ করব কেমন করে! সত্যে মঙ্গলে দয়ায় সৌন্দর্যে আনন্দে নির্মলতায় ভরে রয়েছে, সমস্ত ঘন হয়ে ভরে রয়েছে—সেই তো আমার পিতা, সর্বত্র আমার পিতা। পিতা নোঽসি! পিতা নোঽসি! এই মন্ত্রের অক্ষরই সমস্ত আকাশে, এই মন্ত্রের ধ্বনিই জ্যোতির্ময় সুরসপ্তকের বিশ্বসংগীত! 'পিতা তুমি আছ' এই মন্ত্রই কত অসংখ্য রূপ ধরে লোক-লোকান্তরে সমস্ত জীবকে কোলে করে নিয়ে সুখদুঃখের অবিরাম বৈচিত্র্যে সৃষ্টিকে প্রাণপরিপূর্ণ করে রয়েছে! অসীম চেতনজগতের মধ্যে নিয়ত-উদ্‌বেলিত তোমার যে পিতার আনন্দ, যে আনন্দে তুমি আপনাকেই আপন সন্তানের মধ্যে নিরীক্ষণ করে লীলা করছ, যে আনন্দে তুমি তোমার সন্তানের মধ্যে ছোটো হয়ে নত হয়ে আসছ এবং তোমার সন্তানকে তোমার মধ্যে বড়ো করে তুলে নিচ্ছ—সেই তোমার অপরিসীম পিতার আনন্দকেই সকলের চেয়ে সত্য ক'রে, আপনার সকলের চেয়ে পরম সম্পদ করে বোধ করতে চাচ্ছে আমার অন্তরাত্মা—তবু সেই জায়গায় আমি কেবলই তার কাছে এনে দিচ্ছি আমার অহংকে। সেই অহংকে কিছুতেই আমি তাড়াতে পারছি নে, তার কাছে আমার

নিজের জোর আর কিছুতেই খাটে না। অনেক দিন হল তার হাতেই আমার সমস্ত কেল্লা আমি ছেড়ে দিয়ে বসে আছি; আমার সমস্ত অস্ত্র সেই নিয়েছে, আমার সমস্ত ধনের সেই অধিকারী। সেইজন্যেই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা : পিতা নো বোধি। পিতা, এই বোধ তুমিই আমার মনে জাগাও। এই বোধটিকে একেবারে বাধাহীন করে লাভ করি যে, আমার অস্তিত্ব এ কেবল-মাত্রই সন্তানের অস্তিত্ব; আমি তো আর-কারও নই, আর-কিছুই নই, তোমার সন্তান এই আমার একটিমাত্র সত্য; এই সন্তানের অস্তিত্বকে ঘিরে ঘিরে অন্তরে বাহিরে যা-কিছু আছে এ-সমস্তই পিতার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়— এই জল-স্থল-আকাশ, এই জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্য, এই সুখদুঃখের সংসার-লীলা, এ-সমস্তই সন্তানের জীবনকে আলিঙ্গন করে ধরছে। এইবার কেবল আমার দিকের দরকার আমার সমস্ত প্রাণটা 'পিতা' বলে সাড়া দিয়ে উঠুক। উপরের ডাকের সঙ্গে নীচের ডাকটি মিলে যাক, আমার দিক থেকে কেবল এইটেই বাকি আছে। তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠল— তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না— পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একে-বারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্ছে— কিন্তু, তোমার এই এত বড়ো আকাশ-ভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্ছি নে, গ্রহণ করতেই পারছি নে— কিসের জন্যে? ঐ এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলছে 'আমি'! একবার একটুখানি থাম্! একবার আমার জীবনের সব চেয়ে সত্য বলাটা বলতে দে— একবার সন্তানজন্মের চরম ডাকটা ডাকতে দে : পিতা নোঽসি! পিতা, পিতা, পিতা— তুমি, তুমি, তুমি— কেবল এই কথাটা— অন্ধকারে আলোতে নির্ভয়ে গলা খুলে কেবল— আছ, আছ, আছ! 'আমি' তার সমস্ত বোঝাসুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত করে জানছ। তেমনি করে সন্তানকেও জানতে দাও তার পিতাকে। তোমার জানা এবং তার জানার মাঝখানকার বাধাটা একেবারে ঘুচে যাক। তুমি যেমন করে আপনাকে দান করেছ তেমনি করে আমাকে গ্রহণ করো।

নমস্তেঽস্তু! তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সর্বত্র যখন পিতাকে পাই তখন সর্বত্র হৃদয় আনন্দে অবনত হয়ে পড়ে। তখন শুনতে পাই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম মর্মকুহর হতে একটিমাত্র ধ্বনি অনন্তের মধ্যে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে : নমো নমঃ। লোকে লোকান্তরে 'নমো নমঃ'। সুমধুর সুগম্ভীর 'নমো নমঃ'। তখন দেখতে পাই নমস্কারে নমস্কারে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র একটিমাত্র জায়গায় তাদের জ্যোতির্ময় ললাটকে মিলিত করেছে। সমস্ত বিশ্বের এই আশ্চর্য সুন্দর সামঞ্জস্য— যে সামঞ্জস্য কোথাও কিছুমাত্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা সৃষ্টির বিচিত্র ছন্দকে একটুও আঘাত করছে না, আপনার অণুতে পরমাণুতে অনন্তের আনন্দকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছে— এই

তো সেই নমস্কারের সংগীত ঊর্ধ্বে-অধোতে দিকে-দিগন্তরে 'নমো নমঃ'। এই সমস্ত বিশ্বের নমস্কারের সঙ্গে আমার চিত্ত যখন তার নমস্কারটিকেও এক করে দেয়, সে যখন আর পৃথক থাকতে পারে না, তখন সে চিরকালের মতো ধন্য হয়— তখনই সে বুঝতে পারে, আমি বেঁচে গেলুম, আমি রক্ষা পেলুম— তখনই জগতের সমস্তের মধ্যেই সে আপনার পিতাকে পেলে, কোনো জায়গায় তার আর কোনো ভয় রইল না।

পিতা, নমস্তেঽস্তু। তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই পারাই চরম পারা, এই পারাতেই জীবনের সকল পারা শেষ হয়ে যায়। যেন নমস্কার করতে পারি! সমস্ত যাত্রার অবসানে নদী যেমন আপনাকে দিয়ে সমুদ্রকে এসে নমস্কার করে, সেই নমস্কারটিতেই তার সমস্ত পথযাত্রা একেবারে নিঃশেষে সার্থক, হে পিতা, তেমনি করে একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে তোমার মধ্যে আপনাকে যেন শেষ করে দিতে পারি। এই-যে আমার বাহিরের মানুষটা, এই আমার সংসারের মানুষটা, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানকার অতিক্ষুদ্র এই মানুষটা, এ কেবল মাথাটাকে সকলের চেয়ে উঁচুতে তুলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। সকলের চেয়ে আমি তফাত থাকব, সকলের চেয়ে আমি বড়ো হব, এতেই তার সকলের চেয়ে সুখ। তার একমাত্র কারণ এই, আপনার মধ্যে তার আপনার স্থিতি নেই। বাইরের বিষয়ের উপরেই তার স্থিতি— যত জিনিস বাড়ে ততই সে বাড়ে। নিজের মধ্যে সে শূন্য, সেখানে তার কোনো সম্পদ নেই, এইজন্য বাইরে ধন যত জমে ততই সে ধনী হয়। জিনিসপত্র নিয়েই যাকে বড়ো হতে হয় সে তো সকলের সঙ্গে মিলতে পারে না। জিনিসপত্র তো জ্ঞান নয়, প্রেম নয়— সকলকে দান করার দ্বারাই তো সে আরও বাড়ে না; ভাগ করার দ্বারাই তো সে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠে না; তার থেকে যা যায় তা যায়, সে তো আরও দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে না; তার যা আমার তা আমার, যা অন্যের তা অন্যেরই। এইজন্যে যে মানুষটা উপকরণ নিয়েই বড়ো হয় সকলের থেকে তফাত হয়েই সে বড়ো হয়; আপনার সম্পদকে সকলের সঙ্গে মেলাতে গেলেই তার ক্ষতি হতে থাকে। এইজন্যে যতই সে বড়ো হয় ততই তার আমিটাই উঁচু হয়ে উঠতে থাকে, ততই চারি দিকের সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, এবং তার সমস্ত সুখই অহংকারের রূপ ধারণ করে অন্য সকলকে অবনত করতে চায়। এমনি করে বিশ্বের সঙ্গে বিরোধের দ্বারাই সে যে দুঃসহ তাপের সৃষ্টি করে সেইটেকেই সে আপনার প্রতাপ বলে গণ্য করে।

কিন্তু, আমার অন্তরের নিত্য মানুষটি তো দিনরাত্রি মাথা উঁচু করে বেড়াতে চায় নি; সে নমস্কার করতেই চেয়েছিল। তার সমস্ত আনন্দ নমস্কারের দ্বারা বিশ্বজগতে প্রবাহিত হয়ে যেতে চেয়েছে; নমস্কারের দ্বারা তার আত্ম-সমর্পণ পরিপূর্ণ হতে চায়। নমস্কারের দ্বারা সে আপনাকে সেই জায়গাতেই প্রসারিত করে যেখানে তুমি তোমার পা রেখেছ, যেখানে তোমার চরণাশ্রয় করে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এক জায়গায় এসে মিলেছে— যেখানে দরিদ্রকে

ধনী দ্বারের বাইরে দাঁড় করাতে পারে না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়ে রেখে দিতে পারে না—সেই তো সকলের চেয়ে নীচের জায়গা, সেই তো সকলের চেয়ে প্রশস্ত জায়গা, সেই তোমার অনন্তপ্রসারিত পাদপীঠ। আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ নমস্কারের দ্বারা সেই সর্বজনভোগ্য মহাপুণ্যস্থানের অধিকারটি পেতে ব্যাকুল হয়ে আছে। যে স্থানটি নিয়ে রাজা তার কাছ থেকে খাজনা দাবি করবে না, পাশের মানুষ তার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসবে না, সত্য নমস্কারটিই যে স্থানের একমাত্র সত্য দলিল, সেই সম্পত্তিই আমার অন্তরাত্মার পৈতৃক সম্পত্তি।

জল যখন তাপের দ্বারা হাল্কা হয়ে যায় তখনই সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে; তখনই সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক করে ফেলে; তখনই সে ব্যর্থ হয়ে, স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়; তখনই সে আলোককে আবৃত করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও সকলেই জানে, জলের যথার্থ স্বধর্মই হচ্ছে সে আপনার সমতলতাকেই চায়। সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা। সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়—তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। যে লঘুবাষ্পরাশি পৃথক হয়ে উঁচুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, নিচেকার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করতেই চায় না, তার গায়ে শুভক্ষণে যেই একটু রসের হাওয়া লাগে, যেই সে আপনার যথার্থ গৌরবে ভরে ওঠে, অমনি সে আপনাকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না—নমস্কারে বিগলিত হয়ে সেই সর্বজনের নিম্নক্ষেত্রে সেই সকলের মাঝখানে এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে। তখনই জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, তখনই মিলনের স্রোত চার দিকে ছুটে বইতে থাকে, বর্ষণের সংগীতে দশ দিক মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক জলবিন্দু তখনই আপনাকে সত্যরূপে লাভ করে—আপনার ধর্মে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তেমনি আমার অন্তরের মানুষটি অন্তরে অন্তরে আপনাকে বর্ষণ করতে, আপনাকে সমর্পণ করতে চাচ্ছে। এই তার যথার্থ ধর্ম। সে অহংকারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্ছে; পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তের সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্মটিকে যে-পর্যন্ত সে না পাচ্ছে সেইপর্যন্তই তার যত-কিছু দুঃখ, যত-কিছু অপমান। এইজন্যেই সে প্রতিদিন জোড়হাত করে বলছে : নমস্তেঽস্তু। তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি।

তোমাকে নমস্কার করা, এ কথাটি সহজ কথা নয়। এ তো কেবল অভ্যস্তভাবে মাথা নিচু করা নয়। পিতা নোঽসি—তুমি আমাদের সকলেরই পিতা—এই কথাটিকে তো সহজে বলতে পারলুম না। যখন ভেবে দেখি এই কথাটি বলবার পথ প্রতিদিনই সকল ব্যবহারেই কেমন করে অবরুদ্ধ করে ফেলছি

তখন মনে ভয় হয়— মনে করি, সন্তানের নমস্কার বুঝি এ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর সম্পূর্ণ হতে পারল না, মানুষের জীবনে যে রস সকল রসের সার সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধুরতম রসটি হৃদয়ের মধ্যে বুঝি কণামাত্রও জায়গা পেল না। কেমন করেই বা পাবে! শুষ্ক যে সে আপনার শুষ্কতা নিয়েই গর্ব করে, ক্ষুদ্র যে সে যে আপনার ক্ষুদ্রতা নিয়েই উদ্ধত হয়ে ওঠে। স্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করতে গেলে সে যে কেবলই মনে করে, 'আমি আমার আত্মাকেই খর্ব করলুম।' সে যে নমস্কার করতে চাচ্ছেই না। তার এমনই দুর্দশা যে উপাসনার সময় যখন সে তোমার কাছে আসে তখনও সে আপনার অহংটাকেই এগিয়ে নিয়ে আসে। সংসারক্ষেত্রে যেখানে সমস্তই আত্মপর ও উচ্চনীচের দ্বারা আমরা সীমাচিহ্নিত করে রেখেছি, সেখানে সর্বলোকপিতা যে তুমি. তোমাকে নমস্কার করবার তো জায়গাই পাই নে : তোমাকে সত্যকার নমস্কার করতে গেলে সকল দিকেই নানা দেয়ালেই মাথা ঠেকে যায়। কিন্তু, তোমার এই পূজার ক্ষেত্রে যেখানে কেবল ক্ষণকালের জন্যেই আমরা পরিচিত অপরিচিত. পণ্ডিত মূর্খ. ধনী দরিদ্র, তোমারই নামে একত্র সমবেত হই, সেখানেও যে মুহূর্তেই আমরা মুখে উচ্চারণ করছি 'পিতা নোঽসি' তুমি আমাদের সকলের পিতা! তুমিই আছ! তুমিই সত্য" সেই মুহূর্তেই আমরা মনে মনে লোকের জাতি বিচার করছি, বিদ্যা বিচার করছি. সম্প্রদায় বিচার করছি। যখনই বলছি 'নমস্তেঽস্তু' তখনই নমস্কারকে অন্তরে কলুষিত করছি। সকলের পিতা বলে যে অসংকুচিত নমস্কার তোমাকেই দিতে এসেছি তার অধিকাংশই তোমার কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে আমার সমাজটারই পায়ের কাছে স্থাপন করছি। সংসারে আমার অহং নিজের জোরে স্পষ্ট করেই প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। সেখানে তার নিজের পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে নিজের কোনো সংশয় বা লজ্জা নেই। এখানে তোমার পূজার ক্ষেত্রে তার অনধিকারের বাধাকে এড়াবার জন্যে সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে আসে। কিন্তু. এখানে তার সকলের চেয়ে ভয়ংকর স্পর্ধা এই যে, ছদ্মবেশে তোমারই সে অংশী হতে চায়, তোমার নামের সঙ্গে সে নিজের নামকে জড়িত করে এবং তোমার পূজার মধ্যেও সে নিজের অপবিত্র হস্তকে প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমনি করে কি চিরদিনই আমরা তোমার নমস্কারকেও সাম্প্রদায়িক সামাজিক প্রথার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের মধ্যেই ঠেলে রেখে দেব! কিন্তু, কেন! তার প্রয়োজন কী আছে! তোমাকে নমস্কার তো আমার টাকা নয় কড়ি নয়, ঘর নয় বাড়ি নয়। তোমাকে নমস্কার করে আমার বাইরের মানুষটি তো তার থলির মধ্যে কিছুই ভরতে পারে না। রাজাকে নমস্কার করলে তার লাভ আছে, সমাজকে নমস্কার করলে তার সুবিধা আছে, প্রবলকে নমস্কার করলে তার সাংসারিক অনেক আপদ এড়ায়। কিন্তু. সে যদি দলের দিকে, সমাজের দিকে অনিমেষ নেত্র মেলেই থাকে তবে তোমাকে নমস্কার করার কথা উচ্চারণ করবারই বা তার লেশমাত্র প্রয়োজন কী আছে!

প্রয়োজন যে একমাত্র তারই যে আমার ভিতরের মানুষ—সে যে নিত্য মানুষ—সে তো সংসারের মানুষ নয়। সে তো সমাজের কাছ থেকে ছোটো বড়ো কোনো উপাধি গ্রহণ করে সেই চিহ্নে আপনাকে চিহ্নিত করে না। তার চরম প্রয়োজন সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করে জানা; তা হলেই সে আপনাকে সত্য জানতে পারে। সেই সত্য জানা থেকে বঞ্চিত হলেই সে মুহ্যমান হয়ে, অপবিত্র হয়ে জগতে বাস করে। আপনাকে সত্যরূপে জানবার জন্যেই, সমাজ-সংস্কারের সংকীর্ণ জালের মধ্যে নিজেকে নিত্যকাল জড়িত করে রাখবার দীনতা হতে উদ্ধার পাবার জন্যেই, সে ডাকছে তার পিতাকে—সে ডাকছে নিখিল মানুষের পিতাকে। সেই তার পিতার বোধের মধ্যেই তার আপনার বোধ সত্য হবে, তার বিশ্বের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ হবে। এ ডাক সমাজের ডাক নয়, সম্প্রদায়ের ডাক নয়; এ ডাক অন্তরাত্মার ডাক। এ ডাক কুলশীলের ডাক নয়, মানসম্ভ্রমের ডাক নয়, এ ডাক সন্তানের ডাক। এই একটিমাত্র ডাকেই সকল সন্তানের কণ্ঠ এক সুরে মেলে, এই 'পিতা নোঽসি'। তাই এ ডাকের সঙ্গে কোনো অহংকার কোনো সংস্কারকে মেলাতে গেলেই এই পরম সংগীতকে এক মুহূর্তেই বেসুরো করা হবে—তাতে আত্মা পীড়িত হবে এবং হে পরমাত্মন্, তাতে তোমাকেই বেদনা দেওয়া হবে, যে তুমি সকল সন্তানের ব্যথার ব্যথী।

তাই তোমার কাছে অন্তরের এই অন্তরতম প্রার্থনা—যেন নত হই, নত হই। সেই নতি দীনতার নতি নয়, সে যে পরম পরিপূর্ণতার প্রণতি। তোমার কাছে সেই একান্ত নমস্কার আত্মসমর্পণের পরমৈশ্বর্য। আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক, সত্য হোক—অহং শান্ত হোক, অহংকার ক্ষয় হোক, ভেদবুদ্ধি দূর হোক, পিতার বোধ পূর্ণ হোক এবং বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক। নমস্তেঽস্তু।—

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
 একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
ঘনশ্রাবণমেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন থাক্ পড়ে থাক্ তব ভবনদ্বারে
 একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।

নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে
 একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবসরাত্রি
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মরণপরপারে
 একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।

প্রাতঃকাল
১১ মাঘ ১৩১৮

সৃষ্টির অধিকার

দিন তো যাবেই—এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়েছে। কিন্তু, সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে, যেটা হবার সেটা হয় নি। দিন তো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলই বলেছে, 'হবে, হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনও তার কিছুই হয় নি।' তাই যদি না হয়ে থাকে তবে মানুষ আর কিসে মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে-সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোনো বেদনা নেই। এখনও যা হয়ে ওঠবার তা হয় নি এ কথা তো তার কথা নয়। কিন্তু, মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটি রয়েছে—হয় নি, যা হবার তা হয় নি। কী হয় নি? আমি যা হব বলে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। 'আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব' এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠছে যে, হয় নি, হয় নি, দিন আমার বৃথাই বয়ে যাচ্ছে। গাছকে পশুপাক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না—মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েছে যে 'আমি হব'। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী-তরুলতার সঙ্গে সমান। কিন্তু, ভগবান তাকে তাদের সঙ্গে সমান হতে দেবেন না, তিনি চান যে তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেইজন্যে তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—তাকে উলঙ্গ ক'রে দুর্বল ক'রে পাঠিয়েছেন। আর-সকলেরই জীবনরক্ষার জন্যে যে-সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন—বাঘকে তীক্ষ্ন নখদন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু, এ কী তাঁর আশ্চর্য লীলা যে মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্বল অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন—কারণ, এরই ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমা শক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেইখানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর-সব তৈরি, চন্দ্রসূর্য তরুলতা সমস্তই তৈরি—কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন সেই যে সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু, আমরা কি তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব? তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন তারই মধ্যে আমরা আবৃত থাকব, এ হলে আর কী হল? এ

পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্বলতা নেই— এই পৃথিবীর ভূমি কী নিশ্চল অটল। সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কী স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত— এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই, সমস্তই তাঁর অটল শাসনে তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে দেন নি— তার ভিতরে রঙের একটি বাটী দিয়ে বলেছেন, 'তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজতে হবে।' তিনি বলেছেন, 'তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই-সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন ক'রে, সুন্দর ক'রে, আশ্চর্য করে তৈরি করে তুলতে হবে— আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না।' আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না?

কী নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্ছে? প্রতি দিনের আবর্তনে কী জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। আজ যা হচ্ছে কালও তাই হচ্ছে— এক দিনের পর কেবল আর-এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলছে— ঘানিতে জোতা হয়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোনো নতুন আঘাত পাচ্ছি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। এই সাংসারিক জীবন-যাত্রার প্রাত্যহিক অভ্যস্ত কর্মে আমরা কী পাচ্ছি? আমরা কী জড়ো করছি? এই-সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এমনি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে? অভ্যাস, অভ্যাস! তারই জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি— তারই উপরে যে আমাদের একদিন ঠেলে উঠতে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছি। মলিনতার উপর কেবলই মলিনতা জমা হচ্ছে, অভ্যাসকে কেবলই বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে, এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সংকীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি— বিশ্বভুবনের আশ্চর্য লীলাকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখবার বেলা দেখি— উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবনযন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আসতে পথ পায় না; ওই-সব জিনিসগুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আসবেন ব'লে বলে দিয়েছেন, 'তুমি তোমার আসনখানি তৈরি করে দাও, আমি যেই আসনে বসব, তোমার ঘরে গিয়ে বসব।' অথচ আমরা যা-কিছু আয়োজন করছি সে-সব নিজের জন্যে। তাঁকে বাদ দিয়ে বসেছি। জগৎ জুড়ে শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন— কেবল একটুখানি কালো জায়গা— আমাদের হৃদয়ের সেই কালো কলঙ্কে মলিন ধূলিতে-আচ্ছন্ন সেই একটুমাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি। সেই জায়গাটুকু আমার; সেখানে আমার টাকা রাখব, আসবাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ির ভিত কাটব। সেখানে তাঁকে বলি, 'তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পারব না, তোমাকে ওখান থেকে নির্বাসিত করে দিলুম।' তাই এই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি যে, যে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, যার

মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষেরই কি সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হল? আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আর-সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না।' তিনি বলেছেন, 'তোমরা কি আমাকে ডাকবে না? তোমরা যা ভোগ করছ আমাকে তার একটু অংশ দেবে না?' যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয়, তারা অনাদর সইতে পারে না। আর, যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেই বলেছি, 'তোমাকে দিতে পারব না।' দিনের পর দিন কি এই কথা বলে আমরা সব ব্যর্থ করি নি? একদিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে, বলতে হবে, 'আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি জীবনযৌবন তোমারই জন্যে।' প্রতিদিন যদি-বা ভুলে থাকি, আজ একদিন অন্তত বলি, 'তোমারই জন্য আমার এই জীবন হে স্বামী! তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ করলেম, না তোমাকেই ব্যর্থ করলেম? তুমি যে বলেছিলে আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে, 'তুমি বড়ো, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাকবে না।' সেই পিতৃসত্য যে আমাদের পালন করতেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।'

সেইজন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার করবে বলে এক-একটা দিনকে মানুষ পৃথক করে রাখে। সে বলে, 'রোজ তো ঘানি টেনেছি, আর পারি নে— একটা দিন অন্তত বুঝি যে আনন্দলোকে অমৃতলোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়।' সেই দিন উৎসবের দিন, সেই দিন মানুষের আপনার সত্যকে জানবার দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে কত অসত্য করে দেখেছি, কত অসত্য করে জেনেছি— একদিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমার পিতা— পিতা নোঽসি— এত বড়ো কথা একদিন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধনমান খ্যাতিপ্রতিপত্তির কাছে প্রণাম নয়, প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধূলিজঞ্জালের নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে ডাকব— পিতা নোঽসি। তুমি আমার পিতা! যেদিন তাঁকে ডাকব, তাঁকে ঘরে নিয়ে আসব, সেদিন সব ধনমান সার্থক হবে; সেদিন কোনো অভাবই আর অভাব থাকবে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে। সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে— কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, 'তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে।' সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ

এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে? সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার-বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘর-ভরা শিশু, তার মা বাপ ভাই বন্ধু আত্মীয়প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু, সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না, তিনি বলেছেন, 'তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব—আর-সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গ-সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এত বড়ো একটা চরম সৃষ্টি হতে পারে নি।' সর্বশক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এইজন্যে যে তিনি যুগযুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধরে অপেক্ষা করেন নি? আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্যশ্যামলা হয়েছে—কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তরল হয়ে তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনো বাকি। বাষ্প-আকারে যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটে নি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কী অপরূপ সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে! ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠে নি। তাঁর সেই রচনাকার্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা কেবল 'খাব' 'পরব' 'সঞ্চয় করব' এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এ ভুল তো ভাঙবে, মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, 'এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলেম।' অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেছি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য ফুটেছিল। জগৎ-সংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলেম? অভাবকে তো কিছু পূরণ করেছি, কিছু অজ্ঞান দূর করেছি—এই কথাটি তো বলে যেতে হবে। এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে পড়ে থাকব। তার আগে কি বলে যেতে পারব না কিছু দিতে পেরেছি?

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুশি হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, আমি ঐ সৃষ্টিতে আরো কিছু সৃষ্টি করব। শিল্পী কী করে? সে কেন শিল্প রচনা করে? বিধাতা বলেছেন, 'আমি এই-যে উৎসবের লণ্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি, তুমি কি আলপনা আঁকবে না? আমার রশুনচৌকি তো বাজছেই—তোমার তম্বুরা, কি

একতারাই নাহয়, তুমি বাজাবে না?' সে বললে, 'হাঁ, বাজাব বৈকি।' গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমনি মিলল অমনি ঠিক গানটি হল। আমি গান সৃষ্টি করব বলে সেই গান তিনি শোনবার জন্যে আপনি এসেছেন। তিনি খুশি হয়েছেন—মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েছেন, প্রেম দিয়েছেন, তা যে মিলল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে, এই দেখে তিনি খুশি। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেছে? সে যে তাঁরই সভায় তার শিল্প দেখাচ্ছে, তার গান শোনাচ্ছে। তিনি বললেন, 'বাঃ, এ যে দেখছি আমার সুর শিখেছে! তাতে আবার আধো-আধো বাণী জুড়ে দিয়েছে—সেই বাণীর আধখানা ফোটে, আধখানা ফোটে না।' তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েছি শুনে তিনি বললেন, 'খুশি হয়েছি।' এই-যে তাঁর মুখের খুশি—না দেখতে পেলে সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে, মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় বসে আছে সে কিছুই নয়। কিন্তু, শিল্পী কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য নিল; কবি সুর নিল, রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে পারা যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরই জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কানায় কানায় পূর্ণ করে যেদিন নিবেদন করতে পারব সেদিন জীবন ধন্য হবে। তার চেয়ে বড়ো নিবেদন আর কী আছে! আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবেদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি, কৃপণতা করে বলি নিজের জন্য সবই নেব কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উদ্‌বৃত্তমাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভরে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলছি, আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন, 'তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে, কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম। তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব ভুলে গেলুম। তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না?' আজ এই কথা বলব, 'আমার আসন শূন্য রয়ে গেছে। তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসে একে পূর্ণ করো। তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কী! আমার ধুলোর মধ্যে ভিক্ষুকের মতো পড়ে থাকা যে ভালো। হায় হায়, ধুলোবালি নিয়ে বাস্তবিকই এই-যে খেলা করছি এই কি আমার সৃষ্টি! এই সৃষ্টির কাজের জন্যেই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল! মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় নি! খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই পড়ে যায়। কিন্তু, তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে পড়ে যেতে পারে!' খেলাঘর কত যত্ন করেই গড়ে তুলি। যেদিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সেদিন দেখিয়ে দেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোনো সাধ্য আমাদের নেই। সেদিন কেঁদে উঠে আবার ভুলি, আবার ছিদ্র ঢাকবার চেষ্টা করি—এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ এক দিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি, 'হে আমার চিরদিনের অধীশ্বর, তোমাকে এক দিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেছি, দেখা মেলে নি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলেম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটিও যদি না দাও, তবু এ কথা বলতে পারব না— ওগো, আমি পারলুম না। আমি ক্লান্ত অক্ষম, দুর্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল, এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলেম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড়ো দুঃখ পেয়েছি এ কথা বলবার অধিকার দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথ দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছি, আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত, এই কথাটি আজ স্মরণ করব। সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।'

অসতো মা সদ্‌গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে। মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃতলোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করছে তেমনি আমার জীবনকে করবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রাতঃকাল
১১ মাঘ ১৩২০

ছোটো ও বড়ো

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতি দিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক, মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালোবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে, মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময় যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাতখরচের খুচরো তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উদ্দাম প্রকাশ পায় সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মতো সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে, এ কথা সমস্ত মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মতো আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর-সমস্তকেই অস্বীকার করছে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি রচনা করে পড়ে আছে—তবু সমস্ত মত্ততা অহংকার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে যে 'আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়'।

সেইজন্যে আমরা যাঁকে দেখলুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসারবুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বললেন 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'—এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব-কিছু হতেই প্রিয়—তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এইজন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতিমুহূর্তকে মধুময় করে বিকশিত করছেন, যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলার হার করে তুলছেন, তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বললুম, এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা সমস্ত দ্বেষবিদ্বেষ-ভাগবিভাগের মাঝখানে এইটি ঘটছে—কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই-যে অনন্তের বিশ্বাস, এই-যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মতো রয়েছে, বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত; কিন্তু এ যে মর্মের জিনিস, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল থেকে এ যে অনির্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই তো ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে এক-একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পূজার সংগীত বেজে উঠত সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠছে—শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে—মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেছে সেই মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে। কেননা, বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের সমস্ত জায়গাটি ঘন করে জুড়ে বসে আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য জোগায় না, তখন খর রৌদ্রের দিনই শুভদিন—তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে সে মরবে তখনই যখন আমরা মরব। যতদিন আমরা আছি তত-

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ এক দিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি, 'হে আমার চিরদিনের অধীশ্বর, তোমাকে এক দিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেছি, দেখা মেলে নি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলেম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটিও যদি না দাও, তবু এ কথা বলতে পারব না— ওগো, আমি পারলুম না। আমি ক্লান্ত অক্ষম, দুর্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল, এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলেম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড়ো দুঃখ পেয়েছি এ কথা বলবার অধিকার দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথ দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছি, আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত, এই কথাটি আজ স্মরণ করব। সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।'

অসতো মা সদ্‌গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে। মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃতলোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করছে তেমনি আমার জীবনকে করবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রাতঃকাল
১১ মাঘ ১৩২০

ছোটো ও বড়ো

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতি দিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক, মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালোবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে, মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময় যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাতখরচের খুচরো তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উদাম প্রকাশ পায় সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মতো সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে, এ কথা সমস্ত মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মতো আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর-সমস্তকেই অস্বীকার করছে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি রচনা করে পড়ে আছে—তবু সমস্ত মত্ততা অহংকার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে যে 'আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়'।

সেইজন্যে আমরা যাঁকে দেখলুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসারবুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বললেন 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'—এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব-কিছু হতেই প্রিয়—তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এইজন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতিমুহূর্তকে মধুময় করে বিকশিত করছেন, যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলার হার করে তুলছেন, তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বললুম, এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা সমস্ত দ্বেষবিদ্বেষ-ভাগবিভাগের মাঝখানে এইটি ঘটছে—কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই-যে অনন্তের বিশ্বাস, এই-যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মতো রয়েছে, বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত; কিন্তু এ যে মর্মের জিনিস, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল থেকে এ যে অনির্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই তো ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে এক-একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পুজার সংগীত বেজে উঠত সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠছে—শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে—মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেছে সেই মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে। কেননা, বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের সমস্ত জায়গাটি ঘন করে জুড়ে বসে আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য জোগায় না, তখন খর রৌদ্রের দিনই শুভদিন—তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে সে মরবে তখনই যখন আমরা মরব। যতদিন আমরা আছি তত-

দিন আমাদের আত্মার খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে— মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই-যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃতলোক আছে, যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সংগীত বেজে উঠছে, আজ আমাদের উৎসব সেইখানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র? এই-যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে মাথায় মুকুট নিয়ে এসেছে, এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়?

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করছে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে, সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে; সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করছে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করছে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করছে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রসস্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব— এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার পাতার ভার নিয়েই তো আছে; বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে, সেইদিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেইদিন বোঝা যায় এতদিনকার পাতা ধরা এবং পাতা ঝরার ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আসছিল— সেইজন্যেই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেছে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েছি? আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্মজাল বুনে বুনে চলা নয়— তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য পরমকল্যাণ পূজার অঞ্জলির মতো ঊর্ধ্ব-মুখ হয়ে উঠছে?

না, সে কথা তো আমরা সকলে মানি নে। আমাদের জীবনের মর্মনিহিত সেই সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনো হয়তো আসে নি। আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে, এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগে নি। কিন্তু, তবুও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অন্যমনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি— যে যেমন ভাবে আসে আসুক— যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক।

কেননা, এ তো আমাদের কারো একলার সামগ্রী নয়; আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তবসংগীত উঠবে সে তো কারো একলা কণ্ঠের বাণী নয়; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম

ডেকেছে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত কলরবের উপরে উঠেছে, আমরা সেই সকল মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েছি— কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়— কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে যে তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাকতে শিখেছি। মানুষের এই একটি আশ্চর্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মতো আহার-বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারই মধ্যেই 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্', আমরা সেই মহান পুরুষকে জেনেছি— সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ, আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি তাই আনন্দ করছি তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছে: বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি; সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্ত-মাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয়েছে; তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে, মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে, ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে, এবং 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং'—হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্নমুখ— সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েছে। সে দেখা তো সহজ নয়; সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই তো তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে, তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দসম্মিলন।

কিন্তু, বিমুখ চিত্তও আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন্ মহৎ সম্পদ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি? তাই এমন কথা শুনি, 'অনন্তকে নিয়ে তো আমরা উৎসব করতে পারি নে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়িতে নাড়িতে আলোকধারার আবর্তন হতে কত শত শত বৎসর কেটে যায়, সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়? তাই তো সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মতো করে ছোটো করে নিই, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।'

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করি নে, যখন সমস্ত প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে উপলব্ধি করি নে, তখনই কলহ করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুটতে হত তা হলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত; কিন্তু যে সূর্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এইজন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার

প্রাণের বিকাশবেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক ক'রে পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি ; সেইখানেই তো ঐ বাণী উঠেছে : বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এ তো তর্ক-যুক্তির কথা হল না— চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে। কিন্তু, দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন 'এষঃ', 'এই-যে তিনি', সেখানে তো কোনো কথা বলা চলে না। 'সীমা' শব্দটার সঙ্গে একটা 'না' লাগিয়ে দিয়ে আমরা 'অসীম' শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি; কিন্তু অসীম তো 'না' নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন 'হাঁ'। তাই তো তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়। ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা-কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিসটি যেমন— কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্তেই তার ধ্বংস হচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর মালা। কিন্তু, তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজ বোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে ; মৃত্যুর 'না' দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্ছে 'হাঁ'।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্ছেন তেমনি ওঁ। তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্ছে, সমস্ত স্খলিত হচ্ছে বটে, কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্ছে ; সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্তন সমস্ত গতায়াত সত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানছি, নিরন্তর সমস্ত চলে যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করছে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখছি : কখনো আজ কখনো পাঁচ দিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়, তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয় ; অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে। যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখে নি, যে কাল সমাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন-কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করে নি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে— কিন্তু, সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে

গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ ; কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন তাঁরাই বলেছেন : এষাস্য পরমা গতিঃ! এষাস্য পরমা সম্পৎ! এষোঽস্য পরমো লোকঃ! এষোঽস্য পরম আনন্দঃ! এ তো জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই-যে ইনি, এই-যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমা গতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ— তিনি এক দিকে যেমন গতি আর-এক দিকে তেমনি আশ্রয়, এক দিকে যেমন সাধনার ধন আর-এক দিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ!

কিন্তু, আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করছি বটে তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকত না। অতএব, অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মতো গড়ে নিতে হবে, তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে, এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু, আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তা হলে কখনোই তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না, বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ— তেমনি অনন্তস্বরূপের প্রকাশও তো আমার সংগ্রহ করা উপকরণের অপেক্ষা করে নি, তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করছেন। যখনই তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন তখনই তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাত তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ-আভা তো আমারই। বনের শ্যামল শোভা তো আমারই। ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে? ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সংগীত উঠেছে সে সংগীত কার জন্যে? আর, এই তো রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর-দক্ষিণ-হস্ত-ধরা বন্ধু, এই তো ঘরে বাহিরে যাদের ভালোবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন— এদের মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্ছে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন। এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র-আলপনা-আঁকা বরণবেদিটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করছেন।

এই-সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব? সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে

দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দনিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই-সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগল না, আমরা তাঁকে যদি ভালোবাসতে না পারলুম, তবে জগৎ-জোড়া এই আয়োজনের দরকার কী ছিল? তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই-সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিনে হাওয়াকে উতলা করে তোলে? তবে তো বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, তার ধুলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেছে তাতেই তার পেট ভরবে!

না, এ কেবল সেই-সকল দুর্বল উদাসীনদের কথা যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কী বলেছে, তার থেকে তুমি কী বুঝলে?' সে বললে, 'সে কথা তো আমাদের মাস্টার-মশায় বলে দেয় নি।' ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাস্টার-মশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে, কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে, রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয়, মাস্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর-একটা কথা বসানো, 'সুশীতল' শব্দের জায়গায় 'সুস্নিগ্ধ' শব্দ প্রয়োগ করা। এপর্যন্ত মাস্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে। যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি। এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না। সেও বলে 'আমি বুঝি নে', আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ শহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'নদী জিনিসটা কী—তুমি কখনো কি দেখেছ' সে বললে 'না'। ভূগোলের নদী জিনিসটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে; এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি যে, যে নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোলবিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এগ্‌জামিন-পাসের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাস্টার-মশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে

এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নি, দেখতে পেলুম না। ওরে, বোঝবার আছে কী? এই-যে এষঃ এই-যে এই। এই-যে চোখ জুড়িয়ে গেল ; প্রাণ ভরে গেল, এই যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়ছে ; এই-যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রঙ ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠছে ; এই-যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করছেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠছে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ; আর ঐ-যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কশা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠছে— এই তো এষঃ এই তো এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে নিজের কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি— সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', সেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতং', সেই 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ', সেই-যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীরভাবে পূর্ণ করছেন, সেই-যে অন্তহীন জগতের আদি-অন্তে পরিব্যাপ্ত, সেই-যে 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে— পিতা, মাতা, বন্ধু— সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোটো করে আপন হাতে আপনার মতো করে গড়েছি তখন কী যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না? যখন আমরা বলেছি 'আমাদের পরম ধনকে সহজ করবার জন্যে ছোটো করব' তখনই আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি ; তখন টুকরো কেবলই হাজার টুকরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থামতে চায় নি ; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে ; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্মসাধনা ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুর-চারিণী ভীরু রমণীর মতো স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরোতে কেবলই ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে, অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয় ; থামার সীমাই হচ্ছে আমাদের মৃত্যু, আরো'র পরে আরো'ই হচ্ছে আমাদের প্রাণ। সেই আমাদের ভূমার দিকটি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক নিয়ত সাধনার দিক। সেই মুক্তির দিককে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্বলতাকেই লালন করে ও

শক্তিকে অবমানিত করে, তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোটো করতে গিয়ে পূজনীয়কে একপ্রকার বাদ দিয়ে বসে, তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর-এক বিপদে গিয়ে পড়ে—আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতেই পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে, অসীমকে কেবলমাত্র ছোটো করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড়ো করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়; তাঁকে শুধু ছোটো করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড়ো করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্তং ব্রহ্ম। অনন্ত বলেই ছোটো হয়েও বড়ো এবং বড়ো হয়েও ছোটো। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তো তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার এক সুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন: এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব, মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনই এ কথা সত্য হয়েছে তখনই এ কথাও সত্য, অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই; মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। এক দিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর-এক দিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; এক দিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-এক দিকে নিজেরই রিপু-গুলিকে ধর্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুই'ই আছে: মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এই-জন্যেই মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্ছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি।

আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডির বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবি করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে ; মানুষ যখন বড়ো বড়ো দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে ; কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি—যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে—এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানব-জন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মতো হয় কোনো পূর্বপিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু, তবু এই-সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করছে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ-সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে এক দিকে আনন্দের দ্বারা অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলই রসে মজে থাকতে হবে না, জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে ; তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ এক দিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন, আবার আর-এক দিকে বলেছে : স তপোহতপ্যত। তিনি তপস্যা দ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন। এ দুই'ই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করছেন, তিনি তপস্যা দ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

সে আরো গেয়েছিল—

আমার মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে!

তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিম্বা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন-বোধ হয় নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে এর ঠিক কী অর্থ বোঝে। কেননা, অনেক সময়ে দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে? ইহুদিদের পুরাণে বলেছে, ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বৈকি। তিনি ভিতর থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলছেন। সেইজন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি-কাকে অনুভব করছে। সেইজন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেছে—

খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি
কমনে আসে যায়!

আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা!—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ। তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে—

আমার মনের মানুষ কে রে!
আমি কোথায় পাব তারে!

সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম ক'রে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না—তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে ; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। 'কোথায় পাব তারে ?' কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না— স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া— আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে—এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ; যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে, 'আমি কোথায় পাব তারে ?' সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই ; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্যলাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার— এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই-যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ তো কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই তো এর পূর্ণতা হতে পারে না। জ্ঞানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে; ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে যে দিকেই মানুষ বলেছে 'আমি চিরকালের মতো পেঁচেছি—আমি পেয়ে বসে আছি'—এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে : সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই-যে তার চিরকালের গান—

> আমি কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে!

এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন—

> মনের মানুষ যেখানে
> বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে!

কেননা, সন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে ; যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর-এক রকম করে বলা হয়েছে। তাঁকে বলেছে : পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ—কোনো অনন্ত তত্ত্বকে তো পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল, এতে কি কোনো অপরাধ হল ? এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল ? কিছু-মাত্র না। কেননা, আমার ঘর ছেড়ে তিনি তো শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি যে সকল রকম করেই ভরেছেন। মাকে যখন মা বলেছি তখন পরম-মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেছি—মানুষের সকল

সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েছে— মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক-এক ভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েছি। আমার সেই ঘর-ভরা অসীমকে, আমার সেই জীবন-ভরা অসীমকে আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে ; আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে। সেইটেই আমার চরম ডাক। সেইজন্যেই আমার ঘর, সেইজন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি; সেইজন্যেই আমার জীবনের যত-কিছু জানা যত-কিছু পাওয়া। তাই তো মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেছে : পিতা নোঽসি। তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক— কিন্তু, এই ডাকই মানুষ একেবারে মিথ্যা করে তোলে যখন এই ছোটো অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা ব'লে, পিতা ব'লে কেবল মাত্র আবদার করি, আর সাধনা করবার কিছু থাকে না— যেটুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফললাভ করতে চাই, অন্যায় করে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু, এ তো কেবলমাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্য, ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্বলতাকে লালন করবার জন্যে তাঁকে পিতা বলা নয়। সেইজন্যেই বলা হয়েছে : পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার মধ্যে উদ্‌বোধিত করতে থাকো। এ বোধ তো সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে তা চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে 'পিতা'— সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠবে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি! নমস্তেঽস্তু! পিতার বোধকে উদ্‌বোধিত করো। যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি। যেন আমাদের প্রতি দিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, রাজ্যের কাজে আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুই ধারে তার নানা কল্যাণকীর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই সমগ্র মানবের সমস্ত কালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। তুমি সুখরূপে আনন্দকর, তোমাকে নমস্কার। তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর, তোমাকে নমস্কার। তুমি কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নব নবতর কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার।

সায়ংকাল
১১ মাঘ ১৩২০

॥ ১৬ ॥

সৌন্দর্যের সকরুণতা

প্রভাতের পূর্বগগনে আলোকের প্রথম বিকাশ যেমন মধুর, মানুষের জীবনের প্রথম প্রত্যুষের অরুণরেখা যেদিন জেগে ওঠে সেদিন শিশুর কণ্ঠে তার সংগীত তেমনি মধুর, তেমনি নির্মল। সমস্ত মানুষের জীবনের আরম্ভে এই মধুর সুরের উদ্‌বোধন লোকালয়ে ঘরে ঘরে দেখতে পাই। জীবনের সেই নির্মল সৌন্দর্যের ভূমিকাটি কেমন সুন্দর! জগৎসংসারে তাই যত মলিনতা থাক্‌, জরার দ্বারা মানুষ যেমনই আচ্ছন্ন হোক-না কেন, ঘরে ঘরে মনুষ্যত্ব নতুন হয়ে জন্মগ্রহণ করছে। আজ শিশুদের কণ্ঠে জীবনের সেই উদ্‌বোধনসংগীতের প্রথম কলকাকলি শুনতে পাচ্ছি। এ উদ্‌বোধন কে প্রেরণ করলেন? যিনি জীবনের অধীশ্বর তিনিই ঘরে ঘরে এই জাগরণের গীত পাঠিয়েছেন। আজ চিত্ত সেই গানে জাগ্রত হোক।

কিন্তু, এই উৎসবের সংগীতের মধ্যে একটি করুণ সুর, একটি কান্না রয়েছে—সকালের প্রভাতী রাগিণীর সেই কান্না বুকের মধ্যে শিরা নিঙড়ে নিঙড়ে বাজছে। আনন্দের সুরের মধ্যে করুণার কোমল নিখাদ বাজছে। সে কিসের করুণা? পিতা ডাক দিয়েছেন, কিন্তু সকলের সময় হয়ে ওঠে নি। জাগে নি সবাই। অনন্ত শূন্যে প্রভাত-আলোকের ভৈরবীর সুর করুণা বিস্তার করে যুগ হতে যুগে ধ্বনিত হচ্ছে—তিনি উৎসবক্ষেত্রে ডেকেছেন, অনাদি কালের সেই আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙে নি। তারা কেউ বা উদাসীন, কারো বা কাজ আছে, কেউ বা উপহাস করছে, কাউকে বা অভ্যাসের আবরণ কঠিন করে ঘিরে আছে। তারা সংসারের কোলাহল শুনেছে, স্বার্থের আহ্বান শুনেছে, প্রতি দিনের প্রয়োজনের ডাক শুনেছে, কিন্তু আকাশের আলোকের ভিতরে আনন্দময়ের আনন্দভবনে উৎসবের আমন্ত্রণের আহ্বান শুনতে পায় নি।

প্রেমিকের ডাক প্রেমাস্পদের কাছে আসছে, মাঝখানে কত ব্যবধান! কত অবিশ্বাস, কত কলুষ, কত মোহ, কত বাধা! উৎসবের নহবত প্রভাতে প্রভাতে বাজছে, তারায় তারায় অন্ধকারের হৃদয় ভেদ করে বাজছে। সেই উৎসবলোকে ফুল ফুটছে, পাখি গান করছে, শ্যামল তৃণের আস্তরণ পাতা হয়েছে, তাঁর মালীরা ফুলের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে রেখেছে—কিন্তু এতই ব্যবধান, সেখান-কার সংগীতকে এখানে আমাদের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না। সেইজন্যই তিনি যে সৌন্দর্যের সংগীত বাজাচ্ছেন তার মধ্যে অমন কান্না রয়েছে। পৌঁছল না, সবাই এসে জুটল না, আনন্দসভা শূন্য পড়ে রইল। জগতের সৌন্দর্যের বুকের মধ্যে এই কান্না বাজছে। ফুল ফুটতে ফুটতে ঝরতে

ঝরতে কত কান্নাই কাঁদল; সে বললে, 'যে প্রেমলিপি আমি আনলুম সে লিপিখানি কেউ পড়ল না।'

নদীর কলস্রোতে নির্জন পর্বতশিখর থেকে যে সংগীতকে বহন করে সমুদ্রের দিকে চলেছে, সেই সুরে কান্না রয়েছে, 'আমি যে নির্জন থেকে নির্জনের দিকে চলেছি, সেই নির্জনের সুর গ্রামে গ্রামে লোকালয়ে ঘোষণা করেছি—কারো সময় হল না সে আহ্বান শুনবার।' আকাশের সমস্ত তারা এমন ডাক ডাকল, কাননের সমস্ত ফুল এমন ডাক ডাকল—দরজা রুদ্ধ—কেউ শুনল না। এমন সুন্দর জগতে জন্মালুম, এমন সুন্দর আলোকে চোখ মেললুম—সেখানে কি কেবল কাজ! কাজ! কেবল প্রবৃত্তির কোলাহল! কেবল এই কলহ, মাৎসর্য, বিরোধ! সেখানে এরাই কি সকলের চেয়ে প্রধান! এই সুরেই কি সূর্য চন্দ্র সুর মেলাচ্ছে! এই সুরেই কি সুর ধরিয়েছিলেন যেদিন জননী শিশুকে প্রথম মুখচুম্বন করলেন! এত বড়ো আকাশ, তার এমন নির্মল নীলিমা, একে মানুব না! পৃথিবীর এমন আশ্চর্য প্রাণবান গীতিকাব্য, একে মানুব না! সেইজন্যই জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে এমনি একটি চিরবিরহের করুণা। প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ হয়েছে; মাঝখানে স্বার্থের মরুভূমি। সেই মরুভূমি পার হয়ে ডাক আসছে 'এসো এসো'; সেই ডাকের কান্নায় আকাশ ভরে গেল, আলোক ফেটে পড়ল।

কিন্তু, যিনি উৎসবের দেবতা তিনি অপেক্ষা করতে জানেন। এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে তিনিই পার করছেন, পথহারাদের ক্রমে ক্রমে পথে টেনে আনছেন। দুঃখের অশ্রুতে তাঁর মিলনের শতদল বিকশিত হচ্ছে। তিনি জানেন যে বধির সেও শুনবে, চিরযুগের রুদ্ধ দ্বার একদিন খুলবে, পাষাণ একদিন গলবে। এই বাধা-বিরোধের ভিতর থেকে তিনি টেনে নেবেন।

মানুষের জাগরণ সহজ নয় বলেই তার মূল্য যে এত বেশি। এই জাগরণের জন্য যুগযুগ যে অপেক্ষা করতে হয়। যেদিন জাগবে মানুষ সেদিন পাখির গানের চেয়ে তার গানের মূল্য অনেক বেশি হবে, ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার সৌন্দর্য অনেক বেশি হবে। মানুষ আজ বিদ্রোহ করছে, কিন্তু ঝড়ের মেঘ যেমন শ্রাবণের ধারায় বিগলিত হ'য়ে তার বজ্র বিদ্যুৎকে নিঃশেষ করে মাটিতে লুটিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় তেমনি বিদ্রোহী মানুষ যেদিন ঝোড়ো মেঘের মতো কেঁদে ঝরে পড়বে সেদিন মরুভূমিতে বিকশিত হবে ফুল—তার মূল্য যে অনেক বেশি। সেইজন্য যুগযুগ রাত্রিদিন তিনি জেগে রইলেন, অপেক্ষা করে রইলেন—পাপীর পাপের মলিনতা ধৌত হয়ে কবে তার হৃদয় ফুলের মতো নির্মল হয়ে ফুটে উঠবে। বৎসরে বৎসরে উৎসব ব্যর্থ হয়; দিনের পর দিন আলোকদূত ফিরে ফিরে যায়; অন্ধকার নিশীথিনীর তারকারা রাত্রির পর রাত্রি একই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, ক্লান্ত হয় না, ক্লান্তি আসে না—কারণ, এই আশা-যে জেগে রয়েছে যে, যেদিন মানুষ ডাক শুনবে সেদিন সমস্ত সার্থক হবে।

আজ উৎসবের প্রাঙ্গণে আমরা এসেছি। এ দিন সকলের উৎসবের দিন কি না তা জানি না। সম্বৎসর তিনি ফুল ফুটিয়েছেন, প্রতিদিনই আমাদের ডেকেছেন। আজ কি আমরা নিজের হাতের তৈরি এই উৎসবক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রতি নিমেষের সাড়া দিচ্ছি? হে উৎসবের দেবতা, তোমার উৎসবের ক্ষেত্র ব্যর্থ হবে না। তুমি সাজিয়েছ, আমরা এসেছি। আমরা বললুম : পিতা নোঽসি। তুমি পিতা, এই কথা স্বীকার করলুম। বললুম : নমস্তেঽস্তু। নমস্কার সত্য হোক। নমস্কার তো সত্য হয় নি। সংসারের মধ্যে নমস্কার সত্য হয় নি। তোমাকে বঞ্চনা করেছি। ক্ষমতার পায়ে, ধনের পায়ে নমস্কার করেছি। হে আমার উৎসবদেবতা, আজ একটুখানি নমস্কার বাঁচিয়ে এনেছি—আজ আসবার সময় ধনমানের কাছ থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে একটু নমস্কার আনতে পেরেছি—সে না হতে পারে প্রতিদিনের নমস্কার, না হতে পারে সমস্ত জীবনের নমস্কার, কিন্তু এই ক্ষণকালের নমস্কার তুমি নাও. সমস্ত জীবনের অসাড়তা অচৈতন্য দূর হোক, তুমি নিজের হাতে জাগাও—

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে।

প্রাতঃকাল
১১ মাঘ ১৩২১

অমৃতের পুত্র

অমৃত-উৎসের ধারে মানুষকে একবার করে আসতে হবে এবং আপনাকে নতুন করে নিতে হবে। জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে মরণের ভিতর দিয়ে নতুনকে কেবলই প্রকাশ করা। সংসারের মধ্যে জরা সব জীর্ণ করছে, যা-কিছু নতুন তার উপর সে তার তপ্ত হাতের কালিমা বোলাচ্ছে—তাই দেখতে দেখতে নির্মল ললাটে বলির রেখা পড়ে, সকল কর্মে ক্লান্তি ও অবসাদ কেবলই জমে ওঠে। এই জরার আক্রমণে আমরা প্রতিদিন পুরাতন হয়ে যাচ্ছি। সেইজন্য মানুষ নানা উপলক্ষ করে একটি জিনিসকে কেবলই প্রকাশ করতে চায়, সে জিনিসটি তার চির-যৌবন। জরাদৈত্য যে তার সব রক্ত শোষণ করেছে সে এ কথা মানতে চায় না। সে জানে যে তার অন্তরের চিরনবীন চিরযৌবনের ভাণ্ডারে অমৃত পরিপূর্ণ—সেই কথাটি ঘোষণা করবার জন্যই মানুষের উৎসব।

মানুষ দেখতে পেয়েছে যে সংসারের সঞ্চয় প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে যায়। যতই ভয় ভাবনা করি, যতই আগলে আগলে রাখি, কাল সমস্তই নষ্ট করবে—নবীন সৌন্দর্য কোথাও রাখবে না। সংসার যে বৃদ্ধকে তৈরি করছে। সে আরম্ভ করে নবীন শিশুকে নিয়ে, তার পরে একদিন বৃদ্ধ করে তাকে ছেড়ে দেয়। প্রভাতের শুভ্র নির্মলতা নিয়ে সে আরম্ভ করে, তার পরে তার উপর কালের প্রলেপ দিতে দিতে তাকে নিশীথরাত্রের কালিমায় হারিয়ে ফেলে।

অথচ এই জরার হাত থেকে মানুষকে তো রক্ষা পেতে হবে। কেমন করে পাবে, কোথায় পাবে? যেখানে চিরপ্রাণ সেইখানে পাবে। সে প্রাণের লীলার ধারা তো এক সূত্রের ধারা নয়। দেখো-না কেন, রাত্রির পরে দিন নতুন নতুন পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। দিনান্তে নিশীথের তারা নতুন করেই আপনার দীপ জ্বালাচ্ছে। মৃত্যুর সূত্রে প্রাণের মালাকর অমনি করে জীবনের ফুলকে নবীন করে গেঁথে তুলছেন। কিন্তু, সংসার একটানা মৃত্যুকে ধরে রেখেছে। সে সব জিনিসকে কেবলই ক্ষয় করতে করতে সেই অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কিন্তু, এই একটানা মৃত্যুর ধারা যদি চরম সত্য হত তবে তো কিছুই নতুন হয়ে উঠত না, তবে তো এতদিনে পৃথিবী পচে উঠত, তবে জরার মূর্তিই সব জায়গায় প্রকাশ পেত। সেইজন্য মানুষ উৎসবের দিনে বলে, 'আমি এই মৃত্যুর ধারাকে মানব না, আমি অমৃতকে চাই।' এ কথাও মানুষ বলেছে, 'অমৃতকে আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি। সমস্তই বেঁচে আছে অমৃতে।'

মৃত্যুর সাক্ষ্য চারি দিকে, অথচ মানুষ বলে উঠেছে, 'ওগো শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।'—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।

'আমি তাঁকে জেনেছি' এই বার্তা যাঁরা বলেছেন তাঁরা সে কথা বলবার আরম্ভে সম্বোধনেই আমাদের কী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র—তোমরা সংসারবাসী মৃত্যুর পুত্র নও। জগতের মৃত্যুর বাঁশির ভিতর দিয়ে এই অমৃতের সংগীত যে প্রচারিত হচ্ছে, এ সংগীত তো পশুরা শুনতে পায় না; তারা খেয়েদেয়ে ধুলোয় কাদায় লুটিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। অমৃতের সংগীত যে তোমরাই শোনবার অধিকারী। কেন? তোমরা যে মৃত্যুর অধীন নও, তোমরা মৃত্যুর একটানা পথেই চলছ না—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

তোমরা যে ধামে রয়েছ, যে লোকে বাস করছ, সে কোন্ লোক? তোমরা কি এই পৃথিবীর ধুলোমাটিতেই রয়েছ, যেখানে সমস্ত জীর্ণ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে? না, তোমরা দিব্যলোকে বাস করছ, অমৃতলোকে বাস করছ।' এই কথা মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ বলছে, সমস্ত সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে মানুষ বলছে। এ কথা সে মরতে মরতে বলছে। এই মাটির উপর মাটির জীবের সঙ্গে বাস করে বলছে, 'তোমরা এই মাটিতে বাস করছ না, তোমরা দিব্যধামে বাস করছ।'

সেই দিব্যধামের আলো কোথা থেকে আসে? তমসঃ পরস্তাৎ। তমসার পরপার থেকে আসে। এই মৃত্যুর অন্ধকার সত্য নয়; সত্য সেই জ্যোতি যা

যুগে যুগে মোহের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আসছে। যুগে যুগে মানুষ অজ্ঞানের ভিতর থেকে জ্ঞানকে পাচ্ছে, যুগে যুগে মানুষ পাপকে মলিনতাকে বিদীর্ণ করে পুণ্যকে আহরণ করছে। বিরোধের ভিতর দিয়ে সত্যকে পাচ্ছে, এ ছাড়া সত্যকে পাবার আর-কোনো উপায় মানুষের নেই। যারা মনে করছে এই জ্যোতিই অসত্য, এই দিব্যধামের কথা কল্পনা মাত্র, তাদের কথা যদি সত্য হত তবে মাটিতে মানুষ একদিন যেমন জন্মেছিল ঠিক তেমনিই থাকত—তার আর-কোনো বিকাশ হত না। মানুষের মধ্যে অমৃত রয়েছে ব'লেই না মৃত্যুকে ভেদ করে সেই অমৃতের প্রকাশ হচ্ছে? ফোয়ারা যেমন তার ছোটো একটুখানি ছিদ্রকে ভেদ করে ঊর্ধ্বে আপনার ধারাকে উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি এই মৃত্যুর সংকীর্ণ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অমৃতের উৎস উঠছে। যাঁরা এটা দেখতে পেয়েছেন তাঁরা ডাক দিয়ে বলেছেন, 'ভয় কোরো না, অন্ধকার সত্য নয়, মৃত্যু সত্য নয়, তোমাদের অমৃতের অধিকার। মৃত্যুর কাছে দাসখত লিখে দিয়ো না—যদি প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ কর তবে এই অমৃতত্বের অধিকারকে যে অপমানিত করবে।' কীট যেমন করে ফুলকে খায় তেমনি করে প্রবৃত্তি যে একে খেতে থাকবে। তিনি নিজে বলেছেন, 'তোরা অমৃতের পুত্র, আমার মতন তোরা।' আর, আমরা সে কথা প্রতিদিন মিথ্যা করব!

ভেবে দেখো, মানুষকে কি অমৃতের পুত্র করে তোলা সহজ। মানুষের বিকাশে যত বাধা ফুলের বিকাশে তত বাধা নেই। সে যে খোলা আকাশে থাকে; সমস্ত আলোকের ধারা, বাতাসের ধারা নিয়ত সেই আকাশ ধুয়ে দিচ্ছে—সে বাতাসে তো দূষিত বাষ্প জমা হয়ে তাকে বিষাক্ত করছে না। মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশ-ভরা প্রাণ সেই বিষকে ক্ষালন করে দিচ্ছে, তাকে কোথাও জমতে দিচ্ছে না। মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারি দিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে, কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে জমিয়ে তুলেছে। সে বলে, 'আকাশের আলোকে আমি বিশ্বাস করব না, আমার ঘরের মাটির দীপকে আমি বিশ্বাস করব; আলোক নতুন কিন্তু আমার ঐ দীপ সনাতন।' তার শয়নগৃহে বিষাক্ত বাতাস জমা হয়ে রয়েছে; সেইটেতেই সে পড়ে থাকতে চায়, কেননা সে যে হল তার সঞ্চিত বাতাস, সে নতুন বাতাস নয়। ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।

এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায়

আকাশ ছেয়ে যায়, কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন করে?

চিরদিন এমনি করে সত্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে মানুষ। মানুষের নিজের হাতের গড়া জিনিসের উপর মানুষের বড়ো মোহ— সেইজন্য মানুষ নিজের হাতেই নিজে মার খায়। মানুষ নিজের হাতে নিজেকে মারবার গদা তৈরি করে। সেইজন্য আজ সেই নিজের হাতের গড়া গদার আঘাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি আজ বলছে, 'ধর্মবুদ্ধির কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আমি গায়ের জোরে সব কেড়েকুড়ে নেব।' সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্ম গ্রহণ করে: সে ধর্ম— যে সবল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র। সেইজন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে স্বার্থের ধর্ম, যা তার পরধর্ম, তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে। যা জমিয়েছে তাকে চিরকালই আঁকড়ো ধরে রাখবে এ কেমন মমতা? যেমন দেহের প্রতি আমাদের মমতা। আমরা কি হাজার চেষ্টা করলেও দেহকে রাখতে পারি? যতই কেঁদে মরি-না কেন, যতই বলি-না কেন যে তার সঙ্গে অনেক দিন ধরে আমার সম্বন্ধ— তাকে রাখতে পারব না, কারণ তাকে রক্ষা মানেই মৃত্যুকে ধরে রাখা। আমাদের যে দেহকে ত্যাগ করে মৃত্যুকেই মারতে হয়। তেমনি বাপ-পিতামহ থেকে যা চলে আসছে, যা জমে রয়েছে, তাকে চিরকাল ধরে রাখবার ইচ্ছাও মৃত্যুকে ধরে রাখবার ইচ্ছামাত্র। দেহকে রাখতে পারলুম না, পুরাতনকেও রাখতে পারব না।

ইতিহাসবিধাতা তাই বললেন— নতুন হতে হবে। কামানের গর্জনে আজ সেই বাণী শুনতে পাচ্ছি— নতুন হতে হবে। জাতীয়তার আদর্শকে নিয়ে য়ুরোপ এতকাল ধরে তার প্রতাপকে অভ্রভেদী করে তুলেছে। ছোটো জাহাজ ছিল, তার পর বড়ো জাহাজ, তার পর বড়ো জাহাজ থেকে আরো বড়ো জাহাজ। কামান ছোটো ছিল, তা থেকে আরো বড়ো কামান গড়ে তুলে য়ুরোপ তার মারণ-অস্ত্র সব এতকাল বসে শানিয়েছে। জলে স্থলে এই-সব ব্যাপার করে তুলে তার তৃপ্তি হল না— আকাশে পর্যন্ত মারবার যন্ত্র তাকে তৈরি করতে হল। নিজের প্রতাপকে এমনি করে অভ্রভেদী করে সে দুর্বলকে টিপে তার রক্ত পান করবে, এমন কথা কি সে বলতে পারে? মানুষ মানুষকে খেয়ে বাঁচবে, এই হবে? ইতিহাসবিধাতা তাই হতে দেবেন? না। তিনি কামনোর গর্জনের ধ্বনির ভিতর দিয়ে বলেছেন— নতুন হতে হবে। য়ুরোপে নতুন হবার সেই ডাক উঠেছে।

সেই আহ্বান আমাদের মধ্যে নেই? আমরাই জরাজীর্ণ হয়ে থাকব? ইতিহাসবিধাতা কি আমাদেরই আশা ত্যাগ করেছেন? দুর্গতির পর দুর্গতি, দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে বলছেন, 'না হয় নি, তোমাদেরও হয় নি, নতুনকে লাভ অমৃতকে লাভ হয় নি। তুমি যে আবর্জনাস্তূপ জমিয়েছ তা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি নি। আমি অনন্ত প্রাণ, আমায়

বিশ্বাস করো। বীর পুত্র, দুঃসাহসিক পুত্র সব, বেরিয়ে পড়ো। এই বাণী কি আসে নি? এ কথা তিনি শোনান নি?—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামবাসী। তোমাদের এই অন্ধকারের মধ্যে সেই পরপার থেকে আলোক আসছে। সেইখান থেকে যে আলোক আসছে তাতে জাগ্রত হও— বসে বসে চক্‌মকি ঠুকলে দিনকে সৃষ্টি করতে পারবে না। সেই আলোকে যে নব নব দিন অমৃতের বার্তা নিয়ে আসছে। নব নব লীলায় সব নূতন নূতন হয়ে উঠছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দ আসছে, রক্তস্রোতের উপর জীবনের শ্বেত শতদল ভেসে উঠছে।

সেই অমৃতের মধ্যে ডুব দাও— তবেই হে বৃদ্ধ, কাননে যে ফুল এইমাত্র ফুটেছে তুমি তার সমবয়সী হবে; আজ ভোরে পূর্বাশার কোলে যে তরুণ সূর্যের জন্ম হয়েছে, হে প্রবীণ, তোমার বয়স তার সঙ্গে মিলবে। বেরিয়ে এসো সেই আনন্দলোকে, সেই মুক্তির ক্ষেত্রে। ভেঙে ফেলো বাধাবিপত্তিকে। নিত্যনূতনের অমৃতলোকে বেরিয়ে এসো। সেই অমৃতসাগরের তীরে এসে অকূলের হাওয়া নিই, সত্যকে দেখি। সত্যকে নির্মুক্ত আলোকের মধ্যে দেখি। সেই সত্য যা নিশীথের সমস্ত তারকার প্রদীপমালা সাজিয়ে আরতি করছে, সেই সত্য যা সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সাক্ষীর মতো সমস্ত দেখছে। নব নব নবীনতার সেই জ্ঞানময় সত্য। যার মধ্যে প্রাণের বিরাম নেই, জড়তার লেশ নেই, যার মধ্যে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ।

ওরে সংকীর্ণ ঘরের অধিবাসী, ঘরের দরজা ভেঙেচুরে ফেলে দাও। আমরা উৎসবের দেবতাকে দর্শন করে মনুষ্যত্বের জয়তিলক এঁকে নেব, আমরা নূতন বর্ম পরিধান করব। আমাদের সংগ্রাম মৃত্যুর সঙ্গে। নিন্দা অবমাননাকে তুচ্ছ করে অসত্যের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে সেই যুদ্ধ করবার অধিকার তিনি দিয়েছেন। এই অভয় বাণী আমরা পেয়েছি—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

এই কথা বলবার দিন আজ এই ভারতবর্ষেরই এসেছে। আজ প্রতাপে মদোন্মত্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে— আমরা যত ছোটো হই, সেই বল সংগ্রহ করব যাতে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, 'না, এ নয়। তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।'

যে ধনমান পায় নি সেই জোরের সঙ্গে বলতে পারে, 'আমি সত্যকে পেয়েছি। আমার ঐশ্বর্য নেই, গৌরব নেই, আমার দারিদ্র্য অবমাননার সীমা নেই, কিন্তু আমার এমন অধিকার রয়েছে যার থেকে আমায় কেউ বঞ্চিত করতে পারে না।' আমাদের আর কিছু নেই বলেই এ কথা

আমাদের মুখে যেমন শোনাবে এমন আর কারো মুখে নয়। পৃথিবীর মধ্যে লাঞ্ছিত আমরা, আমরা বলব আমরা অমৃতের পুত্র— এবং আমরাই বলছি যে 'তোমরাও অমৃতের পুত্র'। আজ উৎসবের দিনে এই সুরটি আমাদের কানে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের অপমান দারিদ্র্য অত্যন্ত স্বচ্ছ, সেইজন্যই সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ পেতে বাধা পাবে না, সে একেবারে নগ্ন হয়ে দেখা দেবে। পাথরের হর্ম্য গড়ে তুলে আমরাও আকাশের আলোককে নিরুদ্ধ করব না; আমাদের নিরাশ্রয় দীনের কণ্ঠে বড়ো মধুর সুরে বাজবে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

প্রাতঃকাল
১১ মাঘ ১৩২১

যাত্রীর উৎসব

এই প্রাঙ্গণের বাইরে বিশ্বের যে মন্দিরে সন্ধ্যাকাশের তারা জ্বলে উঠেছে, যেখানে অনন্ত আকাশের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার শান্তি পরিব্যাপ্ত, সেই মন্দিরের দ্বারে গিয়ে প্রণাম করতে তো মন কোনো বাধা পায় না। বিশ্বভুবনে ফুলের যে রঙ সহজে পুষ্পকাননে প্রকাশ পেয়েছে, নক্ষত্রলোকে যে আলো সহজে জ্বলেছে, এখানে তো সে রঙ লাগা সহজ হয় নি; এখানে সম্মিলিত চিত্তের আলো তো সহজে জ্বলে নি। এই মুহূর্তে সন্ধ্যাকালের গন্ধগহন কুসুমের সভায়, নিবিড় তারারাজির দীপালোকিত প্রাঙ্গণে, বিশ্বের নমস্কার কী সৌন্দর্যে কী একান্ত নম্রতায় নত হয়ে রয়েছে! কিন্তু, যেখানে দশজন মানুষ এসেছে সেখানে বাধার অন্ত নেই। সেখানে চিত্তবিক্ষেপ কত ঢেউ তুলেছে— কত সংশয়, কত বিরোধ, কত পরিহাস, কত অস্বীকার, কত ঔদ্ধত্য! সেখানে লোক কত কথাই বলে— এ কোন্ দলের লোক, কোন্ সমাজের, এর কী ভাষা! এ কী ভাবে, এর চরিত্রে কোথায় কী দরিদ্রতা আছে তাই নিয়ে এত তর্ক, এত প্রশ্ন! এত বিরুদ্ধতার মাঝখানে কেমন করে নিয়ে যাব সেই প্রদীপখানি, একটু বাতাস যার সয় না! সেই ফুলের অর্ঘ্য কেমন করে পৌঁছে দেব, একটু স্পর্শেই যা ম্লান হয়! সেই শক্তি তো আমার নেই যার দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধতা নিরস্ত হবে, সব বিক্ষোভের তরঙ্গ শান্ত হবে। জনতার মাঝখানে যেখানে তাঁর উৎসব সেখানে আমি ভয় পাই। এত বিরুদ্ধতাকে ঠেলে চলতে আমি কুণ্ঠিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর যেখানে তাঁর সিংহাসনে আসীন সেখানে তাঁর চরণে উপবেশন করতে আমি ভয় করি নি। সেখানে গিয়ে বলতে পারি,

'হে রাজন্, তোমার সিংহাসনের এক পাশে আমায় স্থান দাও। তুমি তো কেবল বিশ্বের রাজা নও, আমার সঙ্গে যে তোমার অনন্ত কালের সম্বন্ধ।' এ কথা বলতে কণ্ঠ কম্পিত হয় না, হৃদয় দ্বিধান্বিত হয় না। কিন্তু. ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আমার বলে স্বীকার করতে কণ্ঠ যদি কম্পিত হয়, তবে মাপ কোরো হে হৃদয়েশ্বর। ভিড়ের মধ্যে যখন ডাক দাও, তখন কোন্ ভাষায় সাড়া দেব? তোমার চরণে হৃদয়ের যে ভাষা সে তো নীরব ভাষা, যে স্তবগান তোমার সে তো অশ্রুত গান। সে যে হৃদয়বীণার তন্ত্রে তন্ত্রে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে— সেই বীণা যে তোমার বুকের কাছে তুমি ধরে রেখেছ। যতই ক্ষীণ সুরে সে বাজুক সে তোমার বুকের কাছেই বাজে। কিন্তু, তোমার আমার মাঝখানে যেখানে জনতার ব্যবধান, নীরবে হোক সরবে হোক অন্তরে অন্তরে যেখানে কোলাহল তরঙ্গিত, সেই ব্যবধান ভেদ করে আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠের সংগীত যে জাগবে, আমার পূজার দীপালোক যে অনির্বাণ হয়ে থাকবে—এ বড়ো কঠিন। বড়ো কঠিন।

মানুষ গোড়াতেই যে প্রশ্ন করে, 'কে হে, তুমি কোন্ দলের?' এ যে উৎসব—এ তো কোনো এক দল নয়, এ যে শতদল। এ কাদের উৎসব আমি কেমন করে তার নাম দেব? এক-একজন করে কত লোকের নাম বলব? হৃদয়ের ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে, সমস্ত কোলাহল পার হয়ে, স্তব্ধ শান্ত হয়ে যাঁরা এসেছেন আমি তো তাঁদের নাম জানি না। যাঁরা যুগে যুগে এই উৎসবের দীপ জ্বালিয়ে গেছেন এবং যাঁরা অনাগত যুগে এই দীপ জ্বালাবেন, তাঁদের কত নাম করব আর কেমন করেই বা করব? আমি এই জানি যে, সম্প্রদায় আপনার বাইরে আসতে চায় না: সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়। তাঁর দক্ষিণ মুখের যে অম্লান জ্যোতি অনন্ত আকাশে প্রকাশ-মান, যে জ্যোতি মনুষ্যত্বের ইতিহাসের প্রবাহে ভাসমান, সম্প্রদায় সেই জ্যোতিকেই নিজের প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চায়।

উৎসব তো ভক্তির, উৎসব তো ভক্তেরই। সে তো মতের নয়, প্রথার নয়, অনুষ্ঠানের নয়। এ চিরদিনের উৎসব, এ লোক-লোকান্তরের উৎসব। সেই অনন্ত কালের নিত্য উৎসবের আলো থেকে যে একটুখানি স্ফুলিঙ্গ এখানে এসে পড়ছে, যদি কেউ হৃদয়ের দীপমুখে সেটুকু গ্রহণ করে তবেই সে শিখা জ্বলবে—তবেই উৎসব হবে। যদি তা না হয়, যদি কেবল দস্তুর রক্ষা করা হয়, এ যদি কেবল পঞ্জিকার জিনিস হয়, তবে সমস্ত অন্ধকার: এখানে একটি দীপও তবে জ্বলে নি। সেইজন্য বলছি এ দলের উৎসব নয়, এ হৃদয়ের ভিতরকার ভক্তির উৎসব। আমরা লোক ডেকে আলো জ্বালাতে পারি, কিন্তু লোক ডেকে তো সুধারসের উৎসকে উৎসারিত করতে পারি না। যদি আজ কোনো জায়গায় ভক্তের কোনো-একটি আসন পাতা হয়ে থাকে, এ সভার প্রান্তে যদি ভক্তের হৃদয় জেগে থাকে, তবেই সার্থক হয়েছে এই প্রদীপ জ্বালা; সার্থক হয়েছে এই সংগীতের ধ্বনি, এই-সমস্ত উৎসবের আয়োজন।

এ উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী, পথের ধারের কোনো পান্থ-শালাতে আমরা বদ্ধ নই। কোনো বাঁধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব হয় না— চলার পথে উৎসব, চলতে চলতে উৎসব। এ উৎসব কবে আরম্ভ হয়েছে? যেদিন এই পৃথিবীতে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেছি সেই দিন থেকে এই আনন্দ-উৎসবের আমন্ত্রণ পেঁচেছে— সেই আহ্বানে সেই দিন থেকে পথে বেরিয়েছি। সেই যাত্রীর সঙ্গে সেই দিন থেকে তুমি যে সহযাত্রী, তাই তো যাত্রীর উৎসব জমেছে। মনে হয়েছিল যে পথে চলছি সে সংসারের পথ; তার মাঝে সংসার, তার শেষে সংসার; তার লক্ষ্য ধনমান, তার অবসান মৃত্যুতে। কিন্তু, না, পথ তো কোথাও ঠেকে না; সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়। তুমি সহযাত্রী, তার দক্ষিণ হাত ধরে কত সংকটের মধ্য দিয়ে, সংশয়ের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, তাকে পাশে নিয়ে চলেইছ; কোনো-কিছুতে এসে থামতে দাও নি। সে বিদ্রূপ করেছে, বিরুদ্ধতা করেছে, কিন্তু তুমি তার দক্ষিণ হাত ছাড় নি। তুমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছ; তুমি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছ সেই অনন্ত মনুষ্যত্বের বিরাট রাজপথে, সেখানে সমস্ত যাত্রীর দল চিরজীবনের তীর্থে চলেছে। ইতিহাসের সেই প্রশস্ত রাজপথে কী আনন্দ-কোলাহল, কী জয়ধ্বনি! সেই তো উৎসবের আনন্দধ্বনি। তুমি বদ্ধ কর নি, তুমি বদ্ধ হতে দেবে না। তুমি কেনো মতের মধ্যে, প্রথার মধ্যে মানুষকে নজরবন্দি করে রাখবে না। তুমি বলেছ, 'মাভৈঃ! যাত্রীর দল বেরিয়ে পড়ো।' কেন ভয় নেই? কিসে নির্ভয়? তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে চলছ। তাই তো যে চলছে সে কেবলই তোমাকে পাচ্ছে। যে চলছে না সে আপনাকেই পাচ্ছে, আপনার সম্প্রদায়কেই পাচ্ছে।

অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেছেন তিনি কবে চলবে ব'লে কারো জন্যে অপেক্ষা করবেন না। যে বসে রয়েছে সে কি দেখতে পাচ্ছে না তার বন্ধন? সে কি জানে না যে এই বন্ধন না খুলে ফেললে সে মুক্ত হবে না, সে সত্যকে পাবে না? সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেছি, এমন কথা কে বলে! অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে! তুমি যত বড়ো মুগ্ধ হও-না কেন, তোমার মোহ-অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেলবে এত বড়ো স্পর্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে!

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চলতে বাধা দিয়েছি; তাকে বলেছি, 'তোমার আসন এইটুকুর মধ্যে, এর বাহিরে নয়। তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ো না, তুমি সমুদ্র পেরিয়ো না।' সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব, মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর—এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ

করবেন না! মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে, সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না! তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন! তিনি কি বলতে পারেন যে তিনি বন্দী! তিনি এ কথা বললে সংসারকে কে বাঁচাবে! তিনি বলেছেন, 'সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত।' এই উদ্‌বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র—এখনই নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে; অনন্তকাল জাগ্রত থেকে তারা সেই জ্যোতির্ময় মন্ত্র উচ্চারণ করছে, জপ করছে এই মন্ত্র সেই চিরজাগ্রত তপস্বীরা। জাগ্রত হও, জাগ্রত হও। প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখবার চেষ্টা কোরো না। সত্য তা হলে নিদারুণ হয়ে উঠবে—যে লোহার শৃঙ্খল তার হাতকে বাঁধবে সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি? সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি? অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন—বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে। বসে থাকবার নয়, কোণের মধ্যে তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকবার নয়—চলবার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের সেই উৎসব সেই সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধিত হবার উৎসব।

আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি। কালের স্রোতে ডুবল না 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—অন্ত নেই, তার অন্ত নেই। অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের তলে একদিন আমাদের পিতামহ এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। সেই-যে মুক্তির আনন্দঘোষণার উৎসব সে কি এই ঘরের কোণে বসে আমরা কজনে সম্পন্ন করব এই কলকাতা শহরের এক প্রান্তে? ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই মুক্তির উৎসবের আনন্দধ্বনি বেজে উঠবে না? এই মুক্তির বাণীকে আমাদের পিতামহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন? এই অনন্ত আকাশের জ্যোতির ভিতর থেকে একে তিনি পেয়েছেন; বিশ্বের মর্মকুহর থেকে এই মুক্তিমন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। এই-যে মুক্তির মন্ত্র আগুনের ভাষায় আকাশে গীত হচ্ছে সেই আগুনকে তাঁরা এই ক'টি সহজ বাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই বাণী আমরা ভুলব! আর, বলব সত্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ইতিহাসের জীর্ণ দেয়ালে, ভাঙা ঘড়ির কাঁটার মতো চিরদিনের জন্য থেমে গেছে! গৌরব করে বলব আমাদেরই দেশে সচল সত্য অচল পাথর হয়ে গেছে—বুকের উপরে সেই জগদ্দল পাথরের ভার আমরা বইছি! না, কখনোই না। উদ্‌বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজছে—যাত্রী, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। ভেঙে

ফেলো তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে চলো যারা চন্দ্র সূর্য তারার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে ফেলে চলছে।

সন্ধ্যার উদ্‌বোধন
১১ মাঘ ১৩২১

মাধুর্যের পরিচয়

আমাদের মন্ত্রে আছে : পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। তুমি আমাদের পিতা, তুমি পিতা আমাদের এই বোধ দাও। এই পিতার বোধ আমাদের অন্তঃকরণে সজাগ নেই বলে আমাদের যেমনই ক্ষতি হোক, পিতার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের দিক দিয়ে তাঁর কাজ সমানই চলেছে। আমাদের বোধের অসম্পূর্ণতাতে তাঁর কোনো ব্যাঘাত হয় নি। তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানের মধ্যে চৈতন্য ও প্রাণ প্রেরণ করেছেন— তাঁর পিতৃত্ব মানবসমাজে কাজ করেই চলেছে।

কিন্তু, এক জায়গায় তিনি সুপ্ত হয়ে আছেন— তিনি যেখানে আমাদের প্রিয়তম সেখানে তিনি জাগেন নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রেম উদ্‌বোধিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি— এ কথা আমি জানলুম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম এ কথা সত্য। এ বললে স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ ঘটে— কারণ তিনি যদি প্রিয়তম তবে তাঁকে ভালোবাসি না কেন? কিন্তু, তা বললে কী হবে! তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন? কত মানুষের ভিতরে জীবনের তৃপ্তির সন্ধান করা গেল, ধনমানের পিছনে পিছনে মরীচিকার সন্ধানে ফেরা গেল— মন ভরল না। সে কেঁদে বলল, 'জীবন ব্যর্থ হল; এমন একটি এককে পেলুম না যার কাছে সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে পারি, দ্বিধা-সংশয়ের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে পারি।' ক্ষণে ক্ষণে এ মানুষকে, ও মানুষকে আশ্রয় করলুম— কিন্তু, জীবনের সেই-সব প্রেমের বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলিকে ভরে তুলবে কেমন করে! কোন্‌ মাধুর্যের প্লাবনে ছেদগুলো সব ভরে যাবে! এমন একের কাছে আপনাকে নিবেদন করি নি বলেই এত বেদনা পাচ্ছি। তিনি যে আমার প্রিয়তম এই কথাটা জানলুম না বলেই এত দুঃখ আমার। তিনি সত্যই প্রিয়তম বলেই যা পাচ্ছি তারই মধ্যে দুঃখ রয়ে যাচ্ছে— তাতে প্রেম চরিতার্থ হচ্ছে কই! আমরা সব সন্ধানের মধ্যে এককেই খুঁজছি, এমন-কিছুকে খুঁজছি যা সব বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দেবে। জ্ঞান কি জোড়া দিতে পারে? জ্ঞান একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুকে একবার মিলিয়ে দেখে, একবার

বিশ্লেষ করে দেখে। বিরোধকে মেটাতে পারে প্রেম, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে প্রেম। বৈচিত্র্যের এই মরুভূমির মধ্যে আমাদের তৃষ্ণা কেবলই বেড়ে উঠতে থাকে— জ্ঞান সেই বৈচিত্র্যের অন্তহীন সূত্রকে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে মারবে, সে তৃষ্ণা মেটাবে কেমন করে! সেই প্রেম না জাগা পর্যন্ত কী ঘোরাটাই ঘুরতে হয়! একবার ভাবি ধনী হই—ধনে বিচ্ছিন্নতা ভরে দেবে, সোনায় রুপোয় সব পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু, সোনায় রুপোয় সে ফাঁক কি ভরতে পারে? খ্যাতি-প্রতিপত্তি, মানুষের উপরে প্রভাব বিস্তার, কিছু দিয়েই সেই ফাঁক ভরে না। প্রেমে সব ফাঁক ভরে যায়, সব বৈচিত্র্য মিলে যায়। মানুষ যে তার সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে কেবলই সেই প্রেমকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সত্যই যে তার প্রিয়তম। সত্য যদি প্রিয়তম না হবেন তবে তাঁর বিরহে মানুষ কি এমন করে লুটিয়ে পড়ত! যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে যায় সে যখন শূন্য হয়ে যায় তখন মানুষের সেই বেদনার মতো বেদনা আর কী আছে! মানুষ তাই একান্তমনে এই কামনাই করছে, 'আমার সকল প্রেমের মধ্যে সেই একের প্রেমরস বর্ষিত হোক, আমার সব রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে যাক।' মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে পাত্রের মতো ক'রে তাঁর প্রেমের অমৃতে পূর্ণ ক'রে মানুষ পান করতে চায়। অন্তরাত্মার এই কামনা এই সাধনা, এই ক্রন্দন। কিন্তু, অহমের কোলাহলে এ কান্না তার নিজের কানেই পৌঁচচ্ছে না। প্রতিবারেই সে মনে করছে, 'বড্ড ঠকেছি, আর ঠকা নয়। এবার যা চাচ্ছি তাতেই আমার সব অভাব ভরে যাবে।' হায় রে, সে অভাব কি আর কিছুতে ভরে! এমন মোহান্ধ কেউ নেই যার আত্মা পরম বিরহে এই বলে কাঁদছে না 'প্রিয়তম জাগলেন না'। ফুলের মালা টাঙানো হয়েছে, বাতি জ্বালানো হয়েছে, সব আয়োজন পূর্ণ— শুধু তাঁকে ডাকলুম না, তাঁকে জাগালুম না।

যেখানে তিনি পিতামাতা সেখানে তিনি অন্নপান দিচ্ছেন, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখছেন। মায়ের ভান্ডার তো খোলা রয়েছে— ধরণীর ভোজে মা পরিবেশন করছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে সব দিচ্ছেন। সেখানে কোনো বাধা নেই। কিন্তু যখন জগতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি 'এত সৌন্দর্য কেন? এত ফুল ফুটল কেন? আকাশে এত তারার প্রদীপ জ্বলল কেন? জীবনে মাঝে মাঝে বসন্তের দক্ষিনে হাওয়া যৌবনের মর্মরধ্বনি জাগিয়ে তোলে কেন?' তখন বুঝি যে, প্রিয়তম জাগলেন না— তাঁরই জাগার অপেক্ষায় যে এত আয়োজন।

তাই আমি আমার অন্তরাত্মাকে যা কিছু এনে দিচ্ছি সে সব পরিহার করছে; সে বলছে, 'এ নয়, এ নয়, এ নয়! আমি আমার প্রিয়তমকে চাই। আমি তাঁকে না পেয়েই তো পাপে লুটোচ্ছি, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার এই দাহ সহ্য করছি, আমি চারি দিকে আমার অশান্ত প্রবৃত্তি নিয়ে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছি। যাঁকে পেলে সব মিলবে তাঁকে পাওয়া হয় নি বলেই এত আঘাত দিচ্ছি। যদি তাঁকে পেতুম, বলতুম আমার হয়ে গেছে— আমার দিনের পর দিন, জীবনের পর জীবন ভরে গেল।'

সমস্ত সৌন্দর্যের মাঝখানে যেদিন সেই সুন্দরকে দেখলুম, সমস্ত মাধুর্যের ভিতরে যেদিন সেই মধুরকে পেলুম, সেদিন আমার মাধুর্যের পরিচয় দেব কিসে? মাধুর্যে বিগলিত হয়ে কি পরিচয় দেব? না, মাধুর্যের পরিচয় মাধুর্যে নয়, মাধুর্যের পরিচয় বীর্যে। সেদিন মৃত্যুকে স্বীকার করে পরিচয় দেব; বলব, 'প্রিয়তম হে, মরব তোমার জন্য। আমার আর শোক নেই, ক্ষুদ্রতা নেই, ক্ষতি নেই। প্রাণের মায়া আর আমার রইল না। বলো-না তুমি প্রাণকে তোমার কোন্ কাজে দিতে হবে। তোমাকে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদে বেড়াব তা নয়, কেবল মধুর রসের গান করব তা নয় গো।' যেদিন বলতে পারব যিনি মধুর পরমমধুর, যিনি সুন্দর পরমসুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন, সেদিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দলে চলে যাব। সেদিন জানব যে, কর্মে কোনো ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোনো বাধাকে বাধা বলে মান্‌ব না। মৃত্যু সেদিন সামনে দাঁড়ালে তাকে বিদ্রূপ করে চলে যাব। সেদিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে। দেখতে হবে দুঃখকে মৃত্যুকে সে ভয় করে না। স্পর্ধা করে বীরত্ব করলে সে বীরত্ব টেঁকে না— জগৎ-ভরা আনন্দ যেদিন অন্তরে সুধাস্রোতে বয়ে যাবে সেদিন মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব সরল হবে, তার কর্ম সহজ হবে, তার ত্যাগ সহজ হবে। সেদিন মানুষ বীর। সেদিন ইচ্ছা করে সে বিপদকে বরণ করবে।

প্রিয়তম যে জাগবেন সে খবর পাব কেমন করে? গান যে বেজে উঠবে! কী গান বাজবে? সে তো সহজ গান নয়, সে যে রুদ্রবীণার গান। সেই গান শুনে মানুষ বলে উঠবে, 'সৌন্দর্যে অভিভূত হব বলে এ পৃথিবীতে জন্মাই নি। সৌন্দর্যের সুধারসে পেয়ালা ভরে তাকে নিঃশেষে পান করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলে যাব।' মাধুর্যের প্রকাশ কেবল ললিতকলায় নয়। এই সৌন্দর্যসুধার মধ্যে বীর্যের আগুন রয়েছে। মানুষ যেদিন এই সৌন্দর্য-সুধা পান করবে সেদিন দুঃখের মাথার উপর সে দাঁড়াবে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মানুষ বিষয়-বিষরসের মত্ততায় বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দ-রসকে পান করল না। সেই আনন্দের মধ্যে বীর্যের অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নিতেই সমস্ত গ্রহচন্দ্রলোক দীপ্যমান হয়ে উঠেছে— সেই বীর্যের অগ্নি মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলল না। অথচ মানুষের অন্তরাত্মা জানে যে, জগতের সুধাপাত্র পরিপূর্ণ আছে বলেই মৃত্যু এখানে কেবলই মরছে এবং জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করছে, প্রাণের কোথাও বিরাম নেই। অন্তরাত্মা জানে যে সেই সুধার ধারা জীবন থেকে জীবনান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে বয়েই চলেছে— কত যোগী, কত প্রেমী, কত মহাপুরুষ সেই সুধার ধারায় সমস্ত জীবনকে ডুবিয়ে অমৃতত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা অমৃতের পুত্র, মৃত্যুর পুত্র নও।'

কিন্তু, সে কথায় মানুষের বিশ্বাস হয় না। সে যে বিষয়ের দাসত্ব করছে

সেইটেই তার কাছে বাস্তব, আর এ-সব কথা তার কাছে শূন্য ভাবুকতামাত্র। সে তাই এ-সব কথাকে বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, অবিশ্বাস করে। যাঁরা অমৃতের বাণী এনেছেন মানুষ তাই তাঁদের মেরেছে। তাঁরা যেমন মানুষের হাতে মার খেয়েছেন এমন আর কেউ নয়, অথচ তাঁরা তো মলেন না। তাঁদের প্রাণই শত সহস্র বৎসর ধরে সজীব হয়ে রইল। কারণ, তাঁরাই যে মার খেতে পারেন; তাঁরা যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৃত্যুর দ্বারা তাঁরা অমৃতের প্রমাণ করেন। মানুষের দরজায় এসে দাঁড়ালে মানুষ তাঁদের আতিথ্য দেয় নি, আতিথ্য দেবে না— মানুষ তাঁদের শত্রু বলে জেনেছে। কারণ, আমরা আমাদের যত-কিছু মত বিশ্বাস সমস্ত পাথরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছি, ঐ-সব পাগলকে ঘরে ঢোকালে সে-সমস্ত যে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে— এই মানুষের মস্ত ভয়। মৃত্যুকে কৌটার মধ্যে পুরে লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, ওরা ঘরে এলে কি আর রক্ষা আছে! লোহার সিন্দুক ভেঙে যে মৃত্যুকে এরা বার করবে।

সেই মৃত্যুকেই তাঁরা মারতে আসেন। তাঁরা মরে প্রমাণ করেন আছে সুধা সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে। নিঃশেষে পরম আনন্দে সেই সুধার পাত্র থেকে তাঁরা পান করেন। তাঁরা প্রিয়তমকে জেনেছেন, প্রিয়তম তাঁদের জীবনে জেগেছেন।

আমাদের গানে তাই আমরা ডাকছি : প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো। কেননা, প্রিয়তম হে, তুমি জাগ নি বলেই মনুষ্যত্ববিকাশ হল না, পৌরুষ পরাহত হয়ে রইল। তোমার কণ্ঠের বিজয়মাল্য দাও পরিয়ে তুমি আমাদের কণ্ঠে— জয়ী করো সংগ্রামে। সংসারের যুদ্ধে পরাভূত হতে দিয়ো না— বাঁচাও, তোমার অমৃতপাত্র আমার মুখে এনে দাও। অপমানের মধ্যে পরাভবের মধ্যে তোমাকে ডাকছি— জাগো, জাগো, জাগো। জাগরণের আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

সন্ধ্যার উপদেশ
১১ মাঘ ১৩২১

একটি মন্ত্র

মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে, অসংখ্য। এই অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন! সে কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে! সে কত পূজার অর্ঘ্য কত বলির পশু সংগ্রহ করে মরবে! তাই মানুষ অসংখ্যের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কত ওঝা ডেকেছে, কত জাদুমন্ত্র পড়েছে তার ঠিক নেই।

একদিন সাধক দেখতে পেলেন, যা-কিছু টুকরো টুকরো হয়ে দেখা দিচ্ছে

তাদের সমস্তকে অধিকার করে এবং সমস্তকে পেরিয়ে আছে সত্যম্। অর্থাৎ, যা-কিছু দেখছি তাকে সম্ভব করে আছে একটি না-দেখা পদার্থ।

কেন, তাকে দেখি নে কেন? কেননা, সে যে কিছুর সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেবার নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রকে আপনার মধ্যে ধারণ করে সে যে এক হয়ে আছে। সে যদি হত 'একটি' তা হলে তাকে নানা বস্তুর এক প্রান্তে কোনো-একটা জায়গায় দেখতে পেতুম। কিন্তু, সে যে হল 'এক', তাই তাকে অনেকের অংশ করে বিশেষ করে দেখবার জো রইল না।

এত বড়ো আবিষ্কার মানুষ আর কোনোদিন করে নি। এটি কোনো বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার নয়, এ হল মন্ত্রের আবিষ্কার। মন্ত্রের আবিষ্কারটি কী? বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ। তাতে বলছে জগতে কোনো জিনিস একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করছে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে।

মানুষের অনেক কথা আছে যাকে জানবামাত্রই তার জানার প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যায়, তার পরে সে আর মনকে কোনো খোরাক দেয় না। রাত পোহালে সকাল হয় এ কথা বার বার চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু, যেগুলি মানুষের অমৃতবাণী সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরো বেড়ে চলে। মানুষের সেইরকম একটি অমৃতমন্ত্র কোনো-এক শুভক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কিন্তু, মানুষ সত্যকে কোথায় বা অনুভব করলে? কোথাও কিছুই তো স্থির হয়ে নেই, দেখতে দেখতে এক আর হয়ে উঠছে। আজ আছে বীজ, কাল হল অংকুর, অংকুর থেকে হল গাছ, গাছ থেকে অরণ্য। আবার সেই-সমস্ত অরণ্য স্লেটের উপর ছেলের হাতে আঁকা হিজিবিজির মতো কতবার মাটির উপর থেকে মুছে মুছে যাচ্ছে। পাহাড়-পর্বতকে আমরা বলি ধ্রুব, কিন্তু সেও যেন রঙ্গমঞ্চের পট—এক-এক অঙ্কের পর তাকে কোন্ নেপথ্যের মানুষ কোথায় যে গুটিয়ে তোলে দেখা যায় না। চন্দ্র-সূর্য-তারাও যেন আলোকের বুদ্‌বুদের মতো অন্ধকারসমুদ্রের উপর ফুটে ফুটে ওঠে, আবার মিলিয়ে মিলিয়ে যায়। এইজন্যেই তো সমস্তকে বলি সংসার; আর সংসারকে বলি স্বপ্ন, বলি মায়া। সত্য তবে কোন্‌খানে?

সত্যের তো প্রকাশ এমনি করেই, এই চিরচঞ্চলতায়। নৃত্যের কোনো-একটি ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানাখানা হয়ে উঠছে। তবু যে দেখছে সে আনন্দিত হয়ে বলছে, 'আমি নাচ দেখছি।' নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গিই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গিকেই মুখ্য করে দেখছি নে; আমরা দেখছি তার সেই সত্যটিকে, তাই খুশি হয়ে উঠছি। যে ভাঙা গাড়িটা রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে সে আপনার জড়ত্বের গুণেই পড়ে থাকে; কিন্তু যে গাড়ি চলছে

তার সারথি, তার বাহন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার চলবার পথ, সমস্তেরই পরস্পরের মধ্যে একটি নিয়তপ্রবৃত্ত সামঞ্জস্য থাকা চাই তবেই সে চলে। অর্থাৎ, তার দেশকালগত সমস্ত অংশপ্রত্যংশকে অধিকার ক'রে তাদের যুক্ত ক'রে, তাদের অতিক্রম করে যদি সত্য না থাকে তবে সে গাড়ি চলে না।

যে ব্যক্তি বিশ্বসংসারে এই কেবলই বদল হওয়ার দিকেই নজর রেখেছে সেই মানুষই হয় বলছে সমস্তই স্বপ্ন, নয় বলছে সমস্তই বিনাশের প্রতিরূপ— অতি ভীষণ! সে হয় বিশ্বকে ত্যাগ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে, নয় ভীষণ বিশ্বের দেবতাকে দারুণ উপচারে খুশি করবার আয়োজন করছে। কিন্তু, যে লোক সমস্ত তরঙ্গের ভিতরকার ধারাটি, সমস্ত ভঙ্গির ভিতরকার নাচটি, সমস্ত সুরের ভিতরকার সংগীতটি দেখতে-শুনতে পাচ্ছে সেই তো আনন্দের সঙ্গে বলে উঠছে 'সত্যম্'। সেই জানে, বৃহৎ ব্যাবসা যখন চলে তখনই বুঝি সেটা সত্য, মিথ্যা হলেই সে দেউলে হয়ে অচল হয়। মহাজনের মূলধনের যদি সত্য পরিচয় পেতে হয় তবে যখন তা খাটে তখনই তা সম্ভব। সংসারের সমস্ত-কিছু চলছে বলেই সমস্ত মিথ্যা, এটা হল একেবারেই উল্‌টো কথা ; আসল কথা, সত্য বলেই সমস্ত চলছে। তাই আমরা চারি দিকেই দেখছি সত্ত আপনাকে স্থির রাখতে পারছে না, সে আপনার কূল ছাপিয়ে দিয়ে অসীম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই সত্য পদার্থটি, যা সমস্তকে গ্রহণ করে অথচ সমস্তকে পেরিয়ে চলে, তাকে মানুষ বুঝতে পারলে কেমন করে? এ তো তর্ক করে বোঝবার জো ছিল না; এ আমরা নিজের প্রাণের মধ্যেই যে একেবারে নিঃসংশয় করে দেখেছি। সত্যের রহস্য সব চেয়ে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গেছে তরুলতায় পশুপাখিতে। সত্য যে প্রাণস্বরূপ তা এই পৃথিবীর রোমাঞ্চরূপী ঘাসের পত্রে পত্রে লেখা হয়ে বেরিয়েছে। নিখিলের মধ্যে যদি একটি বিরাট প্রাণ না থাকত তবে তার এই জগৎ-জোড়া লুকোচুরি-খেলায় সে তো একটি ঘাসের মধ্যেও ধরা পড়ত না।

এই ঘাসটুকুর মধ্যে আমরা কী দেখছি? যেমন গানের মধ্যে আমরা তান দেখে থাকি। বৃহৎ অঙ্গের ধ্রুপদ গান চলছে ; চৌতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি; যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করছে মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক-একটি ছোটো ছোটো তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। মাটির তলে জলের ধারা রহস্যে ঢাকা আছে; ছিদ্রটি পেলে সে উৎস হয়ে ছুটে বেরিয়ে আপনাকে অল্পের মধ্যে দেখা দেয়। তেমনি উদ্ভিদে পশুপাখিতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মতো ছুটে ছুটে বেরোয় সে হচ্ছে অল্প পরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।

এই প্রাণের তত্ত্বটি কী তা যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে তবে কোনো সংজ্ঞার দ্বারা তাকে আটেঘাটে বেঁধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। পৃথিবীতে তাকেই বোঝানো সব চেয়ে শক্ত যাকে আমরা সব

চেয়ে সহজে বুঝেছি। প্রাণকে বুঝতে আমাদের বুদ্ধির দরকার হয় নি, সেইজন্যে তাকে বোঝাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। আমাদের প্রাণের মধ্যে আমরা দুটি বিরোধকে অনায়াসে মিলিয়ে দেখতে পাই। এক দিকে দেখি আমাদের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল; আর-এক দিকে দেখি সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাপিয়ে, অতীতকে পেরিয়ে, বর্তমানকে অতিক্রম করে প্রাণ বিস্তীর্ণ হয়ে বর্তে আছে। বস্তুত সেই বর্তে থাকার দিকেই দৃষ্টি রেখে আমরা বলি, আমরা বেঁচে আছি। এই একই কালে বর্তে না থাকা এবং বর্তে থাকা—এই নিত্য চাঞ্চল্য এবং নিত্য স্থিতির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে তা ন্যায়শাস্ত্রেই আছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে নেই।

যখন আমরা বেঁচে থাকতে চাই তখন আমরা এইটেই তো চাই। আমরা আমাদের স্থিতিকে চাঞ্চল্যের মধ্যে মুক্তি দান করে এগিয়ে চলতে চাই। যদি আমাদের কেউ অহল্যার মতো পাথর করে স্থির করে রাখে তবে বুঝি যে, সেটা আমাদের অভিশাপ। আবার যদি আমাদের প্রাণের মুহূর্তগুলিকে কেউ চকমকিঠোকা স্ফুলিঙ্গের মতো বর্ষণ করতে থাকে তা হলে সে প্রাণকে আমরা একখানা করে পাই নে বলে তাকে পাওয়াই হয় না।

এমনি করে প্রাণময় সত্যের এমন একটি পরিচয় নিজের মধ্যে অনায়াসে পেয়েছি যা অনির্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত, যা আপনাকে আপনি কেবল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে, যা অসীমকে সীমায় আকারবন্ধ করতে করতে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে মুক্তি দিতে দিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এর থেকেই নিখিল সত্যকে আমরা নিখিলের প্রাণরূপে জানতে পারছি। বুঝতে পারছি এই সত্য সকলের মধ্যে থেকেই সকলকে অতিক্রম করে আছে বলে বিশ্বসংসার কেবলই চলার দ্বারাই সত্য হয়ে উঠছে। এইজন্য জগতে স্থিরত্বই হচ্ছে বিনাশ—কেননা, স্থিরত্বই হচ্ছে সীমায় ঠেকে যাওয়া। এইজন্যেই বলা হয়েছে : যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে।

তবে কি সমস্তই প্রাণ, আর অপ্রাণ কোথাও নেই? অপ্রাণ আছে, কেননা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, সেই অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়। প্রাণটাই হল মুখ্য, অপ্রাণটা গৌণ।

আমরা চলবার সময় যখন পা ফেলি তখন প্রত্যেক পা ফেলা একটা বাধায় ঠেকে, কিন্তু চলার পরিচয় সেই বাধায় ঠেকে যাওয়ার দ্বারা নয়, বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা। নিখিল সত্যেরও এক দিকে বাধা, আর-এক দিকে বাধামোচন। সেই বাধামোচনের দিকেই তার পরিচয়; সেই দিকেই সে প্রাণস্বরূপ; সেই দিকেই সে সমস্তকে মেলাচ্ছে এবং চালাচ্ছে।

যেদিন এই কথাটি আমরা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পেরেছি সেদিন আমাদের ভয়ের দিন নয়, ভিক্ষার দিন নয়; সেদিন কোনো উচ্ছৃঙ্খল দেবতাকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করবার দিন নয়। সেদিন বিশ্বের সত্যকে আমারও সত্য

বলে আনন্দিত হবার দিন।

সেদিন পূজারও দিন বটে। কিন্তু, সত্যের পূজা তো কথার পূজা নয়। কথায় ভুলিয়ে সত্যের কাছে তো বর পাবার জো নেই। সত্য প্রাণময়, তাই প্রাণের মধ্যেই সত্যের পূজা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি মানুষ সত্যের বর পাচ্ছে, তার দৈন্য দূর হচ্ছে, তার তেজ বেড়ে উঠছে। কোথায় দেখেছি? যেখানে মানুষের চিত্ত অচল নয় ; যেখানে তার নব নব উদ্‌যোগ ; যেখানে সামনের দিকে মানুষের গতি; যেখানে অতীতের খোঁটায় সে আপনাকে আপাদমস্তক বেঁধেছেঁদে স্থির হয়ে বসে নেই ; যেখানে আপনার এগোবার পথকে সকল দিকে মুক্ত রাখবার জন্যে মানুষ সর্বদাই সচেতন। জ্বালানি কাঠ যখন পূর্ণতেজে জ্বলে না তখন সে ধোঁয়ায় কিম্বা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে; তেমনি দেখা গেছে যে জাতি আপনার প্রাণকে চলতে না দিয়ে কেবলই বাঁধতে চেয়েছে, তার সত্য সকল দিক থেকেই ম্লান হয়ে এসে তাকে নির্জীব করে। কেননা সত্যের ধর্ম জড়ধর্ম নয়, প্রাণধর্ম ; চলার দ্বারাই তার প্রকাশ।

নিজের ভিতরকার বেগবান প্রাণের আনন্দে মানুষ যখন অক্লান্ত সন্ধানের পথে সত্যের পূজা বহন করে তখনই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তারও সৃষ্টি চারি দিকে বিচিত্র হয়ে ওঠে; তখন তার রথ পর্বত লঙ্ঘন করে, তার তরণী সমুদ্র পার হয়ে যায়, তখন কোথাও তার আর নিষেধ থাকে না। তখন সে নূতন নূতন সংকটের মধ্যে ঘা পেতে থাকে বটে, কিন্তু নুড়ির ঘা খেয়ে ঝর্নার কলগান যেমন আরো জেগে ওঠে তেমনি ব্যাঘাতের দ্বারাই বেগবান প্রাণের মুখে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আর, যারা মনে করে স্থির হয়ে থাকাই সত্যের সেবা, চলাই সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের অচলতার তলায় ব্যাধি দারিদ্র্য অপমান অব্যবস্থা কেবলই জমে ওঠে; নিজের সমাজ তাদের কাছে নিষেধের কাঁটাখেত, দূরের লোকালয় তাদের কাছে দুর্গম। নিজের দুর্গতির জন্যে তারা পরকে অপরাধী করতে চায়; এ কথা ভুলে যায় যে, যে-সব দড়িদড়া দিয়ে তারা সত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিল সেইগুলো দিয়ে তারা আপনাকে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কী তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব? যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগোতে পারলে না, সেইখানে? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কী তবে কোথায় যাব? যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয়, সেই-খানে? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে, তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেননা চলাই সত্যের ধর্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই ; কেননা, মানুষ সেখানে আপনাকে বড়ো করে দেখায়—যেখানে আজও সে পৌঁছোয় নি সেখানটিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়। তার

ভিতরকার সত্য তাকে চলার দ্বারাই জানাচ্ছে যে, সে যা তার চেয়ে সে অনেক বেশি।

তবেই দেখতে পাচ্ছি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি জানা লেগে আছে। আমাদের যে বিকাশ সে কেবল হওয়ার বিকাশ নয়, সে জানার বিকাশ। হতে থাকার দ্বারা, চলতে থাকার দ্বারাই আপনাকে আমরা জানতে থাকি।

সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞান লেগে রয়েছে, সেইজন্যেই মন্ত্রে আছে 'সত্যং জ্ঞানং'। অর্থাৎ, সত্য যার বাহিরের বিকাশ জ্ঞান তার অন্তরের প্রকাশ। যে সত্য কেবলই হয়ে উঠছে মাত্র, অথচ সেই হয়ে-ওঠা আপনাকেও জানছে না, কাউকে কিছু জানাচ্ছেও না, তাকে আছে বলাই যায় না। আমার মধ্যে জ্ঞানের আলোটি যেমনি জ্বলে অমনি যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মধ্যে সার্থক হয়। এই সার্থকতাটি বৃহৎভাবে বিশ্বের মধ্যে নেই, অথচ খণ্ডভাবে আমার মধ্যে আছে, এমন কথা মনে করতে পারে নি বলেই মানুষ বলেছে 'সত্যং জ্ঞানং'। সত্য সর্বত্র, জ্ঞানও সর্বত্র। সত্য কেবলই জ্ঞানকে ফল দান করছে, জ্ঞান কেবলই সত্যকে সার্থক করছে—এর আর অবধি নেই! এ যদি না হয় তবে অন্ধ সৃষ্টির কোনো অর্থই নেই।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই তো হল যা-কিছু—এই তো হল জগৎ। চার দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল কাজ করছে—স্বাভাবিক এই কাজ—অর্থাৎ আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলছে—এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কী জিনিস তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমরা বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলছে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না যদি সে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের যোগ একান্ত অনুভব না করত। এইজন্যই গায়ত্রীমন্ত্রে এক দিকে বাহিরের 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এবং অন্য দিকে অন্তরের ধী উভয়কেই একই পরমশক্তির প্রকাশরূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।

যেমন প্রদীপের মুখের ছোটো শিখাটি বিশ্বব্যাপী উত্তাপেরই অঙ্গ তেমনি আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের অঙ্গ, তেমনি আমার জানাও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় সূর্যকে ওজন করছে এবং বলছে, 'আমার জ্ঞানের জোরেই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে'। কিন্তু, এ জ্ঞান যদি তারই জ্ঞান হত তবে এটা জ্ঞানই হত না; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারছে। মানুষ অহংকার ক'রে বলে, 'আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্ছি।' কিন্তু, তার

এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পাও চলতে পারত না।

সেইজন্যে যেদিন মানুষ বললে 'সত্যং' সেইদিনই একই প্রাণময় শক্তিকে আপনার মধ্যে এবং আপনার বাহিরে সর্বত্র দেখতে পেলে। যেদিন বললে 'জ্ঞানং' সেইদিন সে বুঝলে যে, সে যা-কিছু জানছে এবং যা-কিছু ক্রমে জানবে সমস্তই একটি বৃহৎ জানার মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এইজন্যই আজ তার এই বিপুল ভরসা জন্মেছে যে তার শক্তির এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবলই বেড়ে চলবে, কোথাও সে থেমে যাবে না। এখন সে আপনারই মধ্যে অসীমের পথ পেয়েছে, এখন তাকে আর যাগযজ্ঞ জাদুমন্ত্র পৌরোহিত্যের শরণ নিতে হবে না। এখন তার প্রার্থনা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

অসত্যের জড়তা থেকে চিরবিকাশমান সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ত চালনা করো, অন্ধকার হতে আমার জ্ঞানের আলোক উন্মীলিত হতে থাক্।

আমাদের মন্ত্রের শেষ বাক্যটি হচ্ছে : অনন্তং ব্রহ্ম। মানুষ আপনার সত্যের অনুভব সত্যকে সর্বত্র দেখছে, আপনার জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানকে সর্বত্র জানছে, তেমনি আপনার আনন্দের মধ্যে মানুষ অনন্তের যে পরিচয় পেয়েছে তারই থেকে বলেছে : অনন্তং ব্রহ্ম।

কোথায় সেই পরিচয়? আমাদের মধ্যে অনন্ত সেখানেই যেখানে আমরা আপনাকে দান করে আনন্দ পাই। দানের দ্বারা যেখানে আমাদের কেবলমাত্র ক্ষতি সেইখানেই আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের সীমা, সেখানে আমরা কৃপণ। কিন্তু, সমস্ত দানই যেখানে আমাদের লাভ, ত্যাগই যেখানে আমাদের পুরস্কার, সেখানেই আমরা আমাদের ঐশ্বর্যকে জানি, আমাদের অনন্তকে পাই। যখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই আমরা চরম বলে জানি তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাই নে ; সমস্ত উপকরণকে তখন দু হাতে আঁকড়ে ধরি ; মনে করি বস্তুপুঞ্জের যোগেই আমরা সত্য হব, বড়ো হব। আর, যখনই কোনো বৃহৎ প্রেম বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখনই আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়। তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। এইজন্য মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়; আমাদের সমস্ত নিত্যকীর্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। তাই মানুষ বলেছে : ভূমৈব সুখম্। ভূমাই আমার সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই আমার জানতে হবে। নাল্পে সুখমস্তি। অল্পে আমার সুখ নেই।

এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না। এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম বলে

শেখায় সে সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না; এইজন্যই সে সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানি নে যখন তাকে আমরা ছোটো করে জানি। মানুষ সম্বন্ধে যেখানে আমাদের জ্ঞান কৃত্রিম সংস্কারের ধূলিজালে আবৃত সেখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। সেখানে কৃপণ মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র বলতে, অক্ষম বলতে লজ্জা বোধ করে না। সত্যকে মতে মানি, কিন্তু কাজে করতে পারি নে, এ কথা স্বীকার করতে সেখানে সংকোচ ঘটে না। সেখানে মঙ্গল অনুষ্ঠানও বাহ্য-আচারগত হয়ে ওঠে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এইজন্যই 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'। ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না। সমাজের মধ্যে যখন সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে তখন মানুষ, আনন্দরূপমমৃতং, আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রদীপের শিখার মতো আত্মদানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি। এই কথাটি আপনার মধ্যে নানা আকারে প্রত্যক্ষ করে মানুষ অনন্তস্বরূপকে বলেছে 'আত্মদা'। তিনি আপনাকে দান করছেন, সেই দানেই তাঁর পরিচয়।

এইবার আমাদের মন্ত্রটি একবার দেখে নিই। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যনিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে? তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এইজন্যই সত্য গতিমান। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে কোনো সীমায় এসে সে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন— এইজন্যই মন্ত্রের এক প্রান্তে 'সত্যং' আর-এক প্রান্তে 'অনন্তং ব্রহ্ম', তারই মাঝখানে 'জ্ঞানং'।

এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে, কিন্তু সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা, সেই সীমা ঐকান্তিক-রূপে কোথাও নেই; তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই; তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরাজ করছেন না। এইজন্য ব্রহ্ম, সীমা এবং সীমাহীনতা দুইয়েরই অতীত; তাঁর মধ্যে রূপ এবং অরূপ দুইই সংগত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে 'বলদা', তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্বসত্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে; আবার 'আত্মদা', সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটে নি—সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্ছেন— এমনি করেই সসীম অসীমের, অরূপ সরূপের অপরূপ মিলন ঘটে গেছে—'সত্যং' এবং 'অনন্তং' অনির্বচনীয়রূপে পরস্পরের যোগে একই কালে প্রকাশমান হচ্ছে।

তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে, সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে। তাই ভক্ত ও ভগবানের আনন্দমিলনের মধ্যে আমরা সসীম ও অসীমের এই বিশ্বব্যাপী প্রেমলীলার চিররহস্যটিকে ছোটোর মধ্যে দেখতে পাই : এই রহস্যটি রবি চন্দ্র তারার পর্দার আড়ালে নিত্যকাল চলেছে ; এই রহস্যটিকে বুকের ভিতরে নিয়ে বিশ্বচরাচর রসবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যের সঙ্গে অনন্তের এই নিত্যযোগ লোকস্থিতির শান্তিতে, সমাজস্থিতির মঙ্গলে ও জীবাত্মাপরমাত্মার একাত্ম মিলনে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' রূপে প্রকাশমান হয়ে উঠছে। এই শান্তি জড়ত্বের নিশ্চল শান্তি নয়, সমস্ত চাঞ্চল্যের মর্মনিহিত শান্তি ; এই মঙ্গল দ্বন্দ্ববিহীন নির্জীব মঙ্গল নয়, সমস্ত দ্বন্দ্বমন্থনের আলোড়নজাত মঙ্গল; এই অদ্বৈত একাকারত্বের অদ্বৈত নয় সমস্ত বিরোধ-বিচ্ছেদের সমাধানকারী অদ্বৈত। কেননা, তিনি 'বলদা আত্মদা'; সত্যের ক্ষেত্রে শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কেবলই আপনাকে দান করছেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—এই মন্ত্রটি তো কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়, এটিকে প্রতি দিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

সেই সাধনাটি কী? আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধা-বশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে, সেইটে দূর করে দিতে থাকা।

এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সংকীর্ণ পথেই চালাতে চায়। তখন আমাদের কর্মের মধ্যে শান্তকে পাই নে, আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে শিবের অভাব ঘটে এবং আত্মার মধ্যে অদ্বৈতের আনন্দ থাকে না। কেননা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। অনন্তের সঙ্গে যোগে তবেই সত্য জ্ঞানময় হয়ে ওঠে. তবেই আমাদের জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। যাদের জীবন বেগে চলছে, অথচ কেবলমাত্র আপনাকেই কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই চলা, সেই বলক্রিয়া কলুর বলদের চলার মতো; তা স্বাভাবিক নয়; তা জ্ঞানময় নয়।

আবার যারা জীবনের সত্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে অনন্তকে কর্মহীন সন্ন্যাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে কিম্বা ভাবরসের মাদকতায় উপভোগ করতে চায় তাদেরও এই ধ্যানের কিম্বা রসের সাধনা বন্ধ্যা। তাদের চেষ্টা হয় শূন্যকেই দোহন করতে থাকে, নয় নিজের কল্পনাকেই সফলতা বলে মনে করে। যাদের জীবন সত্যের চিরবিকাশপথে চলছে না, কেবল শূন্যতাকে বা রসভোগবিহ্বল নিজের মনটাকেই বারে বারে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই অন্ধ সাধনা হয় জড়ত্ব নয় প্রমত্ততা।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রটিকে যদি গ্রহণ করি তবে আমাদের মনকে প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য ও অহংকারের ঔদ্ধত্য থেকে নির্মুক্ত করবার জন্যে একান্ত চেষ্টা করতে হবে; তা না হলে আমাদের কর্মের কলুষ এবং জ্ঞানের

বিকার কিছুতেই ঘুচবে না। আমাদের যে অহং আজ মাথা উঁচু করে আমাদের সত্য এবং অনন্তের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়ে অজ্ঞানের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সে যখন প্রেমে বিনম্র হয়ে তার মাথা নত করতে পারবে তখন আমাদের জীবনে সেই অহংই হবে সসীম ও অসীমের মিলনের সেতু; তখন আমাদের জীবনে তারই সেই নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। যখন সুখদুঃখের চাঞ্চল্য আমাদের অভিভূত করবে তখন এই শান্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মান অপমান তরঙ্গদোলায় আমাদের ক্ষুব্ধ করতে থাকবে তখন এই মঙ্গলমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন কল্যাণের আহ্বানে দুর্গম পথে প্রবৃত্ত হবার সময় আসবে তখন এই অভয়মন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন বাধা প্রবল হয়ে উঠে সেই পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে তখন এই শক্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে ; সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মৃত্যু এসে প্রিয়বিচ্ছেদের ছায়ায় আমাদের জীবনযাত্রার পথকে অন্ধকারময় করে তুলবে তখন এই অমৃতমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আমাদের জীবনগত সত্যের সঙ্গে আনন্দময় ব্রহ্মের যোগ পূর্ণ হতে থাক্; তা হলেই আমাদের জ্ঞান নির্মল হয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ হতে, মত্ততা হতে, অবসাদ হতে রক্ষা করবে। নদী যখন চলতে থাকে তখন তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি কলসংগীত বাজে আমাদের জীবন তেমনি প্রতি ক্ষণেই মুক্তির পথে সত্য হয়ে চলুক, যাতে তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই অমৃতবাণীটি সংগীতের মতো বাজতে থাকে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যিনি বিশ্বরূপে আপনাকে দান করছেন তাঁকে প্রতিদানরূপে আত্মনিবেদন করব, সেই নিত্য-মালা-বদলের আনন্দমন্ত্রটি হোক : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আর, আমাদের জীবনের প্রার্থনা হোক—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

জড়তা হতে আমাদের সত্যে নিয়ে যাও, মূঢ়তা হতে আমাদের জ্ঞানে নিয়ে যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হতে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও।

অবিরাম হোক সেই তোমার নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি। কেননা, তুমি 'আবিঃ', প্রকাশই তোমার স্বভাব; বিনাশের মধ্যে তোমার আনন্দ আপনাকে বিলুপ্ত করে না, বিকাশের মধ্যে দিয়ে তোমার আনন্দ আপনাকে বিস্তার করে। তোমার সেই পরমানন্দের বিকাশ আমাদের জীবনে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, আমাদের গৃহে সমাজে দেশে, বাধামুক্ত হয়ে প্রসারিত হোক! জয় হোক তোমার!

১৫ মাঘ ১৩২০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে
পঠিত

উদ্‌বোধন

আজ আমাদের আশ্রমের এই বিশেষ দিনে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হোক। সংসারের মধ্যে আমাদের যে উৎসবের দিন আসে সে দিন অন্য দিন থেকে স্বতন্ত্র, প্রতিদিনের সঙ্গে তার সুর মেলে না। কিন্তু, আমাদের এই উৎসবের দিনের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগ আছে; এ যেন মোতির হারের মাঝখানে হীরার দোলক। যোগ আছে, আবার বিশেষত্বও আছে। কেননা, ঐ বিশেষত্বের জন্যে মানুষের একটু আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষ এক-একদিন প্রতিদিনের জীবন থেকে একটু সরে এসে তার আনন্দের আস্বাদ পেতে চায়। যেজন্যে আমরা ঘরের অন্নকে একটু দূরে নিয়ে খাবার জন্যে বনভোজনে যাই। প্রত্যহের সামগ্রীকেই তার অভ্যাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু নূতন করে পেতে চাই। তাই, আজ আমরা আমাদের আশ্রমের অন্নকে একটু সরে এসে একটু বিশেষ করে ভোগ করবার জন্যে আয়োজন করেছি।

কিন্তু, বনভোজনের আয়োজনে যখন খাদ্যসামগ্রী দূরে এবং একটু বড়ো করে বয়ে নিয়ে যেতে হয় তখন আমাদের ভাঁড়ারের হিসাবটা মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ে যায়। যদি প্রতিদিন অপব্যয় হয়ে থাকে তা হলে সেদিন দেখব টানাটানি পড়ে গেছে।

আজ আমাদের অমৃত-অন্নের বনভোজনের আয়োজনে হয়তো অভাব দেখতে পাব। যদি পাই তবে সেই অন্তরের অভাবকে বাইরের কী দিয়েই বা ঢাকা দেব। যারা শহরে থাকে তাদের সাজসরঞ্জামের অভাব নেই, তাই দিয়েই তারা তাদের উৎসবের মানরক্ষা করতে পারে। আমাদের এখানে সে-সমস্ত উদ্‌যোগের পথ বন্ধ। কিন্তু, ভয় নেই। প্রতিদিনই আমাদের আশ্রমের উৎসবের বায়না দেওয়া গেছে। এখানকার শালবনে পাখির বাসায়, এখানকার প্রান্তরের আকাশে বাতাসের খেলার প্রাঙ্গণে, প্রতিদিনই আমাদের উৎসবের সুর কিছু-না-কিছু জমেছে। কিন্তু, প্রতিদিনের অন্যমনস্কতায় সেই রোশনচৌকি ভালো করে প্রাণে পৌঁছয় নি। আজ আমাদের অভ্যাসের জড়তাকে ঠেলে দিয়ে একবার মন দিতে পারলেই হয়, আর কিছু বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে না। চিত্তকে শান্ত করে বসি; অঞ্জলি করে হাত পাতি, তা হলে মধুবনের মধুফল আপনিই হাতে এসে পড়বে। যে আয়োজন চারি দিকে আপনিই হয়ে আছে তাকেই ভোগ করাই যে আমাদের উৎসব। প্রতিদিন ডাকি নি বলেই যাঁকে দেখি নি আজ মনের সঙ্গে ডাক দিলেই যে তাঁকে দেখতে পাব। বাইরের উত্তেজনায় ধাক্কা দিয়ে মনকে চেতিয়ে তোলা, তাতে আমাদের দরকার নেই। কেননা, তাতে লাভ নেই, বরঞ্চ শক্তির ক্ষয় হয়।

গাছের ভিতরের রসে যখন বসন্তের নাড়া পায় তখনই ফুল ফোটে, সেই ফুলই সত্য। বাইরের উত্তেজনায় যে ক্ষণিক মোহ আনে সে কেবল মরীচিকা; তাতে যেন না ভুলি। আমাদের ভিতরকার শক্তিকে উদ্‌বোধিত করি। ক্ষণকালের জন্যেও যদি তার সাড়া পাই তখন তার সার্থকতা চিরদিনের। যদি মুহূর্তের জন্যও আমরা সত্য হতে পারি তবে সে সত্য কোনোদিন মরবে না; সেই অমৃতবীজ চিরকালের মতো আমাদের চিরজীবনের ক্ষেত্রে বোনা হয়ে যাবে। যে পুণ্য হোমাগ্নি বিশ্বের যজ্ঞশালায় চিরদিন জ্বলছে তাতে যদি ঠিকমতো করে একবার আমাদের চিত্তপ্রদীপের মুখটুকু ঠেকিয়ে দিতে পারি তা হলে সেই মুহূর্তেই আমাদের শিখাটুকু ধরে উঠতে পারে।

সত্যের মধ্যে আজ আমাদের জাগরণ সম্পূর্ণ হোক, এই প্রভাতের আলোক আজ আমাদের আবরণ না হোক, আজ চিরজ্যোতি প্রকাশিত হোন, ধরণীর শ্যামল যবনিকা আজ যেন কিছু গোপন না করে— আজ চিরসুন্দর দেখা দিন। শিশু যেমন মাকে সম্পূর্ণভাবে আলিঙ্গন করে তেমনি করেই আজ সেই পরমচৈতন্যের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের মিলন হোক। যেমন কবির কাব্য পাঠ করবার সময় তাঁর ছন্দ ও ভাষার ভিতর দিয়ে কবির আনন্দের মধ্যে গিয়ে আমাদের চিত্ত উপনীত হয় তেমনি করে আজ এই শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ নির্মল বিশ্বশোভার অন্তরে সেই বিশ্বের আনন্দকে যেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করি।

৭ পৌষ ১৩২০

মুক্তির দীক্ষা

আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভিতরকার তত্ত্বটি কী তাই আজ আমাদের বিশেষ করে জানবার দিন। যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁরই দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক। আজকের এই উৎসবটি তাঁর জন্মদিনের বা মৃত্যুদিনের উৎসব নয়। তাঁর দীক্ষাদিনের উৎসব। তাঁর এই দীক্ষার কথাই এই আশ্রমের ভিতরকার কথা।

সকলেই জানেন যে, এক সময়ে যখন তিনি যৌবনবয়সে বিলাসের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর অন্তরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হল। সেই বেদনার আঘাতে চারি দিক থেকে আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল। যে সত্যের জন্যে তাঁর হৃদয় লালায়িত হল তাকে তিনি কোথায় পাবেন, তাকে কেমন করে পাবেন, এই ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার চারি দিকে যে-সকল অভ্যাস রয়েছে, যে-সব প্রথা চিরকাল চলে আসছে, তারই মধ্যে বেশ আরামে থাকে— যতক্ষণ পর্যন্ত

ভিতরে যে সত্য রয়েছে তা তার অন্তরে জাগ্রত না হয়—ততক্ষণ তার এই বেদনাবোধ থাকে না। যেমন, যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন ছোটো খাঁচায় ঘুমোলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু জেগে উঠলে আর সেই খাঁচার মধ্যে থাকতে পারি না। তখন সংকীর্ণ জায়গাতে আর আমাদের কুলোয় না। ধনমান যখন আমাদের বেষ্টন করে থাকে তখন তো আমাদের কোনো অভাব বোধ হয় না। আমরা সংসারে বেশ আরামে আছি এই মনে করেই নিশ্চিন্ত থাকি। শুধু ধনমান কেন, পুরুষানুক্রমে যে-সব বিধিব্যবস্থা আচারবিচার চলে আসছে তার মধ্যেও নিবিষ্ট থাকলে মনে হয় 'এ বেশ—আর নতুন করে কোনো চিন্তা বা চেষ্টা করবার দরকার নেই।' কিন্তু, একবার যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগ্রত হলে দেখতে পাই যে সংসারই মানুষের শেষ জায়গা নয়। আমরা যে ধুলোয় জন্মে ধুলোয় মিশব তা নয়। জীবন-মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড়ো আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উদ্‌বোধিত হলে বলে ওঠে, 'কী হবে আমার এই চিরকালের অভ্যাস নিয়ে, আচার নিয়ে! এ তো আমার নয়। এতে আরাম আছে, এতে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, এতেই সংসার চলে যাচ্ছে তা জানি। কিন্তু, এ আমার নয়।' সংসারের পনেরো-আনা লোক যেমন ধনমানে বেষ্টিত হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আছে, তেমনি যে-সমস্ত আচারবিচার চলে আসছে তারও মধ্যে তারা আরামে রয়েছে। কিন্তু, একবার যদি কোনো আঘাতে এই আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় অমনি মনে হয়, এ কী কারাগার! এ আবরণ তো আশ্রয় নয়।

এক-একজন লোক সংসারে আসেন যাঁদের কোনো আবরণে আবদ্ধ করতে পারে না। তাঁদের জীবনেই বড়ো বড়ো আঘাত এসে পৌঁছয় আবরণ ভাঙবার জন্যে—এবং তাঁরা সংসারে যাকে অভ্যস্ত আরাম বলে লোকে অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত থাকে তাকে কারাগার বলেই নির্দেশ করেন। আজ যাঁর কথা বলছি তাঁর জীবনে সেই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পরিবারে ধনমানের অভাব ছিল না, চিরাগত প্রথা সেখানে আচরিত হত। কিন্তু, এক মুহূর্তেই মৃত্যুর আঘাতে তিনি যেমনি জাগলেন অমনি বুঝলেন যে এর মধ্যে শান্তি নেই। তিনি বললেন, আমার পিতাকে আমি জানতে চাই। দশজনের মতো করে তাঁকে জানতে চাই না, তাঁকে জানতে পারি না।' সত্যকে তিনি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চেয়েছিলেন; দশজনের মুখের কথায়, শাস্ত্রবাক্যে, আচারে বিচারে তাঁকে জানবার চেষ্টাকে তিনি পরিহার করেছিলেন। সেই-যে তাঁর উদ্‌বোধন, সে প্রত্যক্ষ সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধন, সেই প্রথমযৌবনের প্রারম্ভে যে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ সে মুক্তির দীক্ষা-গ্রহণ। যেদিন পক্ষীশাবকের পাখা ওঠে সেইদিনই পক্ষীমাতা তাকে উড়তে শেখায়। তেমনি তারই দীক্ষার দরকার যার মুক্তির দরকার। চারি দিকের জড় সংস্কারের আবরণ থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন।

তাঁর কাছে সেই মুক্তির দীক্ষা নেব বলেই আমরা আশ্রমে এসেছি। ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের স্বাধীন মুক্ত যোগ সেইটে আমরা এখানে উপলব্ধি করব; যে-সব কাল্পনিক কৃত্রিম ব্যবধান তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ

হতে দিচ্ছে না তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব। যেটা কারাগার তার পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকাটি যদি সোনার শলাকা হয় তবু সে কারাগার, তার মধ্যে মুক্তি নেই। এখানে আমাদের সকল কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। এখানে মুক্তির সেই দীক্ষা নেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সেই দীক্ষাটিই যে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

তাই আমি বলছি যে, এ আশ্রম— এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই। মানস-সরোবরে যেমন পদ্ম বিকশিত হয় তেমনি এই প্রান্তরের আকাশে এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে, একে কোনো সম্প্রদায়ের বলতে পারবে না। সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তা কোনো নামকে পাই না। কতবার কত মহা-পুরুষ এসেছেন— তাঁরা মানুষকে এই-সব কৃত্রিম সংস্কারের বন্ধন থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু, আমরা সে কথা ভুলে গিয়ে সেই বন্ধনেই জড়াই. সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করি। যে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি তাই দিয়ে তাকে নতুন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পুজো শুরু করে দিই। বলি, আমার বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজভুক্ত যে-সকল মানুষ তারাই আমার ধর্মবন্ধু, তারাই আমার আপন। না, এখানে এ আশ্রমে আমাদের এ কথা বলবার কথা নয়। এখানে এই পাখিরাই আমাদের ধর্মবন্ধু, যে সাঁওতাল বালকেরা আমাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়ত জাগ্রত করছে তারাই আমাদের ধর্মবন্ধু। আমাদের এই আশ্রম থেকে কেউ নাম নিয়ে যাবে না। স্বাস্থ্যলাভ করলে, বিদ্যালাভ করলে, মানুষের নাম যেমন বদলায় না, তেমনি ধর্মকে লাভ করলে নাম বদলাবার দরকার নেই। এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

বাইরের ক্ষেত্রে মহর্ষি আমাদের সবাইকে কোন্ বড়ো জিনিস দিয়ে গিয়েছেন? কোনো সম্প্রদায় নয়, এই আশ্রম। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে, দলের পুজো থেকে, আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব— এই-জন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে, যে-কোনো সমাজ থেকে, যেই আসুক-না কেন, তাঁর পুণ্যজীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ-দেশান্তর দূর-দূরান্তর থেকে যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।

যে মুক্তির বাণী তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গিয়েছিলেন তাকেই আমরা গ্রহণ করব— সেই তাঁর দীক্ষামন্ত্রটি : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখো। সেই মন্ত্রে তাঁর মন উতলা হয়েছিল। সর্বত্র সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন। কোনো সম্প্রদায় বলতে পারবে না যে, সে সত্যকে শেষ করে পেয়েছে। কালে কালে সত্যের নব নব প্রকাশ। এখানে দিনে

দিনে আমাদের জীবন সেই সত্যের মধ্যে নূতন নূতন বিকাশ লাভ করবে, এই আমাদের আশা। আমরা এই মুক্তির সরোবরে স্নান করে আনন্দিত হই, সমস্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আনন্দিত হই।

প্রাতঃকাল
৭ পৌষ ১৩২০

প্রতীক্ষা

কতদিন নিভৃতে এখানে তাঁর নাম শুনেছি। আজ এই জনকোলাহলে তাঁরই নাম ধ্বনিত হচ্ছে—অস্ফুট কলোচ্ছ্বাসে এই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকাশকে মুখরিত করে তুলছে। এই কোলাহলের ধ্বনি তাঁকে চারি দিকে বেষ্টন করে উঠেছে। আজ অন্তরে অন্তরে জাগ্রত হয়ে অন্তর্যামীকে বিরলে স্মরণ করবার দিন নয়—সংসার-তরণীর কর্ণধার হয়ে যিনি সবাইকে নিয়ে চলেছেন, আজ তাঁকে দেখবার দিন। অন্যদিন আকাশের গ্রহতারাকে বল্‌গার দ্বারা সংযত করে বিচিত্র বিশ্বরথকে একাকী সেই সারথি নিয়ে গেছেন—রথচক্রের শব্দ ওঠে নি, রাত্রির বিরামের কিছুমাত্র ব্যাঘাত করে নি। আজ নিদ্রা দূর হয়েছে, পাখিরা কুলায়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এই কোলাহলে যিনি 'শান্তং শিবম-দ্বৈতম্' তিনি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে রয়েছেন। কোলাহলের মর্মে যেখানে নিস্তব্ধ তাঁর আসন আজ আমরা সেইখানেই তাঁকে প্রণাম করবার জন্য চিত্তকে উদ্‌বোধিত করি।

আমাদের উৎসব-দেবতা কোলাহল নিরস্ত করেন নি, তিনি মানা করেন নি। তাঁর পূজা তিনি সব-শেষে ঠেলে রেখেছেন। যখন রাজা আসেন তখন কত আয়োজন করে আসেন, কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে আসেন, যাতে লোকে তাঁকে না মেনে থাকতে না পারে। কিন্তু, যিনি রাজার রাজা তাঁর কোনো আয়োজন নেই। তাঁকে যে ভুলে থাকে সে থাকুক, তাঁর কোনো তাগিদই নেই। যার মনে পড়ে, যখন মনে পড়ে, সেই তাঁর পূজা করুক—এইটুকু মাত্র তাঁর পাওনা। কেননা, তাঁর কাছে কোনো ভয় নেই। বিশ্বের আর-সব নিয়ম ভয়ে ভয়ে মানতে হয়। আগুনে হাত দিতে ভয় পাই, কেননা, জানি যে হাত পুড়বেই। কিন্তু, কেবল তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোনো ভয় নেই ; তিনি বলেছেন, 'আমাকে ভয় না করলেও তোমার কোনো ক্ষতি নেই।' এই-যে আজ এত লোকসমাগম হয়েছে, কে তার চিত্তকে স্থির করেছে! তিনি কি দেখছেন না আমাদের চিত্ত কত বিক্ষিপ্ত!' কিন্তু, তাঁর শাসন নেই। যাঁদের পদমর্যাদা আছে, রাজপুরুষদের কাছে সম্মান আছে, এমন লোক আজ এখানে এসেছেন। যাঁরা জ্ঞানের অভিমানে মত্ত হয়ে তাঁকে বিশ্বাস করেন না এমন লোক এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু, তাঁর বসুন্ধরার ধৈর্য তাঁদের ধারণ

করে রয়েছে, আকাশের জ্যোতির এক কণাও তাঁদের জন্য কমে নি— সব ঠিক সমান রয়েছে। তাঁর এই ইচ্ছা যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু নেবেন না। তাঁর প্রহরীদের কত ঘুষ দিচ্ছি, তারা কত শাসন করছে, কিন্তু বিশ্বমন্দিরের সেই দেবতা একটি কথাও বলেন না। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে আর আমাদের মনে ভয় জেগে উঠছে যে, পরকালে গিয়ে বুঝি এখানকার কাজের হিসাব দিতে হবে। না, সে ভয় একেবারেই সত্য নয়। তিনি যে কোনোদিন আমাদের শাস্তি দেবেন তা নয়। তিনি এমনি করে অপেক্ষা করে থাকবেন। তিনি কুঁড়ির দিকে চোখ মেলে থাকবেন কবে সেই কুঁড়ি ফুটবে। যতক্ষণ কুঁড়ি না ফুটছে ততক্ষণ তাঁর পুজোর অর্ঘ্য ভরছে না. তারই জন্য তিনি যুগ যুগান্তর ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন। এমনি নির্ভয়ে যে মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোল করছে, এতেও তিনি ধৈর্য ধরে বসে আছেন। এতে তাঁর কোনোই ক্ষতি নেই।

কিন্তু, এতে কার ক্ষতি হচ্ছে? ক্ষতি হচ্ছে মানবাত্মার। আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত পদমর্যাদার মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। বিষয়ী লোকের, জ্ঞানাভিমানী লোকের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে তার। কবে শুভদিন হবে, কবে মোহরাত্রির অবসান হবে, কবে আনন্দে বিহঙ্গেরা গান ধরবে, কবে অর্ঘ্য ভরে উঠবে? এই-যে বিশাল বসুন্ধরায় আমরা জন্মলাভ করেছি, সমস্ত চৈতন্য নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে কবে এই জন্মলাভকে সার্থক করে যেতে পারব? সেই সার্থকতার জন্যই যে তৃষিত হয়ে অন্তরাত্মা বসে আছে। কিন্তু, ভয় নেই, কোথাও কোনো ভয় নেই। কারণ, যদি ভয়ের কারণ থাকত তবে তিনি উদ্‌বোধিত করতেন। তিনি বলছেন, 'আমি তো জোর করে চাই নে, যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙবে।' ইচ্ছা করে তাঁর কাছে আসতে হবে, এইজন্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছাকে মেলাতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে একদিন তাঁকে গিয়ে বলব, 'আমার হল না, আমার হৃদয় ভরল না।' যেদিন সত্য করে চাইব সেদিন জননী কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু, এ ভুল তবে রয়েছে কেন? আমাদের এই ভুলের মধ্যেই যে তাঁর উপাসনা হচ্ছে। এরই মধ্যে যিনি সাধক তিনি তাঁর সাধনা নিয়ে রয়েছেন: যাঁদের উপরে তাঁর ডাক গিয়ে পৌঁচেছে সেই-সকল ভক্ত তাঁর অঙ্গনের কোণে বসে তাঁকে ধ্যান করছেন: তাঁকে ছাড়া তাঁদের সুখ নেই। এ যদি সত্য না হত তা হলে কি পৃথিবীতে তাঁর নাম থাকত! তা হলে অন্য কথাই সকলের মনের মধ্যে জাগত, তারই কোলাহলে সমস্ত সংসার উত্ত্যক্ত হয়ে উঠত। ভক্তের হৃদয়ের আনন্দজ্যোতির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের নিয়ত যোগ হচ্ছেই। এই জনপ্রবাহের ধ্বনির মাঝখানে, এই-সমস্ত ক্ষণস্থায়ী কল্লোলের মধ্য থেকে, মানবাত্মার অমর বাণী জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের চিরদিনের সাধনার প্রবাহকে সেই বাণী প্রবাহিত করে দিচ্ছে— অতল পঙ্কের মধ্য থেকে পদ্ম

বিকশিত হয়ে উঠছে—কোথা থেকে হঠাৎ বসন্তসমীরণ আসে যখন, এসে হৃদয়ের মধ্যে বয়, তখন আমাদের অন্তরে পূজার পুষ্প ফুটব-ফুটব করে ওঠে। তাই দেখছি যে যদিচ এত অবহেলা, এত দ্বেষ বিদ্বেষ, চারি দিকে এত উন্মত্ততা, তথাপি মানবাত্মা জাগ্রত আছে। কারণ, মানবের ধর্মই তাঁকে চিন্তা করা। মানবের ধর্ম যে তার চৈতন্যকে কেবল সংসারে বিলুপ্ত করে দেবে তা নয়। সে যে কেবলই জেগে জেগে উঠছে। যারা নিদ্রিত ছিল তারা হঠাৎ জেগে দেখছে যে, এই অনন্ত আকাশে তাঁর আরতির দীপ জ্বলেছে, সমস্ত বিশ্ব তাঁর বন্দনা গান করছে। এতেও কি মানুষের দুটি হাত জোড় হবে না! তোমার না হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবের অন্তরের মধ্যে তপস্বীদের কণ্ঠে স্তবগান উঠছে। অনন্তদেবের প্রাঙ্গণে সেই স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে শোনো, একবার শোনো। সমস্ত মানবের ভিতরে মানবের নিভৃত কন্দরে যেখানে ভক্ত বসে রয়েছেন, সেইখানে তাঁর কী বন্দনাধ্বনি উঠছে শোনো। এই অর্থহীন নিখিল মানবের কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সেই একটি চিরন্তন বাণী কালে কালে যুগে যুগে জাগ্রত। তাকে বহন করবার জন্য বরপুত্রগণ আগে আগে চলেছেন, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছেন। সে আজ নয়। আমরা অনন্ত পথের পথিক, আমরা যে কত যুগ ধরে চলেছি! যাঁরা গাচ্ছেন তাঁদের গান আমাদের কানে পৌঁচচ্ছে। তাই যদি না পৌঁছয় তবে কী নিয়ে আমরা থাকব! দিনের পর দিন কি এমনি করেই চলে যাবে! এই কাড়াকাড়ি মারামারি উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে কি জীবন কাটবে! এইজন্যেই কি জন্মেছিলুম! জীবনের পথে কি এইজন্যেই আমাদের চলতে বলা হয়েছে! এই যে সংসারে জন্মেছি, চলেছি, এখানে কত প্রেম কত আনন্দ যে ছড়িয়ে রয়েছে তা কি আমরা দেখছি না! কেবলই কি দেখব পদমর্যাদা টাকাকড়ি বিষয়বিভব, আর কিছুই নয়! যিনি সকল মানবের বিধাতা, একবার তাঁর কাছে দাঁড়াবার কি ক্ষণমাত্র অবকাশ হবে না! পৃথিবীর এই মহাতীর্থে সেই জনগণের অধিনায়ককে কি প্রণাম নিবেদন করে যাব না!

কিন্তু, ভয় নেই, ভয় নেই। তাঁর তো শাসন নেই। তাই একবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিকে জাগ্রত করি। একবার সব নিয়ে আমাদের জীবনের একটি পরম প্রণাম রেখে দিয়ে যাব। জানি, অন্যমনস্ক হয়ে আছি—তবু বলা যায় না—শুভক্ষণ যে কখন আসে তা বলা যায় না। তাই তো এখানে আসি। কী জানি যদি মন ফিরে যায়। তিনি যে ডাক ডাকছেন—তাঁর প্রেমের ডাক, যদি শুভক্ষণ আসে, যদি শুনতে পাই। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে তাই কান খাড়া করে রয়েছি—এই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ডাক আসতে পারে। এই মুহূর্তেই আমার জীবনপ্রদীপের যে শিখাটি জ্বলে নি সেই শিখাটি জ্বলে উঠতে পারে। আমাদের সত্য প্রার্থনা, যা চিরদিন অন্তরের এক প্রান্তে অপেক্ষা করে রয়েছে, সেই প্রার্থনা আজ জাগুক : অসতো মা সদ্‌গময়। সত্যকে চাই। সমস্ত মিথ্যাজাল ছিন্ন করে দাও। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে,

সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠুক।

রাত্রি
৭ পৌষ ১৩২০

অগ্রসর হওয়ার আহ্বান

স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন তিনি আমাকে বললেন যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা জড়িত নয় ব'লে আমার কবিতা পড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে। তার কারণ, খৃষ্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্ম-বিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেঁষে উন্‌মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা 'বিশ্বাস করি' বলে মানুষকে স্বীকার করতে হয় তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেইজন্য ফরাসীস্‌ বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে দেখা গিয়েছে যে, ধর্মকে আঘাত দেবার উদ্যম সেখানকার বুদ্ধিমান লোকদের পেয়ে বসেছে। অথচ ধর্মকে আঘাতমাত্র দিয়ে মানুষ আশ্রয় পাবে কেমন করে? তাতে কিছুদিনের মতো মানুষ প্রবৃত্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনোই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবি জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাস্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দম্ভ করতেন সেদিন চলে গিয়েছে। ধর্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলো যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলার একটা দরকার হয়, নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়। যেমন ধরো, আমাদের দেশে চার্বাক প্রভৃতির সময়ে একটা আন্দোলন জেগেছিল। কিন্তু, এখন লড়াই করবার প্রবৃত্তিই যে মানুষের নেই। এখন অন্ধ সংস্কারগুলি প্রায়ই পরাভূত হয়ে গিয়েছে। কাজেই লড়াই নিয়ে আর মানুষের মন ব্যাপৃত থাকতে পারছে না। বিশ্বাসের যে একটা মূল চাই, সংসারে যা-কিছু ঘটছে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নিলে চলে না—এ প্রয়োজনবোধ মানুষের ভিতরে জেগেছে। ইউরোপের লোকেরা ধর্মবিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অনুসন্ধান করছে—যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে

তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ও দেশের লোকেরা মনে করছে যে, ঐ-সব প্রমাণ সংগৃহীত হলে ধর্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে। ঐ-সব ভুতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে ধর্মের সত্যকে তারা খুঁজছে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকের কথাবার্তা হয়েছে। আমি এই কথাই বলেছি যে, 'বিশ্বব্যাপারে তোমরা যদি বিশ্বাসের মূল না পাও তবে অন্য-কিছুতে এমনই কী ভিত্তি পাবে?' নূতন জিনিস কিছু পেলেই মনকে তা আলোড়িত করে। একজন ইংরাজ কবি একদিন আমাকে বললেন যে, তাঁর ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেডিয়মের আবিষ্কারে তাঁর বিশ্বাসকে ফিরিয়েছে। তার মানে, ওরা বাইরের দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেইজন্য ওরা যদি কখনো দেখে যে, মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে— যেমন চোখ দিয়ে বাহ্য ব্যাপারকে দেখছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি তেমনি একটা অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়— তা হলে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেম্‌স্‌ প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে মিস্টিক বলে যাঁরা গণ্য তাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন, তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে ব্যক্ত করেছেন। এ বড়ো আশ্চর্য।

এই প্রসঙ্গের উপলক্ষে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো-একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্ব-দেশের সর্বকালের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের ধর্মের কোনো 'ডগ্‌মা' নেই শুনে তিনি ভারি খুশি হলেন ; বললেন, 'তোমরা খুব বেঁচে গেছ।' ডগ্‌মার কোনো অংশ না টিঁকলে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়—সে বড়ো বিপদ। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই—তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

পূর্বে যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না বলে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সেইজন্য খৃস্টান অত্যন্ত খৃস্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। এক-এক জাতি নিজের ধর্মকে আয়্‌রন্‌চেস্টে সীল-মোহর দিয়ে রেখেছে। কিন্তু, মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি

করে অনুভব করছে। জ্ঞান যেমন সকলের জিনিস হচ্ছে সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে। সবরকম সাহিত্যরস সবাই নিজের বলে ভোগ করবে এইটি হয়ে উঠছে। এবং সকলের চেয়ে যেটি পরম ধন, ধর্ম, সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্মের মধ্যে প্রবেশের সিংহ-দ্বারকে রোধ করে রেখেছে, বিশেষ পরিচয়পত্র না দেখাতে পারলে কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, সেই-সব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমদেশে যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক। সেই যাঁরা পীড়া পাচ্ছেন এবং সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ মূর্তিতে দেখবার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুকও একজন। খৃস্টধর্ম যেখানে সংকীর্ণ সেখানে ব্রুক তাকে মানেন নি। তাঁর ONWARD CRY-নামক নূতন বইটির প্রথম উপদেশটি পাঠ করলেই সেটা বোঝা যাবে। আজকের ৭ই পৌষের উৎসবের সঙ্গে সেই উপদেশের যোগ আছে।

তিনি REVELATION-এর চতুর্থ অধ্যায় থেকে এই শ্লোকটি তাঁর উপদেশের বিষয় করে নিয়েছেন :

After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven; and the first voice I heard was as it were a trumpet talking with me; which said: Come up hither and I will show thee things that shall be hereafter.

তাঁর উপদেশের ভিতরকার কথা হচ্ছে এই : বরাবর এই কথা আছে, তুমি এসো আরো কিছু দেখাবার আছে—এই বাণী বরাবর মানুষ শুনে আসছে। আমাদের কোনো জায়গায় ঈশ্বর বদ্ধ থাকতে দেবেন না। জ্ঞানে, ভাবে, কর্মে, সমাজে সকল দিকে, স্বর্গ থেকে, উপর থেকে, ডাক আসছে, 'তোমরা চলে এসো, তোমরা বসে থাকতে পারবে না।' ইহলোকের মধ্যেই সেই হিয়ার-আফ্‌টার, সেই পরে যা হবে, তার ডাক মানুষ শুনেছে বলেই তার সমাজে উন্নতি হচ্ছে, তার জ্ঞান প্রসার লাভ করছে। পশু এ ডাক শোনে না ; তাকে কেউ বলে না যে 'তুমি যা দেখছ, যা পাচ্ছ, তাই শুধু নয়, আরো অনেক বাকি আছে'। মানুষেরই এই একটি বিশেষ গৌরবের জিনিস যে, মানুষকে ঈশ্বর স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দিলেন না। যেখানে তার বদ্ধতা, তার সংকীর্ণতা, সেখানে ক্রমাগতই আহ্বান আসছে—আরো কিছু আছে, আরো আছে। যা হয়েছে তা হয়েছে এ বলে যদি দাঁড়াই, যদি সেই 'আরো আছে'র ডাককে অমান্য করি, তা হলে মানুষের ধর্মের পতন। যদি তাকে জ্ঞানে অমান্য করি তা হলে মানুষের মূঢ়তায় পতন। যদি সমাজে অমান্য করি তা হলে জড়তায় পতন। কালে কালে মহাপুরুষেরা কী দেখান? তাঁরা দেখান যে 'তোমরা যাকে ধর্ম বলে ধরে রয়েছ ধর্ম তার মধ্যে পর্যাপ্ত নন'। মানুষকে মহাপুরুষেরা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন ; তাঁরা বলেন, চলতে হবে। কিন্তু,

মানুষ তাঁদেরই আশ্রয় করে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে যায়, আর চলতে চায় না। মহাপুরুষেরা যে-পর্যন্ত গিয়েছেন তারও বেশি তাঁদের অনুপন্থীরা যাবেন এই তো তাঁদের ইচ্ছা ; কিন্তু তারা তাঁদের বাক্য গলায় বেঁধে আত্মহত্যা-সাধন করে। মহাপুরুষদের পথ হচ্ছে পথ, কেবলমাত্র পথ। তাঁরা সেই পথে চলেছিলেন এইটেই সত্য। সুতরাং, পথে বসলে গম্যস্থানকে পাব না, পথে চললেই পাব। উপরের থেকে সেই চলবার ডাকটিই আসছে। সেই বাণীই বলছে, 'তুমি বসে থেকে কিছু পাবে না। চলো, আরো চলো, আরো আছে, আরো আছে।' মানুষের ধর্ম চলছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধর্ম আমাদের কোনো সীমাবদ্ধ জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে না, ধর্ম অসীমের পরিচয় দিচ্ছে। পাখি যেমন আকাশে ওড়ে এবং উড়তে উড়তে আকাশের শেষ পায় না, তেমনি আমরা অনন্তের মধ্যে যে অবাধ গতি রয়েছে তাতেই চলতে থাকব। পাখি পিঞ্জরের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করে তার কারণ এ নয় যে, সে তার প্রয়োজন সেখানে পাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশিকেই পাচ্ছে না। মানুষেরও তাই চাই। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের ধর্ম হচ্ছে অনন্তে বিহার, অনন্তের আনন্দকে পাওয়া। মানুষ যেখানে ধর্মকে বিশেষ দেশ-কালে আবদ্ধ করেছে সেখানে যে ধর্ম তাকে মুক্তি দেবে সেই ধর্মই তার বন্ধন হয়েছে। য়ুরোপে ধর্ম যেখানে তাকে বেঁধেছে সেইখানেই মুক্তির জন্য য়ুরোপ ক্রন্দন করছে। 'অন্‌ওআর্ড ক্রাই' মানুষের ক্রাই।

আজকে যাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিকে আমরা এসেছি তিনি অন্‌ওআর্ড ক্রাই শুনতে পেয়েছিলেন। যে সময়ে আমাদের দেশে ধর্মকে সমাজকে চারি দিক থেকে নানা আচার ও প্রথার বন্ধনে বেঁধেছিল, তাকে সংকীর্ণ করে রুদ্ধ করে রেখেছিল, সেই সময়ে তিনি এই আহ্বান শুনে জেগে উঠলেন। চারি দিকের এই রুদ্ধতা, এই বেড়াগুলো, তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছিল। তিনি যখন আকাশে উড়তে চেয়েছিলেন তখন পিঞ্জরের প্রত্যেকটি শলাকা তাঁকে আঘাত করেছিল। তিনি জীবনকে প্রতিদিন অগ্রসর করবেন, প্রতিদিন অনন্তের আস্বাদ আপনার ভিতর থেকে পাবেন, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা সেদিনকার সমাজে বড়োই দুর্লভ ছিল। সকলেই নিজ নিজ প্রচলিত অভ্যাসে তৃপ্ত ছিল। এই ৭ই পৌষের দিন তিনি তাঁর দীক্ষার আহ্বান শুনেছিলেন। সে আহ্বান এই মন্ত্রটি : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌। দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো। এই আহ্বান, এই দীক্ষামন্ত্রই তো এই আশ্রমের মধ্যে রয়েছে। উপনিষদের এই মন্ত্র, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে না। এ বাণী দেশে দেশান্তরে নির্ঝরধারার মতো যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলতে থাকবে। দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো।

সেইজন্য আজ আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, মহর্ষির জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সমাজে হয় নি, তা এই আশ্রমে হয়েছিল। বিশেষ সমাজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সেইখানেই তাঁর

চিরজীবনের সাধনা তার বিশেষ সার্থকতা লাভ করে নি, এই আশ্রমের মধ্যেই তার সার্থকতা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'আরো'র দিকে চলো' সেই ডাক তিনি শুনে বেরিয়েছিলেন ; সেই মন্ত্রে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ; এবং সেই ডাকটি, সেই মন্ত্রটি তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এসো, এসো, আরো পাবে।' অনন্তস্বরূপের ভাণ্ডার যদি উন্মুক্ত হয়, তবে তার আর সীমা কোথায় ? তাই আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা যেন সেই পথে তাঁর অনুসরণ করি যে পথ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছেন। জ্ঞানে প্রেমে ধর্মে সকল দিকে যেন মুক্তির পথেই ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকি। এ কথা ভুলবার নয় যে, এ আশ্রম সম্প্রদায়ের স্থান নয়, এখানে সমস্ত বিশ্বের আমরা পরিচয় পাব। এখানে সকল জাতির সকল দেশের লোক সমাগত হবে। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রকে, সমস্তকে ঈশ্বরের মধ্যে দেখার মন্ত্রকে আমরা কোথাও সংকোচ করব না। আমাদের অগ্রসরের পথ যেন কোনোমতেই বদ্ধ না হয়।

দ্বিপ্রহর
৭ পৌষ ১৩২০

মা মা হিংসীঃ

মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই-যে একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চলে এসেছে 'মা মা হিংসীঃ', 'আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো'— এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। যে শারীরিক মৃত্যু তার নিশ্চিত ঘটবে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ প্রার্থনা করতে পারে না, কারণ এমন অনর্থক প্রার্থনা করে তার কোনো লাভ নেই। সে জানে মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত সত্য আর নেই, দৈহিক জীবনের বিনাশ একদিন-না-একদিন ঘটবেই। এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু, সে যখন বলেছে 'আমাকে বিনাশ কোরো না', তখন সে যে কী বলতে চেয়েছে তা তার অন্তরের দিকে চেয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এমন যদি হত যে তার শরীর চিরকাল বাঁচত, তা হলেও সেই বিনাশ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কারণ, সে যে প্রতি মুহূর্তের বিনাশ। সে যে কত রকমের মৃত্যু, একটার পর একটা আমাদের জীবনের উপরে আসছে। ক্ষুদ্র কালে বদ্ধ হয়ে বাইরের সুখদুঃখের আঘাতে ক্রমাগত খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হয়ে যে জীবন আমরা বহন করছি এতে যে প্রতিদিনই আমরা মরছি। যে গণ্ডি দিয়ে আমরা জীবনকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি তারই মধ্যে জীবন কত মরা মরছে— কত প্রেম কত বন্ধুত্ব মরছে— কত ইচ্ছা কত আশা মরছে— এই ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত জীবন ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের মধ্যে এই মৃত্যুর ব্যথা যে আমাদের ভোগ করতে হয় তার

কারণ হচ্ছে আমরা দুই জায়গায় আছি। আমরা তাঁর মধ্যেও আছি, সংসারের মধ্যেও আছি। আমাদের এক দিকে অনন্ত, অন্য দিকে সান্ত। সেইজন্য মানুষ এই কথাই ভাবছে, কী করলে এই দুই দিককেই সে সত্য করতে পারে। আমাদের এই সংসারের পিতা, যিনি এই পার্থিব জীবনের সূত্রপাত করে দিয়েছেন, তাঁকে শুধু পিতা বলে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি নেই। কারণ, আমরা যে জানি যে, এই শারীরিক জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে। আমরা তাই সেই আর একজন পিতাকে ডাকছি যিনি কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের নয়, কিন্তু চিরজীবনের পিতা। তাঁর কাছে গেলে মৃত্যুর মধ্যে বাস করেও আমরা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারি, এই আশ্বাস কেমন করে যেন আমরা আমাদের ভিতর থেকেই পেয়েছি। এইজন্যই পথ চলতে চলতে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে উপরের দিকে তাকায়। এইজন্যই সংসারের সুখ-ভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে তার অন্তরের মধ্যে বেদনা জেগে ওঠে এবং তখন ইচ্ছাপূর্বক সে পরম দুঃখকে বহন করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কেন? কারণ সে বুঝতে পারে মানুষের মধ্যে কত বড়ো সত্য রয়েছে, কত বড়ো চেতনা রয়েছে, কত বড়ো শক্তি রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মরছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত তার উপর আসবেই আসবে—কে তাকে রক্ষা করবে! কিন্তু, যেমনি সে তার সমস্ত দুঃখ-আঘাতের মধ্যে সেই অমৃতলোকের আশ্বাস পায় অমনি তার এই প্রার্থনা আর-সকল প্রার্থনাকে ছাড়িয়ে ওঠে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে বাঁচাও বাঁচাও! প্রতিদিনের হাত থেকে, ছোটোর হাতের মার থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বড়ো—আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে, স্বার্থের হাত থেকে, অহমিকার হাত থেকে নিয়ে যাও। তোমার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে আমার জীবন যেতে চাচ্ছে : আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে প্রতিদিন আপনার অহমিকার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমার কোনো আনন্দ নেই। মা মা হিংসীঃ। আমাকে বিনাশ থেকে বাঁচাও।

যে প্রেমের মধ্যে সমস্ত জগতে মানুষ আপনার সত্য স্থানটিকে পায়, সমস্ত মানুষের সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই পরম প্রেমটিকে না পেলে মানুষকে কে বেদনা ও আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে! তখন তার উপর আঘাত নানা দিক থেকে ক্রমাগতই আসবে, পাপের দহন তাকে দগ্ধ করে মারবে। এইজন্যই সংসারের ডাকের উপর আর-একটি ডাক জেগে আছে, 'তোমার ভিতর দিয়ে সমস্ত সংসারের সঙ্গে যে আমার নিত্য সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে আমায় বাঁধো, তা হলেই মৃত্যুর ভিতর থেকে আমি অমৃতে উত্তীর্ণ হতে পারব।'

পিতা নো বোধি। পিতা, তুমি বোধ দাও। তোমাকে স্মরণ করে মনকে আমরা নম্র করি। প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতা আমাদের ঔদ্ধত্যে নিয়ে যায়, তোমার চরণতলে আপনাকে একবার সম্পূর্ণ ভুলি। এই ক্ষুদ্র আমার সীমায় আমি

বড়ো হয়ে উঠছি এবং পদে পদে অন্যকে আঘাত করছি— আমাকে পরাভূত করো তোমার প্রেমে। এই মৃত্যুর মধ্যে আমাকে রেখো না হে পরমলোকের পিতা, প্রেমেতে ভক্তিতে অবনত হয়ে তোমাকে নমস্কার করি এবং সেই নমস্কারের দ্বারা রক্ষা পাই। তা না হলে দুঃখ পেতেই হবে, বাসনার অভিঘাত সহ্য করতেই হবে, অহংকারের পীড়ন প্রতিদিন জীবনকে ভারগ্রস্ত করে তুলবেই তুলবে। যতদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্রতার সীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছি, ততদিন পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে বিকটমূর্তি ধারণ করে চতুর্দিককে বিভীষিকাময় করে তুলবেই তুলবে।

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে— কত দিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ-নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। পীস্‌ কন্‌ফারেন্‌স্‌— শান্তি-স্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে; সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে? এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে— সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে : মা মা হিংসীঃ। পিতা তোমার বোধ না দিলে এ মার থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কখনো এটা সত্য হতে পারে না যে, মানুষ কেবলমাত্র আপনার ভিতরেই আপনার সার্থকতাকে পাবে। তুমি আমাদের পিতা, তুমি সকলের পিতা— এই কথা বলতেই হবে। এই কথা বলার উপরেই মানুষের পরিত্রাণ। মানুষের পাপের আগুন এই পিতার বোধের দ্বারা নিভবে— নইলে সে কখনোই নিভবে না, দাবানলের মতো সে ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে হতে সমস্ত ছারখার করে দেবে। কোনো রাজমন্ত্রী কূট কৌশলজাল বিস্তার করে যে সে আগুন নেভাতে পারবে, তা নয়। মার খেতে হবে, মানুষকে মার খেতেই হবে।

মানুষের এই-যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন, 'যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর তবেই ভালো— আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে।' আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে। মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে— আজ কে মানুষকে বাঁচাবে! এই পাপ, এই হিংসা

মানুষকে আজ কী প্রচণ্ড মার মারবে— তাকে এর মার থেকে কে বাঁচাবে!

আমরা আজ এই পাপের মূর্তি যে কী প্রকাণ্ড তা কি দেখব না? এই পাপ যে সমস্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং আজ তাই এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে বিরাট আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, এ কথা কি আমরা বুঝব না! আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে তুলছি। এ পাপ কত দিন ধরে জমছে, কত যুগ ধরে জমছে! প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্ছি নে? বহু শতাব্দী থেকে আমরা কি কেবলই মরছি নে? সেইজন্যই তো এই প্রার্থনা: মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও, এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও। এই-সমস্ত দুঃখশোকের উপরে যে অশোক লোক রয়েছে, অনন্ত-অন্তের সম্মিলনে যে অমৃতলোক সৃষ্ট হয়েছে, সেইখানে নিয়ে যাও। সেইখানে মরণের উপরে জয়ী হয়ে আমরা বাঁচব; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা বাঁচব। সেইখানে আমাদের মুক্তি দাও।

আজ অপ্রেমঝঞ্ঝার মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে, এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই-যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি— সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনা-রূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠেছে। মা মা হিংসীঃ। মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। কে বাঁচাবে? পিতা নোঽসি। তুমি যে আমাদের সকলের পিতা, তুমি বাঁচাও। তোমার বোধের দ্বারা বাঁচাও। তোমাকে সকল মানুষ মিলে যেদিন নমস্কার করব সেই দিন নমস্কার সত্য হবে। নইলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে যে নমস্কার করতে হয়, সেই মৃত্যু থেকে বাঁচাও। দেশদেশান্তরে তোমার যত যত সন্তান আছে, হে পিতা, তুমি প্রেমে ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে একত্র করো তোমার চরণতলে। নমস্কার সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক। দেশ থেকে দেশান্তরে, জাতি থেকে জাতিতে ব্যাপ্ত হোক। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। মা মা হিংসীঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা করো।

২০ শ্রাবণ ১৩২১

পাপের মার্জনা

আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময়ে মুখের কথা হয়— কারণ, চারি দিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে

সত্যের তেজ পৌঁছয় না। কিন্তু, ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে, এমন এক-একটি দিন আসে যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। তখনই এই কথাটি বারবার জাগ্রত হয় : বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জনা করো।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করতে পারি না 'আমাদের পাপ ক্ষমা করো' ; কারণ, তিনি ক্ষমা করেন না, তিনি সহ্য করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থনা, 'তুমি মার্জনা করো।' যেখানে যতকিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারম্বার রক্তস্রোতের দ্বারা, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা সেখানে তিনি মার্জনা করেন। যে প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্বলের ভীরুর প্রার্থনা ; সে প্রার্থনা তাঁর দ্বারে গিয়ে পৌঁছবে না।

আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু-আধটু খবর পাই তার পশ্চাতে কী অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি? যে হানাহানি হচ্ছে, তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে? ভেবে দেখো কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এইজন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর : কারণ, যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ, সে যদি বেদনা পেত তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জন করছে তারই আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্য এক-একসময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে— যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু, এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়।

মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয় ; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গৌরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজন্যই আমাদের সকলকে দুঃখভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না—সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না। সে চেয়ে দেখবে দুর্যোগের রাত্রে দূর দিগন্তে মশাল জ্বলে উঠেছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আসছেন—সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ি ছিন্ন হয়ে যাবে। যার চিত্ততন্ত্রীতে আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাজবে।

তাই বলছি যে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক করে যে একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন তবে বেদনার এই গতি কখনোই এমন বেগবান হতে পারত না। ধনী-দরিদ্র জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে। এই কথাটি আজ বিশেষভাবে অনুভব করো।

তাই এ কথা আজ বলবার কথা নয় যে 'অন্যের কর্মের ফল আমি কেন ভোগ করব'। হাঁ, আমিই ভোগ করব, আমি নিজে একাকী ভোগ করব, এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি করো, তপস্যা করো, দুঃখকে গ্রহণ করো। তোমাকে যে নিজের পাপের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে, নিজের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখে দগ্ধ হয়ে হয়তো মরতে হবে। কারণ, তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন করে? প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে? ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে, সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই 'যদ্ ভদ্রং তৎ'—যা ভদ্র তাই—আসবে। ওরে তপস্বী, দুঃসহ দুর্ভর দুঃখভারে তোমার হৃদয় একেবারে নত হয়ে যাক, তাঁর চরণে গিয়ে পৌঁছোক। নমস্তেঽস্তু। বলো, 'পিতা, তুমি যে আছ সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর—সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ দলন করুক। পিতা নো বোধি। আজই তো সেই উদ্‌বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে পিতা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয়-হাহাকারের ঊর্ধ্বে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ করে সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমোতে দেবে না ; তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাত। যেখানে প্রেম আছে জাগুক, যেখানে কল্যাণের বোধ আছে জাগুক—সকলে আজ তোমার বোধে উদ্‌বোধিত

হয়ে উঠুক। এই এক প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরস্ত করো। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে, ঘরে ঘরে, দেশে দেশে পুঞ্জীভূত— তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা করো, দুঃখের দ্বারা মার্জনা করো, রক্তস্রোতের দ্বারা মার্জনা করো, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা মার্জনা করো।'

এই প্রার্থনা, সমস্ত মানবচিত্তের এই প্রার্থনা, আজ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত হোক। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো : এই প্রার্থনাকে সত্য করতে হবে— শুচি হতে হবে, সমস্ত হৃদয়কে মার্জনা করতে হবে। আজ সেই তপস্যার আসনে, পূজার আসনে উপবিষ্ট হও। যে পিতা সমস্ত মানবসন্তানের দুঃখ গ্রহণ করছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, প্রেমের অন্ত নেই, যাঁর প্রেমের বেদনা উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে, তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে সেই তাঁর প্রেমের বেদনাকে আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করি।

৯ ভাদ্র ১৩২১

সৃষ্টির ক্রিয়া

অবকাশের পর আবার আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। আর-একবার আমাদের চিন্তা করবার সময় হয়েছে। এখানকার সত্য আহ্বানকে অন্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট করে উপলব্ধি করবার জন্য এবং মনের মধ্যে যেখানে গ্রন্থি রয়েছে, দীনতা রয়েছে, তাকে মোচন করবার জন্য আবার আমাদের ভালো করে প্রস্তুত হতে হবে।

এই শান্তিনিকেতনে, যেখানে আমরা সকলে আশ্রয় লাভ করেছি এবং সম্মিলিত হয়েছি, এখানে এই সম্মিলনের ব্যাপারকে কোনো-একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করতে পারি নে। বিশ্বের মধ্যে আমাদের জীবনের অন্যান্য যে-সকল সম্ভাবনা ছিল তাদের এড়িয়ে এই এখানে যে আমরা আশ্রয় পেয়েছি, এর মধ্যে একটা গভীর অভিপ্রায় রয়েছে। এখানে একটি সৃষ্টি হচ্ছে— এখানে যারা এসেছে তারা কিছু দিচ্ছে, কিছু নিয়ে যাচ্ছে, এমনি করে ক্রমশ এখানে একটি জীবনের সঞ্চার হচ্ছে। এর মধ্যে নানা ভাঙাগড়ার কাণ্ড চলেছে ; কেউ বা এখানে স্থায়ী, কেউ অস্থায়ী। সুতরাং এই আশ্রমকে বাহির থেকে দেখলে মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয় যে, এ ভাঙাগড়া বুঝি দৈবক্রমে ঘটছে। একটা ঘর তৈরি হবার সময় কত চুনসুরকি মালমসলার অপব্যয় হয়, চার দিকে এলোমেলো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে সেগুলো পড়ে থাকে। কিন্তু, সমস্ত ঘরটি যখন তৈরি হয়ে ওঠে তখন আদ্যোপান্ত হিসাব পাওয়া যায় ; তখন কী অপব্যয় হয়েছিল তাকে কেউ গণনার মধ্যেই আনে না। তেমনি এই আশ্রমের প্রত্যেক মানুষের জীবনের ইতিহাসের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কেউ বা কিছু পাচ্ছে, কেউ বা কিছুই পায় নি। সে হিসাবে এখানকার সমগ্র

সৃষ্টির চেহারা দেখা যায় না। এই-যে এখানে চারি দিক থেকে প্রাণের প্রবাহ আসছে, এ ব্যাপারটাকে আমাদের খুব সত্য করে, খুব বড়ো করে অন্তরের মধ্যে দেখবার শক্তি লাভ করতে হবে। এ একটা বিশ্বের ব্যাপার। কত দিক থেকে প্রাণের ধারা এখানে আসছে এবং কত দিকে দিগন্তরে এখান থেকে পুনরায় বয়ে চলবে— একে আকস্মিক ঘটনা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

বিশ্বের কোনো ব্যাপারকেই যে আমরা দেখতে পাই নে তার কারণ আমরা সমস্ত মন দিয়ে দেখি নে। চোখ দিয়ে দেখতে পাই নে, কারণ এ তো চোখ দিয়ে দেখবার জিনিস নয়। একে যে চরিত্র দিয়ে দেখতে হয়। স্বভাব দিয়ে দেখতে হয়। স্বভাবের ভিতর দিয়ে দেখতে হয় বলেই স্বভাবকে বিশুদ্ধ করা দরকার হয়। আমরা এই আশ্রমে যতই উপদেশ দিই এবং যতই উপদেশ পাই-না কেন, এই আশ্রমের ভিতরে যে অমৃত-উৎসটি উঠছে তাকে দেখবার, তার কাছে যাবার শক্তি যে আমাদের সকলের রয়েছে তা নয়। সেই দেখতে পাই না বলেই উপদেশে কিছু হয় না, কথারচনা ব্যর্থ হয়। সেই আনন্দ স্বরূপকে দেখলেই আনন্দ যে ভরে উঠবে। সেই আনন্দে যে সমস্ত ত্যাগ সহজ হয়ে যাবে বিরোধ দূর হবে, সব নির্মল হবে, সকল বাধা কেটে যাবে। আনন্দের লক্ষণ দেখলেই চেনা যায়। যখন দেখি যে আমাদের ভিতরে দুশ্চিন্তা ও দুশ্চেষ্টা থামছে না, অন্যায় ক্ষুদ্রতা মিথ্যা কত-কী আমাদের ঘিরে রয়েছে, তখন বুঝতে পারছি যে, সেই আনন্দকে দেখবার শক্তি আমাদের হয় নি— তার লক্ষণ আমাদের মধ্যে ফুটছে না।

আপনাকে এবং জগৎকে সত্য করে জানবার ও দেখবার জন্যই মানুষ এই জগতে এসেছে। মানুষও যে-সমস্ত অনুষ্ঠান রচনা করেছে— তার বিদ্যালয়, তার রাজ্য সাম্রাজ্য, নীতি ধর্ম, সমস্তেরই মূল কথা এই যে, মানুষ যে যথার্থ কী সেটা মানুষকে প্রকাশ করতে হচ্ছে। মানুষের অনুষ্ঠানে মানুষই বিরাট রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। সেইজন্য সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতরকার আদর্শ হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। মানুষ নিজেকে যে ছোটো বলে জানছে, মানুষের ধর্ম কর্ম তারই প্রতিবাদ করে তাকে বলছে, 'তুমি ছোটো নও, তুমি আপনার মধ্যে আপনি বদ্ধ নও, তুমি সমস্ত জগতের— তুমি বড়ো, বড়ো, বড়ো।'

কিন্তু, মানুষের এই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে সে প্রবেশ করছে। মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগযুক্ত করবে, সকলকে এক করবে— এই তো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু, সেই ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে, কত অন্যায়, কত অসত্য, কত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে। মানুষের 'জাতীয়তা', ইংরাজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎ রূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু, সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে শয়তান সেই

জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ, কত আঘাত, কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে! মানুষের তপস্যা এক দিকে, অন্য দিকে তপস্যা ভঙ্গ করবার আয়োজন—এ দুইই পাশাপাশি রয়েছে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমেও সেই তপস্যা রয়েছে—ধর্ম যে কত বড়ো, বিশ্ব যে কত সত্য, মানুষ যে কত বড়ো, এই আশ্রম সে কথা নিয়তই স্মরণ করিয়ে দেবে। এইখানে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ, জাতিভেদ, ভুলব। আমাদের দেশে চারি দিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে কত ক্ষুদ্র ক'রে সংকীর্ণ ক'রে তার মানব-ধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে, আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব। এত বড়ো আমাদের কাজ। কিন্তু, আমরা একে কেউ বা স্কুলের মতো করে দেখছি। কেউ বা আপনার আপনার ছোটো-খাটো চিন্তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। একে আমরা উপলব্ধি করছি নে বলে গোলমাল করতে করতে চলেছি। আপনার সত্য পরিচয় পাচ্ছি নে, এরও যথার্থ পরিচয় পাচ্ছি নে। এই আশ্রমের চারি দিকে যে-একটি অনন্তত্ব রয়েছে তাকেই নষ্ট করছি। কেবলই আবর্জনা ফেলছি, আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবর্জনাকে কেবলই বর্ষণ করছে। এমনি করে এখানকার স্থান সংকীর্ণ হয়ে উঠছে। প্রত্যেকের রাগদ্বেষ-মোহমলিনতার দ্বারা এখানকার বাতাস কলুষিত হচ্ছে, আকাশ অবরুদ্ধ হচ্ছে।

আমি অধিক কথা বলতে চাই না। বাক্যের দ্বারা ক্ষণিক উত্তেজনা ও উৎসাহ সঞ্চার করার উপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই। আমি জানি, প্রত্যেকের জীবন নিজের ভিতর থেকে নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারলে বক্তৃতা বা উপদেশে কোনো ফল লাভ হয় না। প্রতি দিনের সাধনায় শক্তিকে জাগ্রত করে তবে আমরা মুক্তি পাব। আমি বৃথা এ আক্ষেপও রাখতে চাই না যে, কিছু হচ্ছে না। শান্তভাবে গভীরভাবে স্তব্ধ হয়ে আমাদের আপনার ভিতরে দেখতে হবে যে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' রয়েছেন—তিনি সত্য, তিনি আমার ভিতরে সত্য, তিনি জগতে সত্য। দেখি কোন্‌খানে বাধছে—কোন্‌খানে জগতের মধ্যে যিনি 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' তাঁর শান্তিতে আমি ব্যাঘাত করছি। এ প্রত্যেককে আলাদা করে নিজের ভিতরে দেখতে হবে। কারণ, প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা স্বতন্ত্র। কার কোন্‌খানে দীনতা ও কৃপণতা তা তো আমরা জানি না। এই মন্দিরে আমাদের যেমন সম্মিলিত উপাসনা হচ্ছে তেমনি আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সাধনা এইখানেই জেগে উঠুক। একবার আমাদের চিত্তকে চিন্তাকে গভীর করে অন্তরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা একবার দেখবার চেষ্টা করি, এই আশ্রমের মধ্যে যে সত্যসাধনা রয়েছে সেটি কী। আর, একবার মনকে দিয়ে বলিয়ে নিই : পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। এ যে কত বড়ো বোধ! সেই বোধের দ্বারা আমাদের দৃষ্টি কলুষ, আমাদের বুদ্ধির জড়তা, আমাদের চৈতন্যের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাক। এ তো কোনো উপদেশের দ্বারা হবার জো নেই। যেমন করে ছোটো অঙ্গার

থেকে বৃহৎ অগ্নি জ্বলে উঠতে পারে, তেমনি করে এই ছোটো কথাটি থেকে বোধের অগ্নি জ্বলে উঠুক— দগ্ধ হোক সকল মলিনতা ও সংকীর্ণতা। যদি সমস্ত ইচ্ছাকে জাগ্রত করে আমরা এই সত্যকে গ্রহণ করি তবেই এই বোধ উদ্‌বোধিত হবে। যদি না করি তবে হবে না। মিথ্যার মধ্যে জড়িয়ে আছি— যদি বলি 'তাই নিয়েই কাটবে', কাটাও, কেউ কোনো বাধা দেবে না। সংসারে কেউ তার থেকে উদ্ধার করতে পারবে না— কোনো উপদেশ কোনো উত্তেজনায় ফল হবে না।

মানুষের কণ্ঠে নয়— এই স্তবমন্ত্রের বাণী বিশ্বের কণ্ঠে জেগে উঠুক। এই বাণী জগতে শক্তি প্রয়োগ করুক ; বাতাসে শক্তি প্রয়োগ করুক, আলোকে শক্তি প্রয়োগ করুক। বাধা বিস্তর, আবরণ সুকঠিন জানি। কিন্তু, এও জানি যে, মানুষের শক্তির সীমা নেই। দেশে কালে মানুষ অনন্ত, তার সেই অনন্ত মহত্ত্বকে কোনো আবরণ প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। আমি সত্য, আমি সত্য— এই কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ হোক। জাতীয়তার আবরণ, বিশেষ ধর্মের গণ্ডি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, এ-সমস্ত থেকে মুক্তিলাভ করি। সেই মুক্তির জন্যই যে এই স্থানটি তৈরি হয়েছে, আজ সেই কথা স্মরণ করি। আজ স্থির হয়ে ভাবি যে, প্রতিদিনের জীবনে কোন্‌খানে ব্যাঘাত রয়েছে। অভ্যস্ত বলেই তো সেই ব্যাঘাতকে দেখতে পাই নে। সমস্ত জীবনের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। যেমন বাতাসে এত ধুলো রয়েছে অথচ দরজার ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি এলে তবেই সেটা দেখা যায়, তেমনি অন্তরে যে কী দীনতা রয়েছে তা এমনি দেখা যায় না— শান্তিনিকেতনের সাধনার জ্যোতির ভিতর দিয়ে তাকে দেখে তার থেকে মুক্তিলাভের ব্রতকে গ্রহণ করি। বোধ আবির্ভূত হোক। বোধ পরিপূর্ণ হোক।

কার্তিক ১৩২১

দীক্ষার দিন

আশ্রমকে যেদিন সত্য করে দেখতে হবে সেদিন আনন্দের সংগীত বেজে উঠবে, ফুলের মালা দুলবে, সূর্যের কিরণ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে— কারণ, আনন্দের মধ্য দিয়েই সত্যকে দেখা সম্ভব হয়, আর-কোনো উপায়ে নয়। আমাদের একান্ত আসক্তি দিয়ে সব জিনিসকে বাইরের দিক থেকে আঁকড়ে থাকি— সেইজন্যই সেই আসক্তি থেকে ছাড়িয়ে ভিতরকার আনন্দরূপকে দেখবার এক-একদিন আসে।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষির কোন্‌ দিনটিকে আশ্রমের এই সত্য রূপকে দেখবার উৎসবের দিন করেছেন ? সে তাঁর দীক্ষার দিন। দীক্ষা সেইদিন যেদিন মানুষ আপনার মধ্যে যেটি বড়ো, আপনার মধ্যে যে অমর জীবন, তাকে

স্বীকার করে। সংসারের ক্ষেত্রে মানুষ যে জন্মায় তাতে তার কোনো চেষ্টা নেই ; সেখানকার আয়োজন তার আসবার অনেক পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু, মানুষ আপনাকে আপনি অতিক্রম করে যেদিন একেবারে সূর্যের আলোর কাছে, নিখিল আকাশের কাছে, পুণ্য সমীরণের কাছে, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ হস্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে— যেদিন এই কথা বলে যে 'আমি অনন্ত কালের অমৃতজীবনের মানুষ, আমারই মধ্যে সেই বৃহৎ সেই বিরাট সেই ভূমার প্রকাশ'— সেদিন সমস্ত মানুষের উৎসবের দিন। সেই-রকম একটি দীক্ষার দিন, যেদিন মহর্ষি বিশ্বের মধ্যে অনন্তকে প্রণাম করেছেন, যেদিন আপনার মধ্যে অমৃতজীবনকে অনুভব করে তাকে অর্ঘ্যরূপে তাঁর কাছে নিবেদন করে দিয়েছেন, সেই দিনটি যে বাস্তবিকই উৎসবের দিন এই কথা অনুভব করে তিনি তাকে আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। মহর্ষির সেই দীক্ষাকে আশ্রয় করেই এখানে আমরা আছি। এই আশ্রম তাঁর সেই দীক্ষাদিনটিরই বাইরের রূপ। কারণ, এখানে কর্মে দীক্ষা, শিক্ষায় দীক্ষা, শিক্ষকতায় দীক্ষা— সেই অমরজীবনের দীক্ষা। সেই পরম দীক্ষার মন্ত্রটি এই আশ্রমের মধ্যে রয়ে গেছে। প্রতিদিন সে কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকি, অন্তত আজ উৎসবের আনন্দালোকে আশ্রমের সেই অমৃতরূপকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হও। আজ উদ্‌বোধিত হও, সত্যকে দেখো। আজ বাতাসের মধ্যে সেই দীক্ষার মন্ত্র শ্রবণ করো—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্‌।

'যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত,' যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত, এবং আকাশের অনন্ত-আরতি-দীপের কোনোদিন নির্বাণ নাই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন ইহা উপলব্ধি করো!' সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে— পিতামাতার গভীর স্নেহে— মাধুর্যধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত : ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে— ভোগ করো, পরিপূর্ণরূপে ভোগ করো! মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ, কোনো লোভ না আসুক। পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক। এই তাঁর দীক্ষার মন্ত্র।

এই মন্ত্র আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে, এই মন্ত্র এই আশ্রমকে রক্ষা করেছে। এই আশ্রমের আকাশে, পুণ্য সমীরণে, নির্মল আলোকে, উদার প্রান্তরে, এই আমাদের সম্মিলিত জীবনের মধ্যে এই মন্ত্রকে দেখবার, শ্রবণ করবার, গ্রহণ করবার জন্য অদ্য এই উৎসব। চিত্ত জাগ্রত হোক, আশ্রমদেবতা প্রত্যক্ষ হোন,

তিনি তাঁর মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন। এই ফুলের মতো সুকুমার তরুণজীবনগুলির উপর তাঁর স্নেহাশীর্বাদ পড়ুক, বিকশিত হোক এরা পুণ্যে প্রেমে পবিত্রতায় ; স্মরণ করুক এই শুভদিন, গ্রহণ করুক এই মন্ত্র— এই চিরজীবনের পাথেয়। এদের সম্মুখে সমস্ত জীবনের পথ রয়েছে— অমৃত আশীর্বাদ এরা গ্রহণ করে যাত্রা করুক, চিরজীবনের দীক্ষাকে লাভ করে এরা অগ্রসর হয়ে যাক। পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি সংকটকে অতিক্রম করে যাবার জন্যে এই দীক্ষার মন্ত্র তাদের সহায় হোক : উদ্‌বোধিত হও, জীবনকে উদ্‌বোধিত করো।

প্রাতঃকাল
৭ পৌষ ১৩২১

আরো

আরো চাই, আরো চাই— এই গান উৎসবের গান। আমরা সেই ভাণ্ডারে এসেছি যেখানে আরো পাব। পৃথিবী ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, মানুষের ঘর স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ, লক্ষ্মীর কোলে মানুষ জন্মেছে। সেখানে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে। এক-একদিন তার বাইরে এসে আরো'র ভাণ্ডারের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মানুষের উৎসব।

একদিন মানুষ পৃথিবীতে দেবতাকে বড়ো ভয় করেছিল। কে যে প্রসন্ন হলে জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে, কে যে অপ্রসন্ন হলে দুর্যোগ উপস্থিত হয়— তা মানুষ কোনোমতেই সেদিন ভেবে পায় নি। যে শক্তির সঙ্গে আত্মার যোগ নেই তাকে প্রসন্ন রাখবার জন্য বলির পশু নিয়ে তখন ভয়াতুর মানুষ একত্র মিলেছে। তখনকার সেই ভয়ের পূজা তো উৎসব নয়। ডাকাতের হাতে পড়লে যেমন ভীরু বলে উঠে 'আমার যা আছে সব দিচ্ছি, কিন্তু আমায় প্রাণে মেরো না', তেমনি পৃথিবীর মধ্যে অদৃশ্য শক্তিকে খুশি রাখবার জন্য সেদিন মানুষ বলেছিল, 'আমি তোমাকে সব দেব, তুমি আমায় সংকটে ফেলো না।' কিন্তু, সে তো আনন্দের দান নয়। আনন্দের দেবতাকে উপলব্ধি করলে আর ভয় নেই। কারণ, এই আনন্দের দেবতাই যে 'আরো'— এই তো সকলকে ছাড়িয়ে যায়— যা-কিছু পেয়েছি বুঝেছি তার চেয়ে তিনি আরো : যা পাই নি, হারিয়েছি, তার চেয়েও তিনি আরো ; তিনি ধনের চেয়ে আরো ; মানের চেয়ে আরো ; আরামের চেয়ে আরো। তাই তো সেই আরো'র পূজায়, আরো'র উৎসবে মানুষ আনন্দে বলেছে, 'আমার ধন নাও, প্রাণ নাও, সম্মান নাও।' অন্তরে এবং বাহিরে মানুষের এই-যে আরো'কে জানা এ বড়ো আরামের জানা নয়। যেদিন মানুষ জেনেছে যে সে পশু নয়, তার দেবতা পাশব নয়, সে বড়ো, তার দেবতা বড়ো, সেদিন সে যে পরম দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েছে।

সেদিন মানুষ যে বিজয়ী, মানুষ যে বীর— তাই সেই বিজয়লাভের জয়োৎসব সেদিন হবে না! পাখি যেমন অন্ধকারের প্রান্তে জ্যোতির স্পর্শমাত্রে অকারণ আনন্দে গেয়ে ওঠে, তেমনি যেদিন পরম জ্যোতি তাকে স্পর্শ করেন সেদিন মানুষও গেয়ে ওঠে। সেদিন সে বলে, 'আমি অমৃতের পুত্র।' সে বলে, 'বেদাহমেতং। আমি পেয়েছি।' সেই পাওয়ার জোরে নিজের মধ্যে সেই অমৃতকে অনুভব করে ভয়কে সে আর ভয় করে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না; বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'আমার পথ সামনে, আমি পিছু হটব না, আমার পরাজয় নেই— রুদ্র, তোমার প্রসন্নতা অন্তহীন।'

একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন এখানে আমরা আনন্দোৎসব করছি তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে। সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী দেখছে— কী প্রলয়ের বিভীষিকা! সেখানে এই বিভীষিকার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রচার করছে— সেখানে ইতিহাসের ডাক এসেছে, সেই ডাক শুনে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। কে ভুল করেছে, কে ভুল করে নি— এ যুদ্ধে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ দায়ী— সে কথা দূরের কথা। কিন্তু, ইতিহাসের ডাক পড়েছে— সে ডাক জর্মান শুনেছে, ইংরাজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, বেলজিয়ান শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে— তা হবে না, ইতিহাসবিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এতদিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ করেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে। ইতিহাসবিধাতা বলেছেন, 'না, এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না।' যেমনি এই হুকুম পৌঁচেছে অমনি কামানের গোলা দুই পক্ষ থেকে সেই প্রাচীরের উপর এসে পড়েছে। বীরের দল ইতিহাসবিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে। যারা আরামে ছিল তারা আরামকে ধিক্‌কার দিয়ে বলে উঠেছে, 'প্রাণকে আঁকড়ে থাকব না, প্রাণের চেয়ে মানুষের মধ্যে আরো আরো বেশি আছে।' কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে। মা কেঁদে উঠেছে, স্ত্রীপুত্র অনাথ হয়ে বক্ষে করাঘাত করছে। সেই কান্নার উপরে দাঁড়িয়ে সেখানে উৎসব হচ্ছে। বাণিজ্য ব্যবসায় চলছিল, ঘরে টাকা বোঝাই হচ্ছিল, রাজ্যসাম্রাজ্য জুড়ে প্রতাপ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল— ডাক পড়ল বেরিয়ে আসতে হবে। মহেশ্বর যখন তাঁর পিনাকে রুদ্র নিশ্বাস ভরেছেন তখন মাকে কেঁদে বলতে হয়েছে, 'যাও।' স্ত্রীকে কেঁদে নিজের হাতে স্বামীকে বর্ম পরিয়ে দিতে হয়েছে। সমুদ্রপারে আজ মরণযজ্ঞে সেই প্রাণের মহোৎসব।

সেই উৎসবের ধ্বনি আমাদের উৎসবের মধ্যে কি আজ এসে পৌঁছয়

নি? ভীত মানুষ, আরামের জন্য লালায়িত মানুষ, যে প্রতিদিন তুচ্ছ স্বার্থ-টুকু নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করে মরেছে, কে তার কানে এই মন্ত্র দিলে 'সব ফেলে দাও, বেরিয়ে এসো'! যাঁর হাতে আরো'র ভাণ্ডার তিনিই বললেন, যাও। মৃত্যুকে অবহেলা করে বেরোও দেখি!' বিরাট বীর মানুষের সেই পরিচয়, যে মানুষ আরো'র অমৃতপানে উন্মত্ত হয়েছে সেই মানুষের পরিচয় আজ কি আমরা পাব না? আমরা কি এ দেশে অজ্ঞানদেবতা উপদেবতার মন্দির তৈরি করে ষোড়শোপচারে তার পূজা করি নি? তার কাছে মানুষের বুদ্ধিকে শক্তিকে বলি দিই নি? যে অজ্ঞানমোহে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে দূরে পরিহার করে সেই মোহের মন্দির, সেই মূঢ়তার মন্দির কি আমাদের ভাঙতে হবে না? আমাদের সামনে সেই লড়াই নেই? আমাদের মার খেতে হবে আত্মীয়স্বজনের। আমরা দুঃখকে স্বীকার করব, আমরা অপমান নিন্দা বিদ্রূপের আঘাত পাব—তাতে আমরা ভয় করব না।

আমাদের শান্তিনিকেতনে ইতিহাসবিধাতা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কোন্ অমৃতমন্ত্রে সেই শক্তিকে আমরা পাব। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। ভয় নেই, সমস্তই পরিপূর্ণতার দ্বারা আবৃত। মৃত্যুর উপরে সেই অমৃত। ঈশের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখো—সর্বত্র সেই আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হবে, ভয় চলে যাবে। দূর করো সব জালজঞ্জাল, বেরিয়ে এসো।

ভোগসুখ মোহকলুষ আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছে, নির্ভয়ে সব ফেলে দিয়ে বীরত্বের অভিষেকস্নানে শুচি হয়ে বেরিয়ে এসো। আজ জগৎ জুড়ে যে ক্রন্দন বেজেছে তার মধ্যে ভয়ের সুর নেই, তার ভিতর দিয়ে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে—তারই মধ্যে ইতিহাসবিধাতার আনন্দ। সে ক্রন্দন তাঁর মধ্যে শান্ত। সেই 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'এর মধ্যে মৃত্যু মরেছে। তিনি নিজের হাতে মানুষের ললাটে জয়তিলক পরিয়েছেন। তিনি বিচ্ছেদবিরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন। যাত্রীরা যেখানে যাত্রা করেছে, মৃত্যুর ঝংকার যেখানে প্রতি-ধ্বনিত, সেইখানে দেখো সেই 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'। আজ সেই রুদ্রের দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। রুদ্রের প্রসন্ন হাসি তখনই দেখা যায় যখন তিনি দেখতে পান যে তাঁর বীর সন্তানেরা দুঃখকে অগ্রাহ্য করেছে। তখনই তাঁর সেই প্রসন্ন মুখের হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হয়ে সত্যজ্যোতিতে অভিষিক্ত করে দেয়। রুদ্রের সেই প্রসন্নতা আজ উৎসবের দিনে আমাদের জীবনের উপরে বিকীর্ণ হোক।

প্রাতে
৭ পৌষ ১৩২১

আবির্ভাব

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।

আশ্চর্য কথা এই যে, আমরা এই গানে বলছি যে 'তুমি আমার ভবনে অতিথি হয়ে এসেছ'। এই একটি কথা বলবার অধিকার তিনি আমাদের দিয়েছেন। যিনি বিশ্বভুবনের সব জায়গা জুড়ে বসে আছেন তাঁকেই আমরা বলছি, 'তুমি আমার ভবনে অতিথি।' কারণ, আমার ভবনে তাঁকে ডাকবার এবং না ডাকবার অধিকার তিনিই আমাকে দিয়েছেন। তাই সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে ইচ্ছা করলে ভবনের দ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি।

জীবনে কত অল্প দিন আমরা সেই বন্ধুকে ঘরে ডেকে আনি— তাঁকে আমার ভবনে ডাকব এমন দিন তো আসে না। তিনি এই ঘরের প্রান্তেই মুখ আবৃত করে বসে থাকেন—অপেক্ষা করেন, 'দেখি আমায় ডাক দেয় কি না!' তিনি আমার ঘরের সামান্য আসবাবটি পর্যন্ত প্রকাশ করছেন, তিনি সর্বঘরে সর্ব-বিষয়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন, অথচ তিনিই ঘরে নেই। প্রত্যেক নিশ্বাসের ওঠানামায় তাঁর শক্তি কাজ করছে, চক্ষের প্রত্যেক পলক তাঁর ইচ্ছায় পড়ছে, রক্তের প্রত্যেক কণা নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে— অথচ আমাদের এত বড়ো আস্পর্ধা তিনি দিলেন যে, আমরা না ডাকলে তিনি ঘরে প্রবেশ করবেন না।

সেইজন্যে সেদিন তিনি আসেন সমস্ত হৃদয় খুলে দিয়ে যেদিন প্রেমের ডাকে তাঁকে ডাকি, সেদিন বিশ্বভুবনে রব ওঠে 'তিনি এসেছেন'। সূর্যের তরুণ আলোকে সেই বাণী প্রকাশ হয়, নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে সেই বার্তা ধাবিত হয়, বিকশিত পুষ্পের পাপড়িতে পাপড়িতে লেখা থাকে 'তিনি এসেছেন'। তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন আলোকের পর্দার ও পারে, জীবনের সুখদুঃখের ও দিকে— ডাক যেই পড়ল, অমনি যিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্য-চন্দ্র-তারার জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি একটি কীটের গহ্বরের মতো ক্ষুদ্র ঘরে স্থান পেলেন। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর স্থান ছিল, স্থান ছিল না এই ছোটো ঘরটিতে। এই ঘরটি ধন-জন-মানে ভর্তি ছিল, তাই তাঁর জন্য এখানে জায়গা হয় নি। কিন্তু, যেদিন এলেন সেদিন তড়িৎবেগে সমস্ত বিশ্বে এই বার্তা গোপনে গোপনে প্রচারিত হয়ে গেল— তিনি এসেছেন। ফুলের সৌন্দর্যে আকাশের নীলিমায় এই বার্তা ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

পুত্র কখনো কখনো পিতার জন্মোৎসব করে থাকে— সংসারে এমন ঘটনা ঘটে। সেদিন পুত্র মনে ভাবে যে, তার পিতা একদিন শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেদিন যেন তার ঘরে সে নূতন করে তার পিতার জন্মব্যাপারকে অনুভব করে। পিতাকে সে যেন নিজের পুত্রের মতো লাভ করে। এ যেমন

আশ্চর্য, তেমনি আশ্চর্য বিশ্বপিতা যেদিন জন্মগ্রহণ করেন আমাদের ঘরে। যিনি অনন্ত ভুবনের পিতা, তিনি একদিন আমার অন্তরের ভিতরে চৈতন্যের মধ্যে জন্মলাভ করবেন, তিনি আসবেন। পিতা নোঽসি। পিতা, তুমি পিতা হয়ে আছ— আমার জীবনকে তোমার মহাজীবনে আলিঙ্গন করে আছ— যুগ হতে যুগে, লোক হতে লোকান্তরে, আমায় বহন করে এনেছ। পিতা নো বোধি! কিন্তু, আমার বোধের মধ্যে তো তোমার আবির্ভাব হয় নি। সেই বোধের অপেক্ষায়, আমার উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় যে তাঁকে থাকতে হয়। যেদিন আমার বোধের মধ্যে পিতারূপে তাঁর আবির্ভাব হবে সেদিন পৃথিবীতে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠবে। ভক্তের চৈতন্যে সেদিন যে তাঁর নবজন্মলাভ।

সংসারের সুখে দুঃখে যখন তরঙ্গায়িত হচ্ছি চৈতন্যের মধ্যে তখন আমরা পিতৃহারা। জীবধাত্রী বসুন্ধরা পিতার সিংহাসন বহন করছে— প্রাণের ভাণ্ডার, অন্নের ভাণ্ডার সেখানে পরিপূর্ণ। কিন্তু, অন্তরে যে দুর্ভিক্ষ, সেখানে যে পিতা নেই। সে বড়ো দৈন্য, সে পরম দারিদ্র্য। যিনি রয়েছেন সর্বত্রই, তাঁকে আমি পাই না। পাই না, কারণ ভক্তি নেই। যুক্তি খুঁজে পাওয়া সহজ, কিন্তু ভক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দ সহজ না হলে পাওয়া যায় না। উপনিষদে বলে, মন বাক্য তাঁকে না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে তার আর ভয় নেই। তাঁকে দেখা উৎসবের মধ্যে দেখা— জ্ঞানে নয়, তর্কের মধ্যে নয়। আনন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুই পাবার উপায় নেই।

এই-যে উৎসবের আলোক জ্বলেছে একে কি তর্ক করে কোনো মতেই পাওয়া যেত? চোখের মধ্যে আলো পাবার আনন্দ আছে, তাই তো চোখ আলো পায়; চোখ যে আলোর জন্য লালায়িত। এক সময়ে জীবের তো চক্ষু ছিল না— চক্ষু কেমন করে ক্রমে জীবের অভিব্যক্তিতে ফুটল? জীবের মধ্যে আলোককে পাবার তৃষ্ণা ছিল, দেহীর দেহের পর্দার আড়ালে বিরহীর মতো সেই তৃষ্ণা জেগেছিল— তার সেই দীর্ঘ বিরহের তপস্যা সহসা একদিন চক্ষু-বাতায়নের ভিতরে সার্থক হল। আলোকের আনন্দদূত তার চোখের বাতায়নে এল। আলোককে পাবার আনন্দের জন্য তপস্যা ছিল—সেই তপস্যা অন্ধ জীবের অন্ধকার দেহের মধ্যে চক্ষুকে বিকশিত করে স্বর্গের আলোকের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। সেই একই সাধনা অন্ধ চৈতন্যের মধ্যে রয়েছে— আত্মা কাঁদছে সেখানে। যতদিন পর্যন্ত অন্ধ জীব চক্ষু পায় নি সে জানত না তার ভিতরে আলোকবিরহী কাঁদছিল—সে না জানলেও সেই কান্না ছিল বলেই চোখ খুলেছে। অন্তরের মধ্যে চৈতন্যগুহায় অন্ধকারে পরম জ্যোতির জন্য মানুষের তপস্যা চলেছে। এ কথা কখনোই সত্য নয় যে, কোনো মানুষের আত্মা ধনজনের জন্য লালায়িত। মগ্নচৈতন্যের অন্ধকারময় রুদ্ধ বাতায়নে বিরহী আত্মা কাঁদছে—সেই কান্না সমস্ত কোলাহলের আবরণ ভেদ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত উঠেছে। আনন্দ যেদিন আসবে সেদিন চোখ মেলে দেখব

সেই জ্যোতির্ময়কে। সেদিন তিনি আমার ভবনে আসবেন এবং বিশ্বভুবনে তার সাড়া পড়ে যাবে।

সায়ংকাল
৭ পৌষ ১৩২১

অন্তরতর শান্তি

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে।
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।

তিনি যে চেয়ে রয়েছেন আমার মুখের দিকে, আমার অন্তরের মাঝখানে— এ কি উপলব্ধি করব এইখানে? এ-সব কথা কি এই কোলাহলে বলবার কথা? তারার আলোকে, স্নিগ্ধ অন্ধকারে, ভক্তের অন্তরের নিস্তব্ধলোকে যখন অনন্ত আকাশ থেকে একটি অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টি পড়ে, তখন সেই নিঃশব্দ বিরলতার মধ্যেই এই পরম আনন্দের গভীর বাণী জেগে উঠতে পারে—এই কথাই মনে হয়। কিন্তু, তা নয়, সেই বিরলতার মধ্যেই যে সাধকের উৎসব সম্পূর্ণ হয় তা কখনোই সত্য নয়। মানুষের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনাবেচার বিচিত্র লীলা চলেছে, এরই মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই তাঁর পূজার গীত উঠছে— এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনোই তাঁর উৎসব নয়। আকাশের তারায় তারায় যে সংগীত উঠছে যুগযুগান্তর ধরে সে সংগীতের কেবলই পুনরাবৃত্তি চলছে। সেখানে কোনো কোলাহল নেই, ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই— নক্ষত্রলোকে যেন বিশ্বরূপ বাউল তার একতারার একটি সুর ফিরে ফিরে বাজাচ্ছে। কিন্তু, মানুষের জগতে যে গান উঠছে সে কি একটি তারের সংগীত? কত দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ বিরোধ-সংগ্রামের কত বিচিত্র তার সেখানে ঝংকৃত হচ্ছে— তার বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু, এই-সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে, শান্তির সুর বাজছে। মানুষের চারি দিকে ষড়্‌রিপুর হানাহানি, তাণ্ডবলীলা চলেছে— কিন্তু, এত বেসুর এসে কই এই একটি সুরকে তো লুপ্ত করতে পারলে না! সকল বিরোধ, সকল বিপ্লব, সকল দ্বন্দ্ব-বিগ্রহের ভিতর দিয়ে এই সুর বেজে উঠল : শান্তং শিবং অদ্বৈতম্‌।

মানুষের ইতিহাসে এই-যে উৎসব চলছে তারই কি একটি প্রতিরূপ আজকের এই মেলার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না? এখানে কেউ বাজার করছে, কেউ খেলা করছে, কেউ যাত্রা শুনছে— কিন্তু নিষেধ তো করা হয় নি— বলা হয় নি 'এখানে উপাসনা হচ্ছে, তোমরা সাধু হয়ে চুপ করে বসে থাকো'। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জগতের যে-একটা প্রচণ্ড কোলাহল চলছে শান্তিনিকেতনের নিভৃত শান্তিকে তা আবিল করুক। মানুষই কোলাহল

করে, আর তো কেউ করে না। কিন্তু, মানুষের কোলাহল আজ পর্যন্ত কি মানুষের সংগীতকে থামাতে পারল? ঈশ্বর যে খনির ভিতর থেকে রত্নকে উদ্ধার করতে চান, তিনি যে বিরোধের এই কোলাহলের মধ্য থেকেই তাঁর পূজাকে উদ্ধার করবেন—কারণ, এই কোলাহলের জীব মানুষ যখন শান্তিকে পায় তখন সেই গভীরতম শান্তির তুলনা কোথায়? সে শান্তি জনহীন সমুদ্রে নেই, মরুভূমির স্তব্ধতায় নেই, পর্বতের দুর্গম শিখরে নেই— আত্মার মধ্যে সেই গভীর শান্তি। চারি দিকের কোলাহল তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়—কোলাহলের ভিতরে নিবিড়রূপে সুরক্ষিত সেই শান্তি। হাট বসে গিয়েছে, বেচা-কেনার রব উঠেছে—তারই মধ্যে প্রত্যেক মানুষ তার আপনার আত্মার ভিতরে একটি যোগাসনকে বহন করছে। হে যোগী, জাগো, তোমার যোগাসন প্রস্তুত, তোমার আসন তুমি গ্রহণ করো— এই কোলাহলে, ষড়্‌রিপুর ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিরোধের মাঝখানে অক্ষত শান্তি—সেইখানে বোসো। সেখানে তোমার উৎসব-প্রদীপ জ্বালো, কোনো অশান্ত বাতাস তাকে নেবাতে পারবে না। তুমি কোলাহল দেখে ভীত হোয়ো না—ফলের গর্ভে শস্য যেমন তিক্ত আবরণের ভিতরে থেকে রক্ষা পায়, সেইরূপ কোলাহলের দ্বারাই বেষ্টিত হয়ে চিরকাল মানুষের শান্তি রক্ষা পেয়ে এসেছে। মানুষ তার বৈষয়িকতার বুকের উপর তার ইষ্টদেবতাকে সর্বত্রই তো প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে তার আসক্তি জীবনের সব সূত্রগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে, তারই মাঝখানে তার মন্দিরের চূড়া দেবলোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাদের চিত্ত আজ অনুকূল হয় নি— ক্ষতি নেই। যাক, যার মন যেখানে খুশি যাক—কোনো নিষেধ নেই। তবু এই অসীম স্বাধীনতার ভিতরে মানুষের পূজার ক্ষেত্র সাবধানে রক্ষিত হয়ে এসেছে। সেই কথাটি আজ উপলব্ধি করবার জন্য কোলাহলের মধ্যে এসেছি। যার ভক্তি আছে, যার ভক্তি নেই, বিষয়ী, ব্যবসায়ী, পাপী, সকলেরই মধ্যে তাঁর পূজো হচ্ছে। এইখানেই এই মেলার মধ্যেই তার পূজা হয়েছে, এই কোলাহলের মধ্যেই তাঁর স্তব উঠেছে। এইখানেই সেই 'শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌'-এর পদধ্বনি শুনছি, এই হাটের রাস্তায় তাঁর পদচিহ্ন পড়েছে। মানুষের এই আনাগোনার হাটেই তাঁর আনাগোনা— তিনি এইখানেই দেখা দিচ্ছেন।

রাত্রি
৭ পৌষ ১৩২১

দুই ইচ্ছা

আমাদের এই উৎসব মিলনের উৎসব।

এর মধ্যে দুটি মিলন আছে। যেমন বিবাহ-উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে বরকন্যার মিলন এবং তাকে বেষ্টন করে আছে আহূত অনাহূত রবাহূতের মিলন—পরিচিত-অপরিচিত আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মিলন। তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই মূল মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্বসাধারণের সঙ্গে আনন্দমিলন।

আজ প্রভাতে সর্বপ্রথমে সেই মূল কথাটিকে নিয়ে এই উৎসবের রাজ্যে প্রবেশ করতে চাই—সব মিলনের মূলে যে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগৎসংসার নেই, কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন, সেইখান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করব। তার পরে সেই একটিমাত্র বৃন্তের উপরে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হৃদয়পদ্মের একশো দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের একশো দিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে—তখন একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে।

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম নিভৃততম একলার কথা দিয়ে প্রভাত আরম্ভ করা যাক। কোন্‌খানে আমি আর তিনি মিলছেন সেইটে একবার চেয়ে দেখি।

রোজই তো দেখা যায় সকাল থেকেই সংসারের কথা ভাবতে শুরু করি। কেননা, সে যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কী চাই কী না-চাই, কী রাখব কী ছাড়ব, এই কথাটাকেই মাঝখানে নিয়ে আমার সংসার।

যে বিশ্বভুবনে বাস করি তার ভাবনা আমাকে ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য উঠছে না, বায়ু বইছে না, অণু পরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি, তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড়ো ভাবনা করেই ভাবতে হয়—কেননা, সেটা যে আমারই ভাবনা।

তাই এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোটো সংসারের অতি ছোটো কথা আমার কাছে ছোটো বলে মনে হয় না, আমার প্রভাতকালের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্যোদয়ের কাছে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না—এমন-কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চলতে পারে।

তবেই তো দেখছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পরসংলগ্ন হয়ে কাজ করছে—একটি

হচ্ছে বিশ্বজগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর-একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা তো রাজত্ব করছেন, আবার তাঁর অধীনের তালুকদার সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই নিজের রাজত্বটুকু জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেননা, ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা, তার কর্তৃত্ব আছে।

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন। যে লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্ছে, সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সকলের শ্রেষ্ঠ। যিনি ইচ্ছাময় তিনি 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ' আমাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক-একবার অহংকারে মত্ত হয়ে উঠি; বলি যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানি নে। এই ব'লে সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন, এইটে স্পর্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর-একটি তত্ত্ব আছে। স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে, ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। সে মায়ের কাছ থেকে কেবল সেবা চায় না; সেবার সঙ্গে মায়ের ইচ্ছাকেও চায়—বন্ধুর কাছ থেকে কেবল উপকার চায় না; বলে যে, বন্ধু ইচ্ছা ক'রেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার করুক, এমন-কি, উপকার না'ও করুক কিন্তু তার ইচ্ছা যেন আমার দিকেই আসে, আমি যেন তার অনিচ্ছার সামগ্রী না হই।

এমনি ক'রে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায়, সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না, সেখানে নিজেকে তার খর্ব করতেই হয়। আমি যেমনি ইচ্ছা তেমনি চলব, অথচ অন্যের ইচ্ছাকে বশ করে আনব—এ তো হয় না। গৃহিণীকে বাড়ির সকলেরই সেবিকা হতে হয়, তবেই তিনি বাড়ির সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করে গৃহকে মধুর করে তুলতে পারেন।

এই-যে ইচ্ছার অধীনতা, এত বড়ো অধীনতা তো আর নেই। আমরা দাসতম দাসের কাছ থেকেও জোর করে ইচ্ছা আদায় করতে পারি না। অতএব সেই ইচ্ছা যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন আর কিছুই বাকি থাকে না।

তাই বলছিলুম—ইচ্ছাতেই আমাদের স্বাধীনতার সব চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি এই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্তি। ইচ্ছা, অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে সুখ পায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো সুখ পায় প্রেমে আপনাকে অধীন ব'লে স্বীকার ক'রে।

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও এই ধর্মটি দেখতে পাচ্ছি, তিনিও ইচ্ছাকে চান। এইজন্যেই, চাইতে পারবেন ব'লেই, আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার ক'রে

দিয়েছেন। বিশ্বনিয়মের জালে তাকে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেন নি। বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ঐ একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি। সেটি আমার ইচ্ছা—ঐটে তিনি কেড়ে নেন না, চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি: ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি সে আমারই ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তাঁর ঐশ্বর্য খর্ব করেছেন। আমার কাছে এসে বলছেন—'আমি রাজ-খাজনা চাই নে, আমাকে প্রেম দাও!' হে প্রেমস্বরূপ, তোমাকে প্রেম দিতে হবে ব'লেই তুমি এত কাণ্ড করেছ! আমার মধ্যে এই এক সৃষ্টিছাড়া 'আমি'র লীলা ফেঁদে বসেছ এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ![২]

তাই যদি না হত তবে এ গানটি গাইতে কি আমার সাহস হত?—

[৩]'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও!
মাঝে কিছুই রেখো না, রেখো না—
থেকো না, থেকো না দূরে!'

এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে, বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে! বিশ্বভুবন বলতে কতখানি বোঝায়! এবং তার তুলনায় মানুষ যে এত ছোটো যে, কোনো অঙ্কের দ্বারা তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে একেবারে তাঁর পাশে এসে বসবে! অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোম-হুতাশন যুগযুগান্তর জ্বলছে—আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবির জোরে দ্বারীকে বলছি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে?

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায়, এ কি তার অত্যাকাঙ্ক্ষার অশান্ত উন্মত্ততা?—অহংকারের চরম পরিচয়?

কিন্তু অহংকারের একটা যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা করা, সেটা তো এর মধ্যে দেখছি নে—এ যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করা! তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে সে যে নিজেকে দীন করে, সকলের পিছনে সে দাঁড়ায়, যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী তাঁদের পায়ের ধুলা পেলেও সে যে বাঁচে!

সেইজন্যে জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য বলে বোধ হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায় এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড়ো সত্য বড়ো লাভ ব'লে চায়।

কেন চায়? কেননা, সে যে অধিকার পেয়েছে। হোন-না তিনি বিশ্ব-জগতের রাজাধিরাজ, এই প্রেমের দাবি তিনিই জন্মিয়ে দিয়েছেন, আবার প্রেমও তাঁরই সঙ্গে। এতে আর ভয় লজ্জা কিসের!

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ 'আমি' করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। এক দিকে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, আর-এক দিকে আমার এই 'আমি'—এ রহস্য কেন? এই ছোটো 'আমি'টির সঙ্গে সেই 'পরম আমি' যে মিলবেন!

এমন যদি না হত, তবে তাঁর জগৎ-রাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর কিসের আনন্দ? কোথাও যাঁর কোনো সমাজ নেই, তিনি কী ভয়ংকর একলা! কী অনন্ত একলা! তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই তাঁর একাধিপত্য এক জায়গায় বিসর্জন করেছেন। তিনি আমার এই 'আমি'টুকুর আনন্দ-নিকেতনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন। বন্ধু হয়ে ধরা দিয়েছেন; বলে দিয়েছেন, 'আমার চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজন-দরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে। তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম ব'লেই তুমি হয়েছ, তুমি আছ।'

এইখানেই আমার এত গৌরব যে, তাঁকে-সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি, 'আমি তোমাকে চাই নে।' সে কথা তাঁর ধুলো জলকে বলতে গেলেও তারা সহ্য করে না, তারা তখনই মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখনই বলি 'তোমাকে আমি চাই নে—আমি টাকা চাই—খ্যাতি চাই' তিনি বলেন 'আচ্ছা বেশ'। ব'লে চুপ ক'রে স'রে বসে থাকেন।

এ দিকে কখন্ এক সময় হুঁশ হয় যে, আমার আত্মার যে নিভৃতনিকেতন সেখানকার চাবি তো আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই—টাকাকড়ি ধনদৌলত কোনোমতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না, বাইরের আবর্জনার মতো পড়ে থাকে। সেখানে ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা ঘরটিকে জগতের আর একটি মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যেদিন বলতে পারব 'আমার টাকায় কাজ নেই—খ্যাতিতে কাজ নেই—কিছুতে কাজ নেই—তুমি এসো', যেদিন বলতে পারব 'চন্দ্রসূর্যহীন এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার', সেই দিন আমার 'আমি' জন্মের মতো সার্থক হবে।[৪]

"আমাদের অন্তরাত্মার 'আমি'ক্ষেত্রের একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে, জগৎ জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সবত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তা হলে জোড়হাত ক'রে মাথা ধুলোয় লুটিয়ে তাঁকে মানতুম। কিন্তু ঐ জায়গায় তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে আসে না—সেইজন্যে পাপ

ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে তো চলবে না। শাসনের দায় নেই ব'লেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বীকার না করে, তবে জন্ম-জন্ম সে কেবল দাস দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে! মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে একেবারেই পাবে না। ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্যের দৃষ্টি পৌঁছায় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা—সেইখানকার দরজাটা খুলে দে—আলো জেবলে তোল্—যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে, যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ তাঁর ইচ্ছা তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্বত্র নীরন্ধ্রনিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে, তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে 'আমি' হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরছি, সেদিন সেই বিরহদুঃখের রহস্য এক মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে।[৬]

হে আমার প্রাণের প্রাণ, [৭]জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে—ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই, যেখানে আমি হচ্ছি বিশেষ। আমি যাকে 'আমি' বলছি, এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি অপূর্ব—এ কেবলমাত্র 'আমি', একলা 'আমি', অনুপম অতুলনীয় 'আমি'। এই 'আমি'র যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহাবিজন লোকে, হে আমার অন্তর্যামী, তুমি ছাড়া কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

প্রভু, সেই-যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ বিশেষ আবির্ভাব। সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালেই নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু! এই 'আমি'-নামক তোমার সকল হতে স্বতন্ত্র এই-যে একটি বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব—একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব।

এই 'আমি'টিকে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনছ। কত সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে এ'কে তোমার পাশে ক'রে হাতে ধ'রে নিয়ে এসেছ, কিন্তু কারো সঙ্গে এ'কে জড়িয়ে ফেলো নি। কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণুপরমাণুকে চালনা ক'রে কত পুষ্টি কত পরিবর্তন কত পরিণতির ভিতর দিয়ে এই 'আমি'কে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ!

তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ যে আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্ছে এই 'আমি'র রেখা। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধু-রূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো-কিছুই তোমার সমান না হোক, তোমার চেয়ে বড়ো না হোক। আর, আমার এই-যে একটা সাধারণ জীবন, যা নানা ক্ষুধাতৃষ্ণা চিন্তাচেষ্টা-দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি, সেইটেই নানা দিক দিয়ে প্রবল হয়ে না উঠে। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর ব'লে মানি, কিন্তু 'আমি'রূপে তোমাকে আমার একমাত্র বলে জানতে চাই। এই 'আমি'ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ— তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ, অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ। আমার সব সুখের চেয়ে পরম সুখ—তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খৃস্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম, প্রিয়তম, এই 'আমি'-নিকেতনেই যে তোমার চরম লীলা—এইজন্যেই তো এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ, এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান। সেইজন্যেই তো এইখানেই মৃত্যু, এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্ছে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন এবং বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু—এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বলতে পারি, 'আমার সব মিটেছে! আমি আর কিছু চাই নে।'

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রাতঃকাল
১১ মাঘ ১৩১৫

জীবাত্মার মুক্তি

জীবাত্মার মুক্তিতে কী যায় এবং কী থাকে—একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু থাকে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর আমার পূর্বতন কোনো কোনো লেখায় আমি আলোচনা করেছি। তবু আপনার প্রশ্নের উত্তরে আর একবার সে কথাটাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করি।

জগতে যা-কিছু দেখছি শুনছি সমস্তই চঞ্চল, কিন্তু এই চঞ্চলতাই একটি ধ্রুবকে প্রকাশ করছে। কেননা, সূত্রকে আশ্রয় না করলে যেমন মোতিতেই মালা গাঁথা চলে না, তেমনি ধ্রুবকে আশ্রয় না করলে চঞ্চলতা টিঁকতেই পারে

না। সমুদ্র স্থির আছে বলেই ঢেউয়ের চঞ্চল লীলা তাকে অবলম্বন করে কলগানে নৃত্য করছে। সমস্তই চলেছে এবং চলতে চলতে বলছে 'এক আছেন', সেই চলাও শেষ হচ্ছে না এবং এই বলাও শেষ হচ্ছে না। সংখ্যাহীন গণনার দ্বারা অন্তহীন এক আপনাকে প্রকাশ করছেন। এই-যে নানা, এ যেন অনন্তের মাপকাঠির মতো, কেবলই চলছে আর বলছে 'শেষ হল না— শেষ হল না'। নানার পর নানা, তার পরেও নানা—অন্ত নেই। সচল মাপকাঠি ছাড়া অচল অনন্তকে অনন্ত বলে প্রচার করবে কে?

কিন্তু সান্তের ভিতর দিয়ে অনন্ত এই-যে আপনাকে প্রকাশ করছেন, তার দরকার কী? দরকার কিছুই নেই, অর্থাৎ বাইরের কোনো তাগিদ নেই, তাঁর আনন্দের পূর্ণতাই আপনাকে আপনি প্রকাশ করছে। প্রকাশই তাঁর স্বভাব। এইজন্য বেদে তাঁকে বলেছে 'আবিঃ', অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ।

যিনি প্রকাশস্বরূপ, প্রকাশ যদি তাঁর না হয়, তা হলেই তাঁর বাধা; প্রকাশেই তাঁর মুক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের মধ্যেই ব্রহ্মের আনন্দ উন্মুক্ত! এই জগৎকে বন্ধনরূপ বলতে পারি নে, কেননা এই তো তাঁর আনন্দরূপ। জগতে তিনি আপনাকে সর্জন করছেন, বদ্ধ করছেন না। বস্তুত জগতে তো কিছুই বাঁধা পড়তে চায় না।

কিন্তু আর-এক দিক থেকে দেখতে গেলে, প্রকাশের মধ্যেই আপনাকে মুক্তি দিতে গেলেই বন্ধনকেও মানতেই হয়, যদিচ সে আনন্দের বন্ধন। যে আনন্দে কবি কাব্য লেখে সেটাকে যদি অন্তরে রুদ্ধ করে না রাখা হয়, যদি তার স্বাভাবিক প্রকাশ-চেষ্টাকে মুক্তি দিতে হয়, তা হলে স্বেচ্ছায় ছন্দোবন্ধকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

এইজন্যে যদিচ অনন্তের আনন্দ হতেই সমস্ত সৃষ্ট হয়েছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, তবুও—স তপোঽতপ্যত। এই আনন্দকে প্রকাশ করবার যে তপ তা স্বীকার করতেই হয়েছে, বাধার বন্ধনরূপ ছন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া বিশ্বকবির আনন্দ ব্যর্থ হয়ে যায়। এই বাধা বাইরের বাধা নয়, এ বাধা লীলার। সেইজন্যে, আমরা বিপরীত দিক থেকে দেখতে গিয়ে একে দুঃখরূপে যদি বা দেখি, কবির কাছে এ আনন্দের।

ভাবটাকে বাদ দিয়ে রূপটাকেই আমি যদি একমাত্র করে দেখি তা হলে ভিতরকার আনন্দকে জানতেই পারি নে—কেবল তপটাকেই দেখি, দুঃখটাকেই পাই। এই বাইরের দিকটাই চঞ্চল দিক, এর কেবলই পরিবর্তন। এইটেকেই যখন একমাত্র জানি তখন এই চঞ্চলটাকে স্থির করে পাবার বৃথা চেষ্টা করে মরি। কেননা আমরা স্থিরকেই যথার্থ পেতে চাই। ধ্রুবকে যখন দেখতে পাই নে এবং চঞ্চলকেই যখন ধ্রুব করে তোলবার জন্যে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি, তখন আমাদের দুঃখের সীমা থাকে না। কে তখন আমাদের বুঝিয়ে দেবে যে, যা যায় তাকে যেতে দিলেই তবে যা থাকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ছন্দ দাঁড়িয়ে নেই, সে কেবলই বয়ে চলেছে। যে পদটা

অত্যন্ত ভালো লাগছে তাকেও ত্যাগ করে এগোতে হবে—এতে যে দুঃখ বোধ করে সেই মূঢ়। যে লোক কবিতার প্রথম পদ থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই কবির একই ভাবরসকে অখণ্ড জেনে কাব্য পড়ে, পড়তে তার দুঃখ নেই, এগোতেই তার আনন্দ—সে যাকে ছেড়ে চলে, সমস্তের মধ্যে তাকেই আরো বেশি করে পায়—এইজন্যেই সে যাওয়াটাকে ভয় করে না, সে যাওয়ার ভিতর দিয়েই থাকাটাকে দেখে। অনন্ত ধ্রুবকেই চলার মধ্যে যে চিনে নিয়েছে, চলাতেই তার সুখ। সমস্তই কেবলই যাচ্ছে অথচ কোথাও লেশমাত্র ফাঁক পড়ে যাচ্ছে না, এরই দ্বারা আমরা পূর্ণতাকে সত্যভাবে দেখতে পাচ্ছি—এইরূপে অন্তহীন ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই যখন অক্ষয়কে আমরা দেখতে পাই তখনই তাকে আমরা চিনি।

এইজন্যে মৃত্যুর বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অমৃতের পূর্ণতাকে দেখবার সুযোগ পাই। মৃত্যু তো পদে পদেই, সেইজন্য অমৃত পদে পদেই প্রকাশমান। গানের প্রত্যেক সুরটি কেবলই সরে সরে যায়। সেইজন্যেই গানের অখণ্ড রাগিণী প্রকাশ পাচ্ছে। একই সুর যদি স্থির হয়ে লেগে থাকত তা হলে কেবল সেই সুরটাকেই দেখতে পেতুম, রাগিণীকে দেখতে পেতুম না। সুর চলতে থাকে বলেই রাগিণীর প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। রাগিণীকে মনের মধ্যে যে একবার পূর্ণ করে দেখে নিয়েছে, গানের প্রত্যেক খণ্ড সুরেই সে অখণ্ডের আনন্দকে লাভ করে; কোনো সুরকেই তার আর বর্জন করতে হয় না—যে সুর যাচ্ছে এবং যে সুর আসছে সমস্তকেই সে পূর্ণের মধ্যে পেতে থাকে। তার কাছে সুরের চলে যাওয়া লেশমাত্র ক্ষতি নয়।

কেননা, সে তখন কানের মধ্যে নিচ্ছে গতিটাকে, অন্তরের মধ্যে পাচ্ছে স্থিতিটিকে। নইলে, শুদ্ধমাত্র গতির দিকে তাকালে গতির তাৎপর্য পাওয়া যায় না, সুরকেই একান্ত করে জানলে রাগিণীকে জানা যায় না। সেই রকম শুদ্ধমাত্র স্থিতির দ্বারাই স্থিতিকে জানা যায় না—সুরের গতিকে একেবারে বর্জন করে রাগিণীকে ধরতে পারা যায় না। এইজন্যে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ঐক্য আছে এইটি জানতে গেলেই, ভেদ থাকা চাই। এই ভেদের প্রয়োজন ভেদকেই জানবার জন্যে নয়, অভেদকে জানবার জন্যেই। যখন ভেদকেই জানি তখন আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ; ভেদের মধ্যেই যখন অভেদকে জানি তখনই আমাদের মুক্তি, আমাদের আনন্দ। ভেদকে তখন লীলা বলেই জানতে পারি এবং সেই লীলাতেই যোগ দিই, সে লীলাকে লুপ্ত করতে চাই নে। কেননা ভেদ তখন বিচ্ছেদের ব্যবধান নয়, ভেদই তখন মিলনের সেতু।

ঈশ্বরের আনন্দ সার্থক হচ্ছে বন্ধনে (যেমন কবির আনন্দ সার্থক হচ্ছে কাব্যে); জীবের বন্ধন সার্থক হচ্ছে আনন্দে (যেমন পাঠকের পাঠদুঃখ সার্থক হচ্ছে কাব্যরসে); ঈশ্বর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে জীবাত্মায় প্রকাশমান হচ্ছেন, জীব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঈশ্বরে উত্তীর্ণ হচ্ছে—মিলনের এই বিচিত্র লীলা নিয়তই চলছে—যে দিক থেকে দেখ এই লীলার মাঝখানে থেকে যাচ্ছে

একটা বাধা—তাকে মায়া বলো, বন্ধন বলো, সংসার বলো, যা খুশি। এ'কে কেউবা গালি দিই, কেউবা অস্বীকার করি, কেউবা ভালো বলি—কিন্তু, মাঝখানটাতে এ রয়েইছে। এই বাধাকে যদি চরম বাধা বলে মনে করি তা হলেই ভয়—কিন্তু, সেটাকে যদি মাঝখানকার জিনিস বলেই জানি তা হলে না তার প্রতি ভয়, না তার প্রতি একান্ত আসক্তি থাকে। অথচ তখন তার প্রতি প্রীতি বেড়ে ওঠে। কেননা তার ভিতর দিয়ে যখন আনন্দকে পাই তখন সেও আনন্দময় হয়ে ওঠে; ছন্দের মধ্যে দিয়ে যখন কাব্যরসকে পাই তখন সেও কাব্যরসের আনন্দের অন্তর্ভূত হয়ে প্রকাশ পায়—সেই রস যখন না পাই তখন সমস্তটাই পরীক্ষার পড়ার মতো বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে আমার বলবার কথাটি হচ্ছে এই যে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদ-বিলুপ্তিই মুক্তি নয়, ভেদের চরিতার্থতাই মুক্তি।

মনুষ্যত্বের সাধনা

আমরা যদি শুনি কাল বাংলাদেশের লাটসাহেব এখানে আসবেন, তা হলে এখন থেকেই চারি দিকে মাজাঘষা আরম্ভ করে দিই, সমস্ত সাফ্‌সোফ করে সব সুন্দর সুশোভন করে তুলবার চেষ্টা করি। কারণ, যিনি আসবেন তাঁকে সম্মান করতে হলে জায়গাটি তো তাঁর উপযুক্ত করতে হবে। যেখানেই সম্মান আছে সেখানেই চেষ্টা আছে; যাকে সম্মান করি তার জন্য আসন করি, মালা গাঁথি।

আমরা লাটসাহেব এলে তার জন্যে এত ধুমধাম করতে প্রবৃত্ত হই, অথচ আমাদের নিজেদের মধ্যে যে লাটসাহেবটি আছেন, যেখানে আমাদের আত্ম-সম্মান জেগে রয়েছে, সেখানে তাঁকে প্রতিদিন অপমানিত করতে আমাদের বাধে না। এই-যে দেখতে পাই যেমন তেমন করে বাস করছি, নিজেদের মধ্যে যে বড়ো রয়েছেন তাঁকে কোনো সম্মান কোনো আদর করছি না—এর মানে কী? যার মধ্যে আত্মসম্মান জাগ্রত সে তো এমন করে থাকতে পারে না—সে আপনার মর্যাদা রক্ষা করবার নিয়ত চেষ্টা করে, সে নিজের চারি দিক থেকে মলিনতা দূর করে। কারণ, সে জানে মানুষ কত বড়ো—মানুষের বাসস্থানের চারি দিক কুৎসিত মলিন হলে মানুষকেই অপমানিত করা হয়, মানুষের মর্যাদাকে আঘাত করা হয়। তাই দেখা যায় যে, যার মধ্যে এই মনুষ্যত্বের গৌরববোধ আছে সে প্রাণপণে সেই গৌরবরক্ষার চেষ্টা করে. আর, যার নেই সেই বলে 'এতটা আমি পেরে উঠি না'। কিন্তু পারি না এ কথা সত্য নয়, সত্য কথা হচ্ছে—তার মধ্যে তাগিদ নেই। যদি কাল রাজা এসে উপস্থিত হন তা হলে তো দেখি সব পারা হয়—সব পরিষ্কার করা হয়, সাজানো হয়, সমস্ত স্থান ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হয়ে ওঠে। 'পারি না' মানে

সেই শক্তিকে জাগাই না, 'পারি না' মানে সেই গৌরববোধ নেই যাতে শক্তিকে জাগিয়ে দেবে। সত্য কথাটা হচ্ছে তাই। নিজের শক্তির প্রতি যাদের সম্মান-বোধ নেই— 'আমি পারি না, আমার দ্বারা অত অনাবশ্যক পরিশ্রম হয়ে ওঠে না, আমি যেমন তেমন করে জন্তু-জানোয়ারের মতো থাকব' এ কথা তারাই বলে— আর কেউ নয়।...

আমাদের দেশে এখনকার কালে মানুষ বলতে আরম্ভ করেছে— মানুষ যেখানে ঈশ্বরকে বড়ো বলে ভাবতে পারে না, সেখানে ঈশ্বরকে ছোটো হতে দাও। মানুষকে বিদ্যাতে ছোটো করো, বুদ্ধিতে ছোটো করো— এমন কথা বলতে পারি না— বলতে লজ্জা পাই। কিন্তু মানুষের যেখানে সব চেয়ে বড়ো হবার পথ রয়েছে সেইখানে তার বোধকে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করা দরকার, সেইখানে মানুষ বড়ো বোধের অধিকারী হতে পারবে না— এমন কথা বলতে আমাদের কোনো লজ্জা নেই। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অগণ্য সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে যেখানে আনন্দের উৎস, অনন্তজীবনের প্রাণের উৎস, নিয়ত উৎসারিত হচ্ছে— সেই অনন্তশক্তি অনন্তপ্রাণ অনন্ত-আনন্দ যিনি বিশ্বের মধ্যে আপনাকে অজস্রভাবে বিকীর্ণ করছেন— তাঁকে মানুষ বুঝবে না? যেখানে মানুষ সব চেয়ে বড়ো বোধের অধিকারী সেইখানেই তার বোধের খর্বতা হবে? সেইখানেই তার বোধ অপমানিত হবে? সেই অনন্তস্বরূপকে বুঝতে পারা যায় না বলে মানুষ ছোটো করবে?

...বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সিংহাসনে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র সূর্যের প্রচণ্ড শক্তি-পুঞ্জকে সংহত সংযত করে যে রাজরাজেশ্বর দেবতা বসে রয়েছেন, সমস্ত দেশকাল যাঁর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন, মানুষ তাঁকেই সমস্ত হৃদয় দিয়ে পূজা করতে পারে। তুমি ভাবছ তিনি আপনার সিংহাসনে আপনি অধিষ্ঠিত, কিন্তু আমি তাঁকে আমার স্বকৃত আয়োজনের মধ্যে ডাকব। সত্যই তো, এও তো আমারই সিংহাসন। তিনি তো তাঁর বিশ্ব-আসনে বসেছেন, কিন্তু আমি যখন তাঁকে সেই-খানে পূজা করি তখন সেই বিশ্বের আসনকে আমিই তো পূজার আসন করে তুলি— এমনি করে তাঁরই আসনকে আমার নিজের হাতে পাতা আসন-রূপে সৃষ্টি করি। সে আমারই জ্ঞানের সৃষ্টি, আমারই ভক্তির সৃষ্টি। সেই জ্ঞান সেই ভক্তিকে যতই বড়ো করি ততই তাঁরই নিজের সৃষ্টির সঙ্গে আমার সৃষ্টি এক হয়ে আসে, তখন তাঁরই মন্দির আমার মন্দির হয়। যদি সমস্ত ইচ্ছাকে প্রেমকে জাগিয়ে বলি 'তুমি তোমার অনন্ত সিংহাসনে বোসো, তুমি তো বসে আছই, আমি আমার করে সেখানে তোমাকে বসাব— আমি সেখানে তোমায় প্রণাম করব, সে প্রণাম করবার শক্তি আমার মধ্যে রয়েছে'— তবেই তাঁর পূজা হল, তবেই আমার সঙ্গে তাঁর মিল হল।

কিন্তু কোনো কোনো লোক বলে, 'এখানে তো আমার শক্তির পরিচয় হল না, ঈশ্বরকে আমার নিজের মতো করে নিতে হবে।' নিজের মতো তো এই-ই— নিজের সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত আনন্দ জাগালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই

অনন্ত ঈশ্বরকে তো এমনি করেই দেখা যায়। এইখানেই তো পূজার আসন, এই বড়ো জায়গাতেই তো যথার্থ পূজা। এ কেবল চোখ চেয়ে দেখার উপর নির্ভর করে। দেখছি মনকে খুলে দিয়ে এই উদার ধরণীতলে, এই নীলাকাশে, অন্তরের অন্তরে সমস্ত নির্মল করে সেই ভূমাকে, সেই প্রাণের প্রাণকে। তিনি এত বড়ো, অথচ তিনি আমার নিশ্বাসের নিশ্বাস হয়ে আমার নিকটতম হয়ে আছেন। এই কথা মানুষের কানে বলতে হবে না— 'তুমি পারো না, পারো না, পারো না!' বলতে হবে— 'এই বোধই তুমি উপলব্ধি করতে পারো, পারো পারো।' না যদি পারো তবে 'মহতী বিনষ্টিঃ'।

তাঁকে নিয়ে তোমরা তর্ক করবে? বিতর্ক করবে? তোমরা সমস্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে তাঁর কাছে যাবে না? দীনহীন হয়ে, দুর্বল হয়ে, চিত্তকে অপবিত্র ক'রে, বুদ্ধিকে হীন ক'রে, তাঁর কাছে যাবে? মনুষ্যত্বের সমস্ত দীপগুলি জ্বালিয়ে উজ্জ্বল হয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। শোনো তোমরা অমৃতের পুত্র-সব, তোমরা যে বাস করছ সে দিব্যলোকে।...

অন্ধকারের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছি, দেখতে পাই না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় রূপ। নিজের প্রবৃত্তিতে জড়িয়ে আছি, তোমার জ্যোতির আসনে তুমি যে উপবিষ্ট তা আর দেখতে পেলুম না। এমনি করে জীর্ণ হয়ে মরছি। মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও— ভুলে যাই সমস্ত ক্ষুদ্রতা গ্লানি অগৌরব, আনন্দময় হয়ে যাই। বিরাজ করি তোমার আনন্দলোকে, সত্যলোকে। আমার মধ্যে তোমার অবির্ভাব সত্য হোক— বাক্যে আচরণে, সুখে দুঃখে, মানে অপমানে। তুমি আছ, তুমিই আছ। রুদ্র, তোমার প্রসন্নতা সমস্ত আক্ষেপকে দূর করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শান্তিনিকেতন
২৭ ফাল্গুন ১৩২০

বর্ষশেষ

তিনশো চৌষট্টি দিন পূর্বে অন্ধকার রজনীর তোরণদ্বার উদ্ঘাটন করে যে বৎসরটি এসেছিল, সে অদ্য আর-এক রজনীর তোরণদ্বার উন্মোচন করে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলে। সেই-যে দূতী তাঁর কাছ থেকে এই বৎসরের আরম্ভে আমাদের কাছে এসে দেখা দিয়েছিল, সে সম্বৎসর আমাদের জীবনের ভাণ্ডটি কত রসে পূর্ণ করে দিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছে! সকলের

চেয়ে যে বড়ো দানটি সে আমাদের দিয়েছিল সে হচ্ছে চলবার অমৃত। আমাদের দেহ প্রাণ হৃদয় মনকে এক বৎসরের মতন সে চালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। বিশ্বজগতের প্রাণপ্রবাহিণী যে ধারা নূতন নূতন তরঙ্গবিক্ষেপে চলেইছে, সেই বিশ্বব্যাপী চলার নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে আমাদের জীবনকে সে বেঁধে দিয়েছে, নাচিয়ে দিয়েছে। আজ অন্ধকারের মধ্যে রাজপ্রাসাদের তোরণের সামনে সেই দূতী যখন বিদায় নেবার উপক্রম করছে, আমাদের জীবনের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে তার রিক্ত ভাণ্ড নিয়ে সে যখন চলে যাচ্ছে, তখন তার সেই শূন্য ভাণ্ডটির মধ্যে আমাদের এক বৎসরের প্রণামটি সমর্পণ করবার জন্য আমরা এখানে আজ মিলিত হয়েছি। এই এক বৎসর কত দিনের সূর্যের আলো, কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারা, কত বন্ধুত্ব, কত প্রেম, কত নূতন পরিচয়, কত লীলা, চেতনার কত অনির্বচনীয় স্পন্দন আমরা জীবনের মধ্যে ভরে ভরে পেয়েছি— আজ তারই পরিবর্তে আমাদের প্রণামটি সে নিয়ে যাক।

বর্ষশেষের দিনটিকে আমরা মনের মধ্যে বিদায়ের দিন ব'লে কল্পনা করি। আমাদের জীবনে যত বিচ্ছেদ ক্ষতি ও মৃত্যু ঘটেছে, আমরা সেই-সমস্তকে পুঞ্জীভূত করে এই বর্ষশেষের দিনকে তারই একটি প্রতিমার মতো মনে করি। এটা মানুষের স্বভাব। মানুষ ছোটো ব'লে অসম্পূর্ণ ব'লেই সমগ্রতাকে সমগ্রভাবে দেখতে পায় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে। অথচ জগতে ক্ষতি কিম্বা মৃত্যু তো কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। তাকে স্বতন্ত্র করে কোথায় দেখা যাচ্ছে? মৃত্যু যদি কোনো একখানেও একান্ত হয়ে থাকত, তবে জগতের মধ্যে এমন একটি ছিদ্র হত যাতে জগৎটা তলিয়ে যেত। ছায়াপথে আলো অন্ধকারের মিলনের মতো জীবনের সঙ্গে ক্ষতি দুঃখ মৃত্যু যে মিলিয়ে রয়েছে, গাঁথা হয়ে রয়েছে।

কিন্তু তা হোক। এই-যে যা-কিছু পেয়েছি তা হারাবার সময় সেগুলি একান্ত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দেখা দেয়, এরও একটা সার্থকতা আছে। সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় বিদীর্ণ মেঘের ভিতর থেকে ম্লান স্বর্ণচ্ছটার মধ্যে যেমন একটি সকরুণ সৌন্দর্য, এর মধ্যেও তেমনি একটি বেদনাময় সৌন্দর্য আছে। ছোটো শিশু অন্ধকারকে কল্পনার দ্বারা ভয়ঙ্কর মনে ক'রে কেঁদে ওঠে এবং মায়ের মন থেকে সেই কান্নাই একটি বিশেষ মাধুর্যকে আকর্ষণ করে আনে। তখনই মা তাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেন এবং আঁকড়ে ধরতে সুখ পান। আমাদের ভয়ের মধ্যে এই রসটি আছে। আমরা মৃত্যুকে আলাদা ক'রে কালো ক'রে যে দেখছি আর ভয় পাচ্ছি, এতে আমরা যে ছোটো এই কথাই তো প্রকাশ পাচ্ছে। বড়োর কাছে ছোটোর যে ভারী একটি রস আছে। আমাদের এই অসম্পূর্ণতা যদি না থাকত, তবে প্রেমের কী কাজ থাকত? যদি আমরা ভয়ই না পাব, তবে মায়ের বক্ষ এমন অভয়নিকেতন কেন হবে? ভয়ের মধ্যে এই একটি গভীর সার্থকতা রয়েছে। কেননা, ভয়ের কারণটা সত্য নয়— সত্য হলে এ রসটি থাকত না। তিনি ভয়ানক নন, তিনি সত্যসত্যই ভয়ানক হলে

পৃথিবীতে দানবের লীলা ঘটত। ভয় পাবার সার্থকতাই হচ্ছে যে সেটা সত্য নয়, সত্য হচ্ছে মায়ের বক্ষ। মা যে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে টেনে নেন। মৃত্যুর শূন্যতার পশ্চাতে তিনিই যে বাহুবিস্তার করে রয়েছেন। মৃত্যুর তাড়নায়, বিষাদের বেদনায় যদি ঝাঁপ দিই, তবে দেখব যে শূন্যতায় ঝাঁপ দিই নি—শূন্যতা কোথাও নেই। ভয়ের মধ্য দিয়ে এই অভয়ে উত্তীর্ণ হওয়া, অসত্যের মধ্য দিয়ে এই সত্যে উত্তীর্ণ হওয়ার ভিতরে এই একটি সৌন্দর্য আছে—মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধের মধ্যে যে সৌন্দর্য দেখতে পাই। অপূর্ণের সঙ্গে পূর্ণের সম্বন্ধের মাঝখানে এই ভয়ের মায়া রচিত হয়েছে। এ যে মায়া তা কখন্ বুঝি? যেমনি আনন্দনিকেতনে পৌঁছি, যেমনি বুক ভরে মাকে পাই। অমনি আমরা বলে উঠি, 'কী মিথ্যা সব ভয় পেয়েছিলাম!' অথচ তখন ভয় পেয়েছিলাম বলেও সুখ হয়। যাকে প্রাচীরের মতো অলঙ্ঘনীয় মনে করেছিলুম সে যে একটা কালো পর্দার মতো, সে যে স্পর্শমাত্রেই সরে গিয়েছে, এই কথা মনে করেও আনন্দ। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি হাসছেন। তিনি জানেন যে, এ কান্না কিছুই না, এ ভয় একেবারে মিথ্যা, হাত বাড়িয়ে দিলেই তাঁর বুকের মধ্যে একেবারে অক্ষয় সান্ত্বনা লাভ করা যায়। জগতের মধ্যে পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের এই এক খেলা চলছে, এর মধ্যে সৌন্দর্যের পরিসীমা নেই।

এই সত্যটি অনুভব করবার জন্য বিদায়কে সামনে নিয়ে, মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, আজ আমাদের উপাসনা। এর পিছনে তিনি আছেন, এই কথাটি অনুভব করবার জন্য আজ উপাসনা। সামান্য নিন্দা অপমান আঘাত ও ক্ষতিকে যে আমরা সম্বৎসর অত্যন্ত একান্ত করে দেখেছি, আজ বৎসরের শেষ দিনে বলি—সেই মায়া আজ কাটল, সেই পর্দার আড়ালে যে বাহু বাড়িয়ে তুমি রয়েছ আজ তা নিশ্চিতরূপে জানলাম। তোমায় আমায় যেটুকু ব্যবধান সে আমারই ব্যবধান, আমারই কল্পিত ব্যবধান। সম্বৎসর যা আমাকে পীড়ন করেছে, যা ভারের মতো জমে উঠে আমাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, এক মুহূর্তে সমস্ত কোথায় মিলিয়ে যাবে—সমস্ত জীবন তোমার বাহুর বেষ্টনে ধরা দেবে। যা হারিয়েছি তার সহস্রগুণ পাব। এই কথা বলবার জন্যেই আজ আমাদের বর্ষশেষের উপাসনা। এই উপাসনাকে আমরা সত্য করি।

যাকে মন্দ বলেছি, ঘৃণা করেছি, আজ হাসিমুখে বলি—সে-সব মায়া। সত্য তোমার প্রেম, সত্য তোমার মঙ্গল, অনন্ত সত্যরূপে তুমিই বিরাজ করছ—আর-সব মিথ্যা। মাথা নত করে বলি—যা দিয়েছ তুমি বেশ দিয়েছ। মৃত্যু দিয়েছে, অমৃত তার চেয়ে অনেক বেশি। দুঃখ দিয়েছ, আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশি। কোন্ দুঃখ, কোন্ মৃত্যু ভয় দেখাতে পারে? তুমি যে অমৃতময়ী জননী—আমাকে ভয় দেখাতে পারে এমন ভয় তোমার রাজ্যে থাকবে কোথায়? তোমার অমৃতমন্ত্র শুনিয়ে দাও—সমস্ত দুঃখ আনন্দময়

হয়ে উঠুক, সকল মৃত্যুশোক বিচ্ছেদ বেদনার পিছনে তুমি রয়েছ আমি যেন দেখতে পাই, চোখ মেলে দেখতে পাই।

কেন বলছি আমরা মৃত্যুকে দেখছি— ক্ষতিকে দেখছি ? কোথায় দেখছি ? সেই-সব পণ্ডিতেরা যারা বিশ্বকে মৃত্যুনিকেতন বলছে, তারা মৃত্যুকে দেখলে কোথায় ? এই-যে আকাশ প্রতি রাত্রে নক্ষত্রমণ্ডলীর স্বর্ণাক্ষরে কী আশ্চর্য লিপি লিখছে, সে কি মৃত্যুর লেখা লিখছে ? এই-যে বিশ্বের জীবপ্রবাহ নিমেষে নিমেষে তরঙ্গিত মুখরিত হয়ে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্য থামে নি, এর মধ্যে মৃত্যুকে কে কোথায় দেখল ? কোন্‌খানে ক্ষয়ের, জরার, বিকারের লক্ষণ দেখা গেল ? সংসারকে তো চিরনবীন চিরপ্রাণময় করেই দেখছি। অসীম প্রাণের আনন্দ যেখানে আপনাকে আপনি অজস্র দান করছে, সেইখানে নিশ্বাসে নিশ্বাসে সেই আনন্দকে গ্রহণ করেও এত বড়ো মিথ্যা কথাটা কোন্‌ পণ্ডিত বলে— সংসারে কেবল মৃত্যু— কেবল ক্ষতি ? মৃত্যুকে তো এর মধ্যে কোথাও দেখি নি, সে তো এক জায়গাতেও দাঁড়াতে পায় নি। সে বলুক দেখি একটি কণাকেও সে জয় করতে পেরেছে— একটি সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানেও তার জয়পতাকা নিহিত হয়েছে। সে কোথাও স্থান পায় নাই।

এইখানেই সেই বৈকুণ্ঠলোককে দেখো ; মরে গিয়ে কোথাও যে দেখবে তা নয়। সংসারেরই কেন্দ্রস্থলে সেই জননী বসে রয়েছেন ; এইখানে এই অন্তঃপুরের মধ্যে দেখো অনির্বাণ দীপ জ্বলছে। মৃত্যু সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে ? না। এই-যে বর্ষ চলে যাচ্ছে, এ যে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে সামনের দিকে আঙুলের সংকেতে দেখিয়ে দিচ্ছে— ঐ অচল পরিপূর্ণতা। সন্ধ্যায় যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছে তখনই তো মাকে নিবিড় করে অনুভব করবার সময়। তখনই তো সকল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে মিলন ঘন হয়ে উঠবে। এই অন্ধকারই তো অন্তঃপুর।

খেলা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন সেই খেলাঘরের ভাঙাচোরা খেলনার মাঝখানেই আজ তোমাকে পাওয়ার উৎসব। আমাদের এই ভগ্নাবশেষের মধ্যেই তুমি আজ এসো— ধুলোর ঝড় উড়িয়ে তুমি এসো— কারণ, খেলা তো ফুরোবার নয়, তুমিই যে আমার খেলার সাথি। তোমার খেলার উপকরণ ক্রমাগতই আমার জীবনের ঘরে নূতন নূতন করে জমে জমে উঠবে। হে পরিপূর্ণ আনন্দ, তোমার সান্ত্বনার করস্পর্শে সমস্ত শোক বিচ্ছেদ ক্ষতি ও ভয় দূর হয়ে যাক, জীবন রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক— আজ তোমার কাছে বর্ষশেষে আমাদের এই প্রার্থনা।

শান্তিনিকেতন
৩০ চৈত্র ১৩২০

নববর্ষ

আমি যখন বালক ছিলাম তখন আমার পিতা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে ভ্রমণ করতে বেরোবে।' আমার সেদিন কী আনন্দ হয়েছিল তা আমি ভুলতে পারব না। তার পূর্বে আমি কোনোদিন বাড়ি থেকে বাইরে যাই নি। বাইরের পৃথিবী অঙ্গুলিসঙ্কেতে কত রকম করে আমাকে ডেকে গিয়েছে, আমার অন্তরের মধ্যে তার দূতেরা গোপনে প্রবেশ করে আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছে, তবু আমার বাইরে বের হবার সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু যেদিন আমার পিতা আমাকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে ভ্রমণে যাবে', সেদিন মুহূর্তের মধ্যে মন এমন আনন্দিত হল, আমি যেন তাঁর সেই আহ্বানের দ্বারাই নিজেকে মুক্ত বলে অনুভব করলুম। পরের দিন সকালে যখন ঘণ্টা বাজল, যাত্রা করতে হবে বলে মন প্রস্তুত হয়ে উঠল, তখন পুলকে আকাশকে কী আনন্দময়, পৃথিবীকে কী সৌন্দর্যময় বলে অনুভব করেছিলুম সেই কথা আজ মনে পড়ে।

আমাদের বিশ্বপিতা ঠিক সেই রকম করেই আমাদের আহ্বান করেছেন, প্রতিদিন প্রভাতের আলোতে ঘন্টা বেজেছে— যাত্রা করবার ঘন্টা। তিনি বলেছেন 'আমার সঙ্গে তোমাকে ভ্রমণ করতে বের হতে হবে', কিন্তু সে কথা কি আমাদের কানে পৌঁছয় নি? প্রভাতের আলোকে, পাখির গানে, বিশ্বের সকল আনন্দের সুরের মধ্যে তাঁর সেই ডাকটি রয়েছে— 'তুমি আমার সঙ্গে ভ্রমণ করতে বেরোবে'।

আমাকে সেই বাল্যকালে যেদিন পিতার সঙ্গে ভ্রমণে যেতে হয়েছিল সেদিন যদি আমাকে একলা ভ্রমণ করতে হত, পিতা যদি আমার সঙ্গে না থাকতেন, তা হলে সে কত ভয়, কত আশঙ্কা! পথের কষ্ট ছিল, কিন্তু তাতে গৌরব বোধ করেছিলাম। নিয়মিত অভ্যাসের কত ব্যতিক্রম ঘটেছে— হয়তো ভোরে একটুখানি দুধ পান করে সমস্ত দিন পথ চলেছি। পিতা আমাকে খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'তোমার বেশ সহিষ্ণুতা আছে।' সেই কথা শুনে মনে কত আনন্দ, কত গর্ব হয়েছিল! আমি যে পারি, যা কঠিন তাকে বইবার শক্তি যে আমার আছে, এই কথা ভেবে পথের সমস্ত ক্লেশ কেমন আনন্দের সঙ্গে বহন করেছিলাম। ঠিক তেমনি, জীবনের যাত্রাপথে আমি একলা চলছি না, আমার সেই পরমপিতার সঙ্গে যাত্রা করেছি, এ কথা মনে করলে মনে ভরসার আর অন্ত থাকে না।

পিতার নিমন্ত্রণ। আমরা অভ্যাসে বদ্ধ হয়ে থাকি বলেই তাঁর সেই ডাক শুনতে পাই না। তিনি কি এই অনন্ত পথে আমরা হারিয়ে যাব ব'লেই, কেবল দশ দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াব ব'লেই, আমাদের কাছে যাত্রার আহ্বান পাঠিয়েছেন? না, তিনি তো পথে আমাদের একলা ছেড়ে দেন নি,

তিনি যে বলেছেন 'তুমি আমার সঙ্গে বের হবে'— সে ডাক কি আমরা শুনব না? এত বড়ো শক্তির ক্ষেত্রে, প্রাণের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের হাতে ধরে নিয়ে যাবেন ব'লে যখন প্রভাতের আলোকে তার আনন্দের গান— তাঁর পথযাত্রার গান ধ্বনিত করে তুলছেন— আমাদের মন তখন কোন্ সংস্কারের কঠিন দুর্গে সুপ্ত হয়ে নিশ্চেতন হয়ে রয়েছে! তিনি বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে আলোকের করাঘাত করছেন— এখনই তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেই সমস্ত বন্ধন মোচন হয়ে যায়, বিরাটের মধ্যে তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে পড়বার নিবিড় আনন্দকে অনুভব করা যায়। সেই মুক্তির আনন্দ বৎসরে বৎসরে এই দিনে এমনি প্রভাতের আলোকে এসেছে, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মন সাড়া দিয়ে উঠেছে, কিন্তু আবার ভুলে গিয়েছে। আবার আজ এসেছে নববৎসরের এই নূতন দিনটিতে তাঁর সেই বেরিয়ে পড়বার আহ্বান।

কেন? তিনি বেরিয়ে পড়বার জন্য আমাদিগকে এমন করে অস্থির করছেন কেন! কেন? দেখতে পাচ্ছ না বিশ্ব কী বৃহৎ— এখানে প্রাণের ও শক্তির কী সীমাহীন নিরন্তর লীলা! এ কি বসে থাকবার জন্য হতে পারে! আমরা বসে থাকব বলে কি এত বড়ো আয়োজন বিধাতা কখনো করতে পারেন! আমরা কত নিয়ম, আচার বিচার, ভাগ বিভাগ, কত-কী কৃত্রিমতা তৈরি করেছি— কত নিষেধ তৈরি করেছি! কিন্তু তাঁর সমুদ্র, তাঁর পর্বত তো মানুষকে নিষেধ করতে পারে না; তিনি যে নিজেই মানুষের জীবনের মধ্যে প্রাণের বেগ সঞ্চার করে দিয়েছেন; মানুষের প্রাণের মধ্যে তাঁর এই আদেশ নিহিত হয়ে রয়েছে— 'তোমাকে চলতে হবে, সব বন্ধন ছিন্ন করে তোমাকে বের হতে হবে'। সেইজন্যই যে প্রাণ থামতে চায় না। যা প্রাণের বেগে বেগবান, যা চিরপুরাতনকে কেবলই চিরনূতনের মধ্যে উপলব্ধি করবে, মানুষের সেই শক্তিকে সহস্র প্রকারের কৃত্রিম আচারের বন্ধনে যেমন করেই বাঁধো, যত দিন ধরেই বাঁধো, সে বাঁধন ছিন্ন হবেই। সে-সব কৃত্রিম বাঁধ ভাঙবার জন্যে মানবসমাজে বিপ্লবের তরঙ্গ কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, মহাপুরুষেরা দেখা দেবেন। তাঁরা এই কথাই বললেন, 'সহস্র বৎসরের প্রাচীন বিধিকে কেবলই আবৃত্তি করবার জন্য ভগবান তোমাদের মধ্যে বুদ্ধি দেন নি, বুদ্ধিকে আলোকের মতো ব্যবহার করে তার সাহায্যে দৃষ্টিলাভ করে দুর্গম পথ চলতে হবে যে!' নদীর ধারার বেগের মধ্যেই নদীর স্বাভাবিক পথ তৈরি করবার শক্তি রয়েছে— নদীর সম্মুখে সমুদ্র, সেই দিকে নদীকে পথ কেটে চলতেই হবে। ঠিক সেই রকম মানুষের প্রাণের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে, যে বেগ বিধাতা স্বয়ং সঞ্চার করেছেন, কোন্ শাস্ত্র তাকে রোধ করবে? তাঁর আদেশের উপরে কোন্ মানুষ আপনার আদেশ প্রচার করবে? কে বলবে— কোন্ শাস্ত্র বলবে— 'মানুষ সমুদ্র পার হতে পারবে না, আচারের গণ্ডী লঙ্ঘন করতে পারবে না'? কে মানবে সে আদেশ? ছিন্ন করে ফেলো সমস্ত সংস্কারের জাল, জীর্ণ প্রাচীরকে আর বৃথা সংস্কার

করবার চেষ্টা কোরো না, উন্মুক্ত আকাশে তোমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করো—এই তো তাঁর আদেশের বাণী। এই তো নববৎসরের বাণী।

আমাদের পিতার ঘরই যে পথে, আমরা যে তাঁর পথিক সন্তান। সেই পথে বিশ্বযাত্রী দিক্ দিগন্তর থেকে মিলিত হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের লোকলোকান্তরে যুগ যুগ ধরে চলতে হবে। সেইজন্যই তো মৃত্যুর দূত তিনি পাঠিয়ে দেন; সে কেবলই আমাদের সরিয়ে নিয়ে যায়, কেবলই আমাদের পথ করে দেয়। মাঝখানে কে আবার এসে বলে—না, তোমরা যেতে পাবে না, তোমরা বন্দী, তোমরা এতটুকু চলবে, তার বেশি চলবে না!

দেখো, আমাদের এই আশ্রমটি কোথাও প্রাচীর তোলে নি, গণ্ডীর রেখা কোথাও আঁকে নি। একেবারে বিশ্বের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই আশ্রম। সেইজন্য আজ বিশ্বের নানা দিক থেকে যাত্রীর দল এখানে আসছে। যে ছেলেরা এখানে আসছে তাদের বিশ্বের চারি দিকে পথে পথে এই আশ্রম বের করে দেবে, উন্মুক্ত জীবনের পথে তাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে। আশ্রমকে তোমরা ছোটো করে দেখো না। দেখছ না সমুদ্র পার হয়ে ঘরের বেড়া লঙ্ঘন ক'রে, কত কত দূর থেকে আজ অতিথিরা আমাদের নিকট হয়ে এসেছেন! আশ্রমের দেবতা যে তাঁদের ডাক দিয়েছেন। সেই যাত্রীদের কণ্ঠ থেকে আজ যাত্রার সঙ্গীত বেজে উঠেছে—তাঁরা এসেছেন, তাঁরা এই ঘাটে এসে উঠবেন, তাঁরা আমাদের বেরিয়ে পড়বার ডাক দেবেন। আজ নববর্ষে তাঁদেরই কণ্ঠের সেই যাত্রার বাণীকে আমি তোমাদের কাছে বলছি, তাঁদেরই উপাসনাতে আমরা যোগ দিচ্ছি। তাঁরা আমাদের ভাষাকে গ্রহণ করেছেন—আমাদের মধ্যে আপন হয়ে এসে আমাদের বেরিয়ে পড়বার কথাটা তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেবেন ব'লেই আমাদের সঙ্গে তাঁরা সকল দিক থেকে এমন করে মিললেন। আজ যে আমরা বিশ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়েছি। এবারকার নববর্ষে যে এই আয়োজন হয়েছে তা কি দেখতে পাচ্ছ না? আমরা কেউ জানতে পাই নি। আমাদের দরজা খুলতে ভয় হয়। যারা সমাজের দাস তাদের ভয় হয়। সমস্ত বন্ধনকে মোচন করতে হবে এ কথা জানলে, বন্ধনে যে লোক অত্যন্ত বেশি জড়িয়ে আছে সে যে ভয়ে ভয়ে মরে যাবে। কিন্তু আমরা জানতে পাই আর না পাই, আমাদের সেই আয়োজন যে হচ্ছে। এমনি করে কতবার বন্ধ দরজা ভেঙেছে, আবার আমরা গড়ে তুলেছি। কিন্তু বার বার এমন তো চলবে না। তাই বলছি যে, ভারতবর্ষের মাঝখানে এই আশ্রমকে আজ তোমরা ছোটো ব'লে মনে কোরো না। এইখানে যাত্রীরা আসছে, বিশ্বযাত্রীরা। এইখান থেকে আমাদের সবাইকে যাত্রায় বের হতে হবে। কিন্তু আমরা যারা এখানে বাস করছি আমরা সেই পথের বাধা যেন সৃষ্টি না করি। পূর্বউদয়াচলে নবীন সূর্য উদিত হয়েছে—সেই আলোকের দিকে, সত্যের দিকে, অভয়ের দিকে, অমৃতের দিকে, সম্মুখে আমাদের যাত্রা করতে হবে। সেই যাত্রার পথে ক্ষুদ্রতার দ্বারা তোমরা কোনো

বাধাকে সৃষ্টি কোরো না। সমস্ত বিরোধকে দূর করে দাও, সমস্ত জড়-সংস্কারকে ছিন্ন করো। যেমন তাঁর দূত, প্রভাতের আলোক, আজ আমাদের দ্বারে এসেছে, তেমনি যাঁরা গৃহত্যাগ করে আপন আজন্মকালের আরাম ও অভ্যাসকে লঙ্ঘন ক'রে বিশ্বমানবের মধ্যে বেরিয়েছেন, সেই-সমস্ত দূতেরাও পশ্চিম থেকে পূর্বে আজ আমাদের মধ্যে এসে সমাগত হয়েছেন। আবার আমাদের পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে হবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার পথ এমনি করেই প্রস্তুত হবে। এই আদেশ, এই বাণী নববর্ষে নবযুগের আদেশ।

আজ নববর্ষের দিনে আশ্রমের ভিতরকার কথাটি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঐ-যে দরজা খুলল, বহু যুগের বন্ধ দরজা। ঐ-যে এসে পড়ল বিশ্বযাত্রীর দল। তারা হাঁক দিয়ে বলল, 'আমরা যে বেরিয়েছি। তোমরা এখনও বেরোও নি? সমুদ্রের বাধা, জাতীয়তার বাধা, স্বাদেশিক অভ্যাসের বাধা, ধর্মসংস্কারের বাধা আমরা যে পার হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।' আমরা কোন্ লজ্জায় বলব যে, আমরা দরজা খুলে চৌকাট পার হতে সাহস পাচ্ছি না, আমাদের ঘর হতে আঙিনা বিদেশ হয়ে আছে! না, আমরা পথিক পিতার পথিক সন্তান। তিনি আমাদের বন্দী করে পাঠান নি, তিনি আমাদের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে বলেন নি। আমাদের আশ্রমের মধ্যে এই কথাই জাগছে। এই কথাই আজ নববর্ষ নতুন করে আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলছে।

হে তরুণ যাত্রীর দল, তোমাদের মনের মধ্যে সংস্কার তো এখনও আটে-ঘাটে বেঁধে যায় নি, তোমরা এই কঠিন দুর্গম পথে ভরসা বেঁধে বেরিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হবে না? এ পথ দুর্গম, পদে পদে কত কাঁটা ফুটবে। কিন্তু তোমরা যদি আনন্দে সকল দুঃখ বরণ করে নাও, তবে যে পিতার সঙ্গে বের হবে তিনি বলবেন, 'তোমার পথ চলার শক্তি আছে, তুমি পারো।' সেই তাঁর ভরসা দেওয়ার পুরস্কার গ্রহণ করে তোমরা চলো। যারা তাঁর আদেশকে অমান্য করে তাঁর শক্তিকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছে তারা যে যুগে যুগে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ থেকে ক্লেশে, ভয় থেকে ভয়ে কেমন করে মরেছে এবং আজও মরছে তা কি দেখতে পাচ্ছ না? এত শাস্তি—তবু হয় নি? তবু স্বরচিত কৃত্রিম বিধানকে বড়ো করে নিয়ে বিধাতার বিধানকে অপমানিত করবে? চিরদিন তো বিধাতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবে না। তোমরা নবীন যাত্রী, তোমরা একবার বলো—'না, আমরা আলোকের পথে চলব, আমরা সত্যের পথে চলব, আমরা অমৃতের পথে চলব।' জেগে উঠুক তোমাদের হৃদয় জেগে উঠুক—আর কোনো কথাকে তোমরা বড়ো কোরো না। সমস্ত প্রাণের ভাণ্ডার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে—তোমরা বেরিয়ে পড়ো, তোমরা সমস্ত অর্জন করে নাও।

আজ আমাদের দেশের মধ্যে এই ডাক এসেছে। আমরা বড়ো ক্ষুদ্র, আমরা বড়ো ভারে ভারাক্রান্ত। কিন্তু চলতে গেলেই সমস্ত পাপ, সমস্ত ক্ষুদ্রতা

দূর হবে। চলার মধ্যেই মুক্তি। যদি মনে করি ঘরে বসে আগে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করব, তার পর চলব, তা হলে কোনোদিন শক্তিকে পাব না— জীর্ণতার ভার বেড়েই চলবে। আমরা বেরোব। বেরোতে গেলেই দেখব কত পাপ, কত ক্ষুদ্রতা, কত মোহ আমাদের দুর্বল করে রেখেছে। আমাদের দেশে সকলকে বের হতে হবে, এই ডাক এসে পৌঁছেচে বলেই যে এই আশ্রম। বিধাতার আয়োজন যে কেমন করে হয় তা আমরা আগে থেকে কিছুই দেখতে পাই না। কিন্তু যেমনি দেখতে পাই অমনি ভয় কোথায় যায়, ভরসায় বুক ভরে ওঠে। সেই আয়োজনকে দেখতে পাও, সেই আয়োজন যে দেশের মধ্যে এক জায়গায় হচ্ছে তাই বুঝতে চাও। আমরা যে ইতিহাসের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছি। ইতিহাসের সৃষ্টিকার্য যে চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। একবার সামনে চোখ মেলে দেখো, সেই-যে সৃষ্টিকার্য চলছে তাকে দেখো। সেই ইতিহাসকে গড়বার ভার আমাদের উপর পড়েছে এটা যখনই দেখতে পাব অমনি বলব, 'দেব, আমার সব শক্তি দেব, সব দেব।' সেইটে দেখতে পাচ্ছি না বলেই আমাদের দৈন্য যাচ্ছে না। প্রতিদিনের অভ্যাসের পুনরাবৃত্তির মধ্যে এ কথা ভুলো না— এর মধ্যে যে শক্তি রয়েছে, যে পরম সম্ভাবনা রয়েছে, যদি ভবিষ্যতের আকাশে তাকে স্থাপিত করে দেখতে পাও তবে সমস্ত দীনতা দূর হবে, সমস্ত বাধা অপসারিত হবে, ত্যাগ সহজ হবে, শক্তি সম্পূর্ণ হবে এবং অদ্যকার নববর্ষের আলোক নবযুগের যে বাণী বহন করে এনেছে তা সফল হয়ে উঠবে।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩২১

আত্মসম্পদ

আমাদের মা আমাদের সঙ্গে জীবন ভরে একটি খেলা খেলছেন। সে খেলাটি এই যে, তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে একটি রত্ন লুকিয়ে রেখেছেন এবং তিনি চান যে আমরা তাঁকে সেই রত্নটি খুঁজে দেব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি বড়ো জিনিস আছে। সেটি আমাদের প্রত্যেকেরই পক্ষে স্বতন্ত্র, সে একেবারে আমার আপনার— সে আর কারও নয়। কিন্তু তাকে আবিষ্কার করতে পারি নে বলেই জীবন সার্থক হয় না। আমরা যদি পর্দা সরাতে পারি, সংস্কারের আবর্জনার আড়াল থেকে যে রত্নটি আমারই বিশেষ রত্ন সেটি খুঁজে মায়ের হাতে দিতে পারি, তবে মায়ের মুখে বড়ো প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠবে। সে হাসিতে জগৎ উজ্জ্বল হবে।

কেমন করে পারব? সত্য হলেই পারব। রত্ন যে ঢাকা পড়ে যায় মিথ্যার আড়ালে। তাকে তো কারও উপার্জন করতে হয় না, সে তো রয়েইছে। কিন্তু

আমরা তাকে দেখতে পাই নে। আমরা নিজেকে দরিদ্র ব'লে অক্ষম ব'লে জেনে যাই। আমাদের ভিতরকার সত্য সম্পদকে দেখতে পাই নে ব'লেই এই দারিদ্র্য, সে কথা একবারও মনে পড়ে না।

সত্যের সাধনা হচ্ছে সেই দেখতে পাবার সাধনা। মিথ্যার জঙ্গল সাফ ক'রে, যেখানে আমাদের ধন আছে সেইখানকার পথ পরিষ্কার করতে হবে। প্রত্যহ সতর্ক ও সচেষ্ট হতে হবে। কুঠারের পর কুঠার পড়ুক, মিথ্যার শাখার পর শাখা ছিন্ন হতে থাক্।

তোমাদের সত্য হতে হবে। মিথ্যা দিয়ে তোমরা যদি কাউকে এতটুকু ফাঁকি দাও, নিজেকে তার চেয়ে হাজার গুণে ফাঁকি দেবে—যেটা তোমার সকলের চেয়ে বড়ো রত্ন, নিজের কাছ থেকে সেইটেকে লুকিয়ে রাখবে। আজ তবে তোমরা প্রতিজ্ঞা করো, একবার মনের ভিতর থেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করো—আমরা আর অসত্যকে ছলনাকে আমাদের মধ্যে জমতে দেব না। এর জন্য বাইরে থেকে যদি আমাদের শাস্তি পেতে হয়, মাথা পেতে সেই শাস্তিকে বীরের মতো গ্রহণ করব। কিন্তু কাপুরুষের মতো মিথ্যার আড়ালে আড়ালে আপনাকে বাঁচিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করব না! আমি বলছি তোমরা একবার আজকের এই সন্ধ্যায় এই উপাসনাগৃহে সমস্ত মনকে জাগিয়ে প্রতিজ্ঞা করো—আজ হতে আমরা সত্য হব। সেই সত্য হওয়ার মধ্যে যে বীরত্ব আছে, সেই বীরত্বের আনন্দেই-যে সমস্ত বিপদ ক্ষতি অপমান অনায়াসে সহ্য করতে পারবে। কেননা সেই সত্যের আলোকে আমরা আমাদের অন্তরের রত্নটিকে চিনি ; তখন লোভ যায়, ভয় দূর হয়ে যায়।

জীবনের জাল এক-এক সময়ে বড়ো জটিল হয়ে ওঠে ; সংসারের স্রোত এক-এক সময় প্রলয়ের পাকের মধ্যে টানতে থাকে ; তখন মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলতে থাকে—'মুক্তিদাতা আমাকে মুক্তি দাও!' হায় রে, এতদিন সে যে মিথ্যার কাছেই শর্তে বন্ধ হয়েছে ; তাকেই বলেছে—'তুমি আমাকে ক্লেশ থেকে, বিপত্তি থেকে, অসুবিধা থেকে, লোকনিন্দা থেকে বাঁচাও ! তুমি আমাকে টাকা দাও, খ্যাতি দাও, ক্ষমতা দাও ; তার বদলে তুমি আমার জীবনের সত্য রত্নটি অপহরণ করো, আমি তাতে কোনো কথাটি কব না।' তাই তো মুক্তি আজ এত কঠিন। মিথ্যা যে আমাদের পরিত্রাণের সকল নৌকাগুলিতে ছিদ্র করে রেখে দিয়েছে।

পরিত্রাণের অর্থ এই যে, ব্যর্থতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা, নিজের মধ্যে যে সত্যরত্ন প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্ধার করা। আমি যথার্থ যা সেইটি হয়ে ওঠা। আমার মধ্যে আমার অন্তর্যামীর যে অভিপ্রায়টি নিহিত আছে তাকে সাধনা-দ্বারা সর্বতোভাবে আমারই অভিপ্রায় করে তোলা।

আমরা বড়ো হতে চাই। বড়ো ধনী, বড়ো মানী হতে গিয়ে দেখি আমরা এমন জিনিসের দ্বারা বড়ো হতে চাই যা নিজেই বড়ো নয়, যাকে বড়ো করে রাখবার জন্যে নানা সরঞ্জাম জোগাতে হয়। কিন্তু যদি আমরা সত্য হই, বাক্যে

চিন্তায় কর্মে সত্য হই, তবে দেখতে পাব সত্যের পক্ষে বাহির হতে সাজে সরঞ্জামে বড়ো হবার কোনো দরকার নেই। সত্য আপনাতেই আপনি বড়ো। সেইজন্য দরিদ্রের কুটীরেও সত্য বড়ো, অপমানের লাঞ্ছনাতেও সত্য বড়ো, মৃত্যুর মধ্যেও সত্য বড়ো। সে যে স্বরূপতই বড়ো, এইজন্য তাকে বড়ো আকার ধারণ করতে হয় না এবং তাকে বড়ো করে তোলার জন্য আমাদের ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয় না।

আজ এই মন্দিরে তোমাদের এই খবরটি দেবার জন্য ডেকেছি যে, রত্ন আছে তোমাদের মধ্যেই, সেইটি খুঁজে বের করে তোমাদের মায়ের হাতে সমর্পণ করার ব্রত গ্রহণ করো। যখন সেটি খুঁজে পাবে তখন দেখবে তার কী রূপ! কী জ্যোতি! কী আনন্দ! তখন আঘাতকে বিপদকে গ্রাহ্য করবে না, বাহিরের ভয়কে ভয় করবে না, মৃত্যুকে নিদারুণ বলে কল্পনা করবে না। তখন নিজের মধ্যেই নিজের সম্পদকে, নিজের আনন্দকে, নিজের পরিত্রাণকে উপলব্ধি করে চিরদিনের মতো তোমরা বেঁচে যাবে।

শান্তিনিকেতন
১৯ পৌষ, রবিবার, ১৩২১

শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার সাময়িক পত্রে

প্রথম প্রকাশ

গ্রন্থে সংকলনের ক্রমানুযায়ী তালিকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষগণনা শকাব্দে ; বৈশাখেই বর্ষসূচনা। ১৮৩০ শক=১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

	শিরোনাম	খণ্ড	মাসিক পত্র	বর্ষ	মাস	পৃষ্ঠা
১	মৃত্যুর প্রকাশ	৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩০	ফাল্গুন	১৬৬
২	নবযুগের উৎসব	৫	বঙ্গদর্শন	১৩১৫	মাঘ	৫৩০
			প্রবাসী	১৩১৫	ফাল্গুন	৬১৪
৩	আশ্রম	৯	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩১	মাঘ	১৪৫
৪	তপোবন	৯	প্রবাসী	১৩১৬	পৌষ	৬৭৮
৫	ছুটির পর	৯	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩১	আশ্বিন	৮১
৬	বর্তমান যুগ	৯	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩১	অগ্রহায়ণ	১২১
৭	চিরনবীনতা	১০	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩১	ফাল্গুন	১৬৩
৮	বিশ্ববোধ	১০	প্রবাসী	১৩১৬	ফাল্গুন	৮৮৯
			তত্ত্ববোধিনী	১৮৩১	চৈত্র	১৭৯
৯	গুহাহিত	১১	প্রবাসী	১৩১৭	আষাঢ়	২০৭
			তত্ত্ববোধিনী	১৮৩২	ভাদ্র	৭৪
১০	শ্রাবণসন্ধ্যা	১১	প্রবাসী	১৩১৭	ভাদ্র	৪৭৮
১১	পূর্ণ	১২	প্রবাসী	১৩১৭	আশ্বিন	৫৭৮
১২	মাতৃশ্রাদ্ধ	১২	প্রবাসী	১৩১৭	কার্তিক	১
১৩	শেষ	১২	মানসী	১৩১৭	আশ্বিন	৪৯৪
১৪	সামঞ্জস্য	১২	ভারতী	১৩১৭	মাঘ	৭৯৩
			তত্ত্ববোধিনী	১৮৩২	ফাল্গুন	১৭৭
১৫	জাগরণ	১২	প্রবাসী	১৩১৭	মাঘ	৪৫০
			তত্ত্ববোধিনী	১৮৩২	ফাল্গুন	১৬৭
১৬	কর্মযোগ	১৩	ভারতী	১৩১৭	ফাল্গুন	৮৮১
			তত্ত্ববোধিনী	১৮৩২	চৈত্র	১৮৭
১৭	আত্মবোধ	১৩	প্রবাসী	১৩১৭	ফাল্গুন	৫০১
			তত্ত্ববোধিনী	১৮৩২	চৈত্র	১৯৫
১৮	ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা	১৩	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৩	বৈশাখ	৬
			প্রবাসী	১৩১৮	বৈশাখ	৪৬

	শিরোনাম	খণ্ড	মাসিক পত্র	বর্ষ	মাস	পৃষ্ঠা
১৯	সুন্দর	১৪	ভারতী	১৩১৮	আষাঢ়	২৬৮
			তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৩	আষাঢ়	৫০
২০	বর্ষশেষ	১৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৩	জ্যৈষ্ঠ	২৯
			ভারতী	১৩১৮	জ্যৈষ্ঠ	১৩৭
২১	নববর্ষ	১৪	প্রবাসী	১৩১৮	জ্যৈষ্ঠ	১২৬
			তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৩	জ্যৈষ্ঠ	৩১
২২	বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা	১৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৩	শ্রাবণ	৭২
			ভারতী	১৩১৮	শ্রাবণ	৩০১
২৩	সত্যবোধ	১৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৪	ভাদ্র	১১৬
২৪	সত্য হওয়া	১৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৪	পৌষ	২০৭
২৫	সত্যকে দেখা	১৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৪	মাঘ	২০১
২৬	শুচি	১৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৪	আশ্বিন	১৪৫
২৭	বিশেষত্ব ও বিশ্ব	১৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৪	অগ্রহায়ণ	১৯২
২৮	পিতার বোধ	১৫	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৩	ফাল্গুন	২৪৭
২৯	সৃষ্টির অধিকার	১৫	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৫	ফাল্গুন	২১৯
৩০	ছোটো ও বড়ো	১৫	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৫	ফাল্গুন	২২৫
			প্রবাসী	১৩২০	ফাল্গুন	৫০০
			ভারতী	১৩২০	ফাল্গুন	১১৫৫
৩১	সৌন্দর্যের সকরুণতা	১৬	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	ফাল্গুন	১৮৩
৩২	অমৃতের পুত্র	১৬	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	ফাল্গুন	১৮৫
৩৩	যাত্রীর উৎসব	১৬	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	ফাল্গুন	১৮৯
৩৪	মাধুর্যের পরিচয়	১৬	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	ফাল্গুন	১৯১
৩৫	একটি মন্ত্র	১৬	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৫	চৈত্র	২৫১
			প্রবাসী	১৩২০	চৈত্র	৬৫৭
৩৬	উদ্‌বোধন	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৫	মাঘ	২০৭
৩৭	মুক্তির দীক্ষা	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৫	মাঘ	২০৪
৩৮	প্রতীক্ষা	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৫	মাঘ	২০৬
৩৯	অগ্রসর হওয়ার আহ্বান	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৫	মাঘ	২০৮
৪০	মা মা হিংসীঃ	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	আশ্বিন-কার্তিক	১০৫
৪১	পাপের মার্জনা	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	আশ্বিন-কার্তিক	১১৭
৪২	সৃষ্টির ক্রিয়া	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	অগ্রহায়ণ	১৩৭
৪৩	দীক্ষার দিন	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	মাঘ	১৬৭
৪৪	আরো	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	মাঘ	১৬৮
৪৫	আবির্ভাব	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	মাঘ	১৬৯
৪৬	অন্তরতর শান্তি	১৭	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	মাঘ	১৭০

উল্লিখিত তালিকার প্রত্যেক ছত্রে প্রথমেই তালিকা-অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা, পরে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ-অনুসারে নিবন্ধের শিরোনাম, ১৭ খণ্ডে প্রকাশ-অনুযায়ী শান্তিনিকেতনের বিশেষ খণ্ডের উল্লেখ, মাসিক পত্র বা পত্রিকার নাম, অতঃপর উক্ত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্কের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বলা আবশ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষগণনা শকাব্দ-অনুযায়ী এবং বৈশাখ হইতেই বর্ষ-সূচনা। তদনুযায়ী ১৮৩০ বৈশাখ বা চৈত্র বলিতে ১৩১৫ বৈশাখ বা চৈত্র বুঝিতে হইবে।

ইহা বলা প্রয়োজন গ্রন্থে সংকলন-কালেই অনেক রচনার নামকরণ করা হয়, বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রায়শঃ ঐরূপ নাম পাওয়া যাইবে না— তৎপরিবর্তে বক্তৃতার বা প্রবন্ধপাঠের উপলক্ষ্যটির উল্লেখ মিলিবে। উক্ত পত্রিকায় কয়েকটি নিবন্ধ কথ্য ভাষায় মুদ্রিত হয় নাই, যেমন তালিকার ৫ ও ৬। কথিত উপদেশের সাধুভাষায় পরিবর্তন, তাহা হইতে আবার কথিতে রূপান্তর-পূর্বক গ্রন্থে সংকলন, এজন্য কদাচিৎ পাঠবিভ্রাট হয় নাই তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কতকগুলি রচনা (সংকলিত তালিকার ৩৭-৩৯ সংখ্যা) 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী'র নামে মুদ্রিত হয়; বলা বাহুল্য তাহার অর্থ এই যে, রবীন্দ্রনাথ-কথিত আর অজিতকুমার চক্রবর্তীর শ্রুতিলিখন বা স্মৃতিলিখন, পরে প্রয়োজন হইলে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত।

সাময়িক পত্রে প্রকাশ-কালে বক্তৃতার বা প্রবন্ধপাঠের স্থান কাল বা উপলক্ষ্য সম্পর্কে এমন অনেক তথ্য দেওয়া হয় যাহা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের ভিতরে ১৩৭০ ফাল্গুনের পূর্বে সংকলিত হয় নাই। সাময়িক পত্রে প্রকাশ হইতে রচনার আনুমানিক কাল সম্পর্কে একটা ধারণা অবশ্যই হইতে পারে, অন্য লিখিত বা মুদ্রিত তথ্যের অসদ্ভাবে তাহারও বিশেষ মূল্য আছে, তদ্‌ব্যতীত আরও যে-সকল তথ্য পত্রস্থ শিরোনাম, সম্পাদকীয় মন্তব্য বা পাদটীকা হইতে অথবা অন্য সূত্রে জানা যায় তাহার অধিকাংশই পূর্ব-তালিকার ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখে নিম্নে সংকলিত হইল।—

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর চতুর্থ সাম্বৎসরিক স্মৃতিবাসরে. ৬ মাঘ ১৩১৫ অপরাহ্নে, কলিকাতায় মহর্ষিভবনে কথিত।

—তত্ত্ববোধিনী

২ 'গত মাঘোৎসবের রাত্রিতে [১১ মাঘ ১৩১৫] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।' —বঙ্গদর্শন

৪ 'রবীন্দ্রজীবনী'-অনুসারে, এই প্রবন্ধ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ তারিখে পঠিত হয়।

'এই প্রবন্ধ কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট্‌স্থ যুবকগণের খৃষ্টীয় মণ্ডলী সভাগৃহে পঠিত হয়।' —প্রবাসী

[প্রবন্ধশেষে, পূর্ববর্তী খণ্ড পৃ ২৫২, বন্ধনীমধ্যে প্রকাশকাল মাত্র মুদ্রিত]

৭ '১১ই মাঘের পবিত্র প্রাতঃকালে [১৩১৬] আদি-ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় তল লোকে পরিপূর্ণ হইলে' যথাকালে রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী 'বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন'—এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দেন। —তত্ত্ববোধিনী

৮ ঐ দিনে (১১ মাঘ ১৩১৬) মহর্ষিভবনে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সায়ংকালীন বক্তৃতা'।
প্রবাসী-অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ 'এই ব্যাখ্যান পাঠ করেন'।

১১ 'আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু' বলিয়া যাঁহার উল্লেখ, তিনি 'রবীন্দ্রজীবনী'কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; ১১ শ্রাবণ ১৩১৭ তারিখে তাঁহার জন্মদিনে শান্তিনিকেতন মন্দিরে এই উপদেশ কথিত।—রবীন্দ্রজীবনী ২ (১৯৬১), পৃ. ২৪৪, পাদটীকা ৪

১২ এই ভাষণের তারিখ ১৮ ভাদ্র ১৩১৭।—তদেব, পৃ. ২৪৪, পাদটীকা ৫

১৪ 'বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ই পৌষ [১৩১৭] সন্ধ্যাকালে পঠিত।' —ভারতী
জোড়াসাঁকোয় মহর্ষিভবনে '৬ই মাঘ শুক্রবার' ১৩১৭ বিকালে বা সন্ধ্যায় মহর্ষির বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পুনরায় পাঠ করেন—১৮৩২ ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখিলে ইহাই অনুমিত হয়।

১৫ 'বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ই পৌষ [১৩১৭] প্রাতঃকালে পঠিত।' —প্রবাসী

১৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত শিরোনাম-অনুযায়ী 'একাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রাতঃকালের বক্তৃতা'—অতএব ইহার কাল : ১১ মাঘ ১৩১৭ প্রাতঃকাল।

১৭ 'সায়ংকালের বক্তৃতা'/'১১ই মাঘ [১৩১৭] বুধবার, উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যাকালে পঠিত।' —তত্ত্ববোধিনী/প্রবাসী

১৮ '১২ই মাঘ/মাঘে [১৩১৭] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।' —প্রবাসী/তত্ত্ববোধিনী

১৯ 'কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।' —তত্ত্ববোধিনী

২০ 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে বর্ষশেষের উপাসনাকালীন বক্তৃতার সারমর্ম্ম।' —তত্ত্ববোধিনী

২১/২২ 'কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।' —প্রবাসী/ভারতী/তত্ত্ববোধিনী

২৩-২৫ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে মূল ভাষণের তারিখ সমকালীন শ্রুতিলিখন হইতে।

২৬ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে তারিখ ও 'বুধবার' পাওয়া যায়, বৎসর সম্পর্কে নিশ্চয়তা জন্মে শতাব্দপঞ্জী দেখিলে।

২৩-২৬ 'শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম' —তত্ত্ববোধিনী

২৭ 'শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম' —তত্ত্ববোধিনী

২৮ 'মাঘোৎসবে [১১ মাঘ ১৩১৮] প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশ'। —তত্ত্ববোধিনী

২৯ '১১ই মাঘ [১৩২০] প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারমর্ম্ম।' —তত্ত্ববোধিনী

৩০ '১১ই মাঘ [১৩২০] সায়ংকালে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত উপদেশ।' —ভারতী/তত্ত্ববোধিনী

'আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে সন্ধ্যাকালে পঠিত।' —প্রবাসী

৩১/৩২ '১১ই মাঘ [১৩২১] প্রাতঃকালের উদ্‌বোধন/উপদেশ।' —তত্ত্ববোধিনী

৩৩ '১১ই মাঘের [১৩২১] সায়ংকালের উদ্‌বোধন।' —তত্ত্ববোধিনী

৩৪ '১১ই মাঘ [১৩২১] সন্ধ্যার উপদেশ।' —তত্ত্ববোধিনী

৩৫ '১৫ই মাঘ [১৩২০] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে পঠিত।' —তত্ত্ববোধিনী

৩৭/৩৮ ৭ই পৌষ ১৩২০ 'প্রাতঃকালের/সায়ংকালের উপদেশ।' —তত্ত্ববোধিনী

৩৬-৩৮ 'উৎসব-দিন', 'সত্যের দীক্ষা' (সংক্ষেপীকৃত) ও 'উৎসব-দেবতা' শিরোনামে ১৩২০ ফাল্গুনের প্রবাসীপত্রের 'কষ্টিপাথর' অংশে (পৃ ৫৪১-৪৩) সংকলিত।

৩৯ '৭ই পৌষ [১৩২০] দ্বিপ্রহরে Stopford Brookeএর onward cry নামক উপদেশ অবলম্বনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আলোচনার সারমর্ম।' —তত্ত্ববোধিনী

৪০/৪১ 'মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারমর্ম্ম।' —তত্ত্ববোধিনী

৪৩/৪৪ ৭ পৌষ ১৩২১ 'প্রাতঃকালের উদ্‌বোধন।'/'প্রভাতের উপদেশ।' —তত্ত্ববোধিনী

৪৫/৪৬ ৭ পৌষ ১৩২১ 'সায়ংকালের উদ্‌বোধন/উপদেশ।' —তত্ত্ববোধিনী

প্রথম-প্রচারিত 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের ১৭টি খণ্ডে (বর্তমান দুই খণ্ডে উহারই পুনর্মুদ্রণ)—১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ তারিখ হইতে ১৩২১ সনের (১৮৩৬ শক) মাঘোৎসব অবধি কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসরের কথিত বা পঠিত উপদেশাদি সংকলন করা হইয়াছে। প্রথম দিকের ভাষণসমূহ সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে তেমন দেখা যায় না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক থাকা-কালীন (১৮৩৩-৩৬ শক)

উপদেশাদি ঐ পত্রেই অধিক পরিমাণে প্রকাশ হইতে থাকে। ঐ সীমাবদ্ধ সময়ের (১৮৩৩-৩৬ শক বা ১৩১৮-২১ বঙ্গাব্দ) যে কয়টি রচনা বর্তমান গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য সংকলনযোগ্য বলিয়াই মনে হয়, ভ্রমক্রমে বা অনবধানে ইতঃপূর্বে সংকলিত হয় নাই, সেগুলি 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত হইল।

তৎপূর্বেই কালক্রম রক্ষা করিয়া এমন আরও দুইটি রচনা যুক্ত হইয়াছে, যাহাতে সুধীজন অবশ্যই সুখী হইবেন এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্ররচনা-চর্যায় যাঁহারা নিযুক্ত তাঁহারাও উপকৃত হইবেন মনে হয়।

মূল শান্তিনিকেতন গ্রন্থের পরিপূরক এই ছয়টি প্রবন্ধের তালিকা পরে দেওয়া গেল।—

					পৃষ্ঠা
১	দুই ইচ্ছা	বঙ্গদর্শন	১৩১৫	মাঘ	৫৩৯
		তত্ত্ববোধিনী	১৮৩০	ফাল্গুন	১৬৭
২	জীবাত্মার মুক্তি	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৩	ভাদ্র	১১১
৩	মনুষ্যত্বের সাধনা	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	বৈশাখ	৭
৪	বর্ষশেষ	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	জ্যৈষ্ঠ	২৫
৫	নব বর্ষ	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	জ্যৈষ্ঠ	২৭
৬	আত্মসম্পদ্	তত্ত্ববোধিনী	১৮৩৬	চৈত্র	২১৩

এতৎসম্পর্কিত তথ্যপঞ্জী নিম্নে সংকলিত।—

১ '১১ মাঘ [১৩১৫] প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজে পঠিত।' —বঙ্গদর্শন

'পবিত্র মাঘোৎসব ১১ই মাঘ দিবসের প্রভাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতল গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।...অনেকেই স্থানাভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন।... ধূপ ধুনার গন্ধে সমাজ মন্দির আমোদিত হইলে ঠিক আটটার সময় শঙ্খ ধ্বনির পর অর্চ্চনা হইয়া উপাসনা ও সঙ্গীত আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু উদ্‌বোধন করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। পরে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ওজস্বিনী ও বিচিত্র ভাষায় যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলে মোহিত ও স্তব্ধ হইয়া অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা নিম্নে প্রকাশিত হইল।' —তত্ত্ববোধিনী

বঙ্গদর্শনে দেখা যায় এটি পঠিত 'উদ্‌বোধন'। এ রচনা মূল 'শান্তি-নিকেতন' গ্রন্থে সংকলিত না হওয়ার কারণ এই অনুমিত হইতে পারে

যে, অল্প কিছুকাল পূর্বে, ১৩১৫ পৌষে, শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি পর-পর কয়েকটি ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের মধ্যেই একটি ভাবসূত্র পরে আবিষ্কৃত হওয়ায়, সেই কয়টি পূর্বভাষণেরই অপূর্ব সমাহার করিয়াছেন এই নব-লিখিত উপদেশে বা উদ্‌বোধিনী বক্তৃতায়। 'দুই ইচ্ছা' প্রবন্ধে সংকলনের ক্রমানুসারে পূর্বের সেই ভাষণগুলি হইল--

ক) ইচ্ছা (১৮ পৌষ ১৩১৫)
খ) প্রেমের অধিকার (১৭ পৌষ ১৩১৫)
গ) সৌন্দর্য (১৯ পৌষ ১৩১৫)
ঘ) বিশেষ (১৬ পৌষ ১৩১৫)

'দুই ইচ্ছা'র সূচনাটুকু (চারিটি অনুচ্ছেদ) সম্ভবতঃ নূতন রচনা। অতঃপর বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধের ১-২ চিহ্নিত অংশ ক হইতে, ৩-৪ অংশ খ হইতে (প্রথম বাক্য এবং শেষ অনুচ্ছেদ বর্জিত), ৫-৬ অংশ গ হইতে (শেষ দুইটি অনুচ্ছেদ মাত্র) এবং ৭-৮ অংশ ঘ হইতে অল্প-বিস্তর পরিবর্তনসহকারে সংকলিত।
বর্তমান সংকলনে তত্ত্ববোধিনীর পাঠ অনুসৃত। বঙ্গদর্শনে বহু মুদ্রণ-প্রমাদ।

২ 'কোনো শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পত্রের উত্তরে' লিখিত হইলেও, ইহার আলোচনার বিষয় ও সারার্থ বর্তমান 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার বিষয় বা বক্তব্য হইতে অভিন্ন।

৩ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রচনা। ঈশ্বরোপদেশ ও আনুষঙ্গিক অন্য আলোচনার মধ্যে, উপদেশাত্মক অংশগুলি সংকলিত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে জানা যায়—ইহা '২৭শে ফাল্গুন মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারমর্ম্ম।'

৪/৫ ভাষণের উপলক্ষ্য শিরোনাম হইতেই জানা যায়।
৬ '১৯শে পৌষ [১৩২১] রবিবার আশ্রমের মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।' —তত্ত্ববোধিনী

পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৭ খণ্ডে প্রচারিত 'শান্তিনিকেতন'এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম খণ্ডের ও নবম খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধের রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন-স্থিত রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ত্রয়োদশ খণ্ডের 'কর্মযোগ', চতুর্দশ খণ্ডের 'শুচি' এবং পঞ্চদশ খণ্ডের 'ছোটো ও বড়ো' এগুলির মূল রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিও রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। কয়েকটি প্রবন্ধের রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্রও পাওয়া গিয়াছে।

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার অধিকাংশই শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের মন্দিরে কথিত ও অনুলিখিত, আর বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পঠিত বলিয়াও জানা যায়। কোন্ কোন্ বক্তৃতা (তন্মধ্যে মাঘোৎসব ও মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসরের উপদেশাবলী এবং 'তপোবন' প্রবন্ধই প্রধান) কলিকাতার বিভিন্ন সমাজগৃহে ও সভাস্থলে পঠিত বা কথিত, সে সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে যাহা জানা যায় তাহাও মাসিকপত্রাদি হইতে বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে সংক্ষেপে পঞ্জীকৃত হইল।

শ্রাবণ ১৩৮০

পরিশিষ্ট-সংযোজন ও গ্রন্থপরিচয়-সংকলন : কানাই সামন্ত